পূর্ণকুম্ভ

রাণী চন্দ

পূর্ণকুম্ভ

শ্রীরানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৫৯
পুনর্মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৬১, শ্রাবণ ১৩৬৫, কার্তিক ১৩৭১
চৈত্র ১৩৮৫ : ১৯০১ শক

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
মুদ্রক শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস। ৬৬ গ্রে স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

বড়দিকে

পূর্ণকুম্ভ

সেদিন আমার বৈষ্ণবী সই বলছিল রান্নাঘরের দোরে পিঠ ঠেস দিয়ে বসে, 'এ জীবনে কী পেলাম, কী পেলাম না ; পেলে কী হত, না পেয়ে কী হল—লাভক্ষতির এই হিসাব কষতে বসে গেলাম এক সময়ে। কিন্তু পারলাম না। চোখের জলে গুলিয়ে গেল বারে বারে। শেষে সেই হিসাব ভুলবার জন্যই বেরিয়ে পড়লাম একদিন আমি সব কিছু পিছনে ফেলে।'

ট্রেনের জানলায় হাতে মাথা রেখে ভাবছিলাম তারই কথা।

চলেছি হরিদ্বারে অমৃতকুম্ভে।

বড়দি যাচ্ছেন, সঙ্গে হেমদাদা। সঙ্গ নিলাম আমিও তাঁদের। দেখে এসেছি আঙিনায় ফুটেছে শিমুল পলাশ আগডালে কয়েকটা। এই তো পাতা-ঝরা শেষ হল সবে। পাকা পাতা ঝরে পড়েছে অবিরত শুকনো দমকা হাওয়ায়। দিনের বেলা ঝরার নাচ দেখেছি চোখে। রাতের বেলা কানে শুনেছি ঝংকার, আঁধার-ছাওয়া শিমুলতলায় পায়চারি করতে করতে। বছর ধরে দিন গুনি এই সময়টির আশায়। তাকিয়ে থাকি নীল আকাশের গায়ে ঝুলে-পড়া কালো ডালগুলির দিকে। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে কালো কুঁড়িতে ছেয়ে যায় ডাল, শুরু হয় ফুল ফোটার পালা। এই তো আর ক'দিন যেতে না যেতে গাছ উপচে পড়বে ফুলে ফুলে, নুয়ে পড়ে হেলবে হাওয়ায় ডালগুলো সব লাল পাপড়ির বোঝার ভারে। আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক, গাঙশালিক, চড়ুই, ছাতার, কোকিল, কাক। সে কী কলরব তাদের ভোর না হতে, কাকলিতে যেন হাটের মেলা বসে যায় এ তল্লাট জুড়ে। কাঠবেড়ালির দল ছুটোছুটি লাগায় ডালে ডালে পিঠের উপর লেজ তুলে দিয়ে। দু হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ফুলের ভিতরের মধুটুকু। কত দুপুরে নিরিবিলিতে জানালার পাশের খাটখানাতে শুয়ে এক মনে দেখি তাদের খেলা। চঞ্চলতার শেষ নেই। সারা গাছ জুড়ে বিয়ে-বাড়ির ব্যস্ততা চলে যেন। শিমুল ফুলের ভিতরে কী বাটি-ভরা মধু—ঠুকরে খাবার সময় টস্ টস্ করে কাত হয়ে পড়ে যায় কত! ভাবি, অতখানি কি মধু, না শিশির-জমা জল!

একটু এগিয়ে শিমুলের পরেই পলাশ। মেটে সিঁদুরে রঙের আগুনের হলকা উঠতে থাকে শুন্যে, বাগানের সেই কোণটা জুড়ে। সেই আগুনে খেলা করে ছোট্ট ছোট্ট কালো রঙের 'মৌ-টুসকি' তার কালো বাঁকা সরু ঠোঁট নিয়ে। তলায় লাল কাঁকর ছেয়ে লাল বিছানা বিছোয় পলাশ রাতে দিনে। মার বাড়ি যেতে-আসতে অঞ্জলি ভরে তুলি ফুল মাটি হতে। কখনো সাজাই মার ঠাকুরঘর, কখনো এনে রাখি নিজের ঘরের জানালায় রাখা পোড়ামাটির লাল থালাখানা ছাপিয়ে। বারান্দার কোনায় ছাদের উপর লতিয়ে-ওঠা নীলমণিলতায় ধরেছে থোকা থোকা নীল ফুল। জীর্ণ লতা, গোড়া খেয়ে বাসা বেঁধেছে উইয়ের দল, মাটির প্রলেপ গায়ে মাখিয়ে। জোর নেই লতার আর আগের দিনের মতো। মাথার দিকে কয়েকটা সবুজ পাতা নিয়ে বেঁচে আছে সে কোনোমতে। আগে হলে এই সময়ে এই কোনা ছেয়ে থাকত

নীলমণির নীলে। কত দূর থেকে চোখে পড়ত তার রঙের ছটা। এখনো ফোটে ফুল, তবে তত না। তবু যেটুকু পাই চেয়ে থাকি ; টেনে আনি চোখের সামনে তার পুরোনো দিনের হারানো সেই রূপকে। বারান্দার লাল মেঝে ঢেকে ঝরে পড়ত নীলমণি, হাওয়ায় পাক খেতে খেতে। নীল তারার নকশা ফেলে আসন পাতত সে প্রতি প্রভাতে কার জন্যে কে জানে। দিনের পর দিন এই যে নিবেদন, কাকে শেখাতে চায় সে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে? ভাবিয়ে তুলেছে মন কত কত বার। এখনো তাই ; দুটি হোক, একটি হোক, চেয়ে থাকি তার পানে—যেন তাকে চাইই আমার। নইলে কী যেন ভুলে যাই ভয় হয় মনে। সারা বছর যত্নে গোড়ায় জল ঢালি, আর মুখ তুলে দেখি, সবুজ পাতা কয়টি বেঁচে আছে তো ঠিক উপরে? এই সময়টিতে সে আসে বার বার প্রতি বছরের শেষে। বাড়ির পিছনের বাগানে ফুটেছে রাশি রাশি কাঞ্চন। ঘন সবুজ আম-পেয়ারার মাথা ডিঙিয়ে হঠাৎ-ওঠা হালকা বেগুনি রঙের ফোয়ারা এক-একটি। কী তার বাহার! শিমুল পলাশ নীলমণি কাঞ্চন তাদের এই ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে ঘিরে ধরে চারি দিক হতে।

মুখ ঘুরিয়ে নিই। মনকে এগিয়ে দিই।

পিছু-ডাকে যে কান দিতে নেই—শুনেছি দিদিমার মুখে।

হঠাৎই চলে আসা আমার। কী করে যে ঘটে উঠল নিজেই অবাক মানি। সংসার থেকে নিজেকে আলগা করে তুলে নেওয়া—সে দুদিনের জন্য হোক, দশ দিনের জন্য হোক—বড়ো কঠিন। কত তোড়জোড় করে তবে তৈরি হতে পারি।

বড়দিদের সঙ্গ নেব, মনে মনে মন যখন ঠিক, বাধা দিল অভিজিত আমায়। কাঁপতে কাঁপতে বিছানা নিল একদিন।

বাঁধা মোট—মেঝে হতে সরিয়ে খাটের নীচে ঠেলে রাখলাম। একদিন, দুদিন, তিনদিন—জ্বরের তাপ বাড়তেই থাকে। ওদিকে খবর আসে বড়দির কাছ হতে, 'টিকিট কেনা হয়ে গেছে, আর সময় নেই, চলে এসো শিগগির কলকাতায়।'

কথা বলি না, সাড়া দিই না, দাগে দাগে কাঁচের গ্লাসে ওষুধ ঢালি, আর ডাক্তার ও রোগীর মুখ নীরবে মিলিয়ে দেখি।

শেষে, যাত্রার শেষ দিনের শেষ ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগ মুহূর্তে ছাড়া পেলাম দুজনের কাছ হতে।

যেমনটি ছিলাম তেমনিই পা বাড়িয়ে দিলাম। রমু হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপটা বাঁধতে বাঁধতে কোনোমতে ঢুকিয়ে দিল গাড়িতে। অভিজিত আশ্বাস দিল জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে।

দলে আমরা চারজন। আমি, বড়ো ননদ, ননদাই—মানে, দাদা, বড়দি—আর এক বৈষ্ণব। দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন এঁকে দাদা, তীর্থ করাবার মানসে।

একই যাত্রার সঙ্গী—কী বলে এঁকে সম্বোধন করি? সোজাসুজি একটা কিছু ঠিক হয়ে গেলে আচারব্যবহার সহজ হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব বড়দিকে ডাকেন 'মা', দাদাকে 'বাবা'। সেই সম্পর্কে তো আমি তাঁর মামিমা। সম্পর্ক যেখানে গুরুগম্ভীর, বাৎসল্য সেখানে আপনিই আসে। তবু খানিক বিব্রত বোধ করি। বড়দি বললেন, 'ভাগ্নে সম্পর্ক, নাম ধরেই ডাকো।' বৈষ্ণবও বোধ হয় সুযোগ খুঁজছিলেন—আচমকা কাছে এসে অপ্রস্তুত হবার অবকাশ না দিয়ে খপ্ করে প্রণাম করে বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'মামিমা, ভাগিনাকে তো নাম ধরিয়াই ডাকিবার কথা।'

ব্রজরমণ পণ্ডিত লোক—ধীর বিনয়ী ভক্তিমান। সব সময়েই সংকুচিত হয়ে থাকে—কী দোষ কার কাছে করে ফেলে পাছে। বিনয় বৈষ্ণবের ভূষণ—ব্রজরমণ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

ব্রজরমণ ভালো হিন্দি বলতে পড়তে পারে। পরিষ্কার উচ্চারণ, অথচ বাংলা কথায় 'সিলেটি' টানটা এড়াতে পারে নি এখনো।

পাশের বেঞ্চিতে দুই মারোয়াড়ি; বয়স কত আর হবে—বাইশ তেইশ চব্বিশের কাছাকাছি। কিন্তু এরই মধ্যে কী বপু বানিয়েছে! দেখে মায়া হয়। বপু হবে নাই বা কেন? কী খাওয়াটা খেল একটু আগে—মুখোমুখি বসে। থাক্ থাক্ পুরি তরকারি, এর পর সন্দেশ-রসগোল্লার দোকান যেন উজাড় করল মুহূর্তে। এক-একটা সন্দেশের আকার কী! যুদ্ধ লেগে অবধি এত বড়ো সন্দেশ দেখি নি ক বছর।

মুখজোড়া 'হাঁ' করে ঠেসে ঠেসে ভিতরে পুরছে বাদামপেস্তায় ঠাসা সবুজ হলুদ সাদা স্বদেশী সন্দেশ উপুড় হয়ে। রসগোল্লা তুলে নিচ্ছে পাতে হাঁড়ি থেকে খাব্‌লা দিয়ে। গোনাগুনতির পরোয়া নেই। দেখে দেখে থ' বনে রই।

আলাপী দাদা শুয়ে শুয়েই কথা জুড়লেন তাদের সঙ্গে। বলেন, 'দু-দুটো দিন একসঙ্গে যাচ্ছি— আলাপ-পরিচয় রাখা ভালো।' তারাও চলেছে হরিদ্বারে, 'কাশী বিশ্বনাথ সেবা-সমিতি'র তরফ থেকে। সেখানে যাত্রীদের সেবা করবে এই মহৎ উদ্দেশ্য তাদের। তাই বুঝি এত ঘটা করে বিদায়-সম্বর্ধনা হল স্টেশনে। দশ-বারো জন মারোয়াড়ি দশ-বারোটা গোড়েমালা তাদের গলায় দুলিয়ে জয়হুংকার ছাড়ল কত, ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে। সেই হতে বড়দির কেমন একটা সশ্রদ্ধ গদ্‌গদ ভাব এদের প্রতি। বলেন, 'বুঝলে? এরাই হল সত্যিকারের সেবক।' সেবা-সমিতির তরফ থেকে বিধিব্যবস্থা করতে চলেছে এরা আগে হতে। পরে ভলেণ্টিয়াররা বহু বহু জায়গা হতে আসবে তাদের কাজে যোগ দিতে। প্রথম কাজ জলসত্র খোলা ; বলে, 'মোশয়, সেখানে যতো যাত্রী আসবে তাদের পয়লা আমরা পানি পিয়াবো। দ্বিতীয় কাজ হোবে, যাত্রীদের খিলাবো— এই পুরি তরকারি মিঠাই। দুকান ভি রহিবে। তৃতীয় কাজ শবদেহ সৎকার করিবো। বহুৎ যাত্রী মরে ভি যায়— ইস্নান করতে আসিয়ে।'

এদের দ্বিতীয় দফার সেবার কাজ শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম— ভেবেছিলাম বলব, ওটা না-হয় ট্রেন থেকেই শুরু করো— আমরাও তো তীর্থযাত্রী, চলেছি সেখানে। কিন্তু তৃতীয় দফার সেবার বিবরণ মিইয়ে দিল সে আগ্রহ। কে জানে, বলতে নেই, তীর্থস্নানে সেবা-সমিতির সেবা চেয়ে কি কথা রাখার দায়ে পড়ব শেষটায়?

তারা মহা উৎসাহে ব্যাগ খুলে হিন্দিতে ছাপা কার্যবিবরণী বের করে দেয় দাদার হাতে— কত কত কাজ করেছে তার হিসাব গাঁথা। ধৈর্যের সঙ্গে দাদা পড়েও ফেলেন সবটা ; বলেন, 'সময় নষ্ট করি কেন? হিন্দিটা রুস্ত হয়ে থাক্‌ খানিক।' দাদা যতই কষ্ট করে পড়েন, মারোয়াড়িদের ফুর্তি তত বেড়ে যায়। উঠে উঠে বেঞ্চি ডিঙিয়ে ঝুঁকে পড়ে বারে বারে বুঝিয়ে দেয়, 'এই যে ছবি দেখছেন, এ মোশয় ক্রোড়-পতি। কম্‌সে কম হাজার লোককে খানা খিলাচ্ছে। কেত্তো জায়গায় সেবাব্রত করিয়েছে।'

ভাবি বলি, করবে না? যত বেশি ঘিউএ ভেজাল দিয়েছে তত বেশি দান-খয়রাত করেছে।

ট্রেনে যখন সময় কাটতে চায় না তখন ঘুমের মতো জিনিস নেই। সকালে চা খেয়ে এক ঘুম দিলে— দুপুর। দুপুরে 'বল্লভদাসের থালি'র পরে আর-এক ঘুমে সেই বিকেল। বিকেলে চোখ রগড়ে উঠে বসলাম। কেমন শির্‌শির্‌ করছে গা। আজই ভোরে ফৈজাবাদে 'তাজা খবর'ওয়ালা ছোকরা পত্রিকা দিয়ে গিয়েছিল। খবর ছিল— বেলুচিস্তানে বরফ পড়েছে, একটা cold wave ঠেলে আসছে। এখানে ওখানে জল ঝড় কত কী। ঘাব্‌ড়ে গেলাম। cold wave কি ট্রেনের কামরার ভিতরেও এসে ঢুকবে? না হয়তো।

গোধূলি লগ্ন। দূরে ধুলোর ঝড়, ঝাপ্‌সা হয়ে আছে চার দিক। তারই আড়ালে ম্লান সূর্য অস্ত যায় পশ্চিমাকাশে ঘন বনানীর নীচে। কামরার এক

কোনায় স্থির হয়ে বসে আছেন বড়দি।

উতলা মনকে নিয়ে বোঝাপড়া করার লগ্ন, দিনান্তের এই মুহূর্তখানি। সব কিছু চঞ্চলতা শান্ত করে এনে কোন্ তন্ময়তায় ডুবিয়ে দেয় সমস্ত মনটাকে—হিসাব পাওয়া যায় না তার। আধো-জানা আধো অচেতনার এ এক অদ্ভুত আত্ম-বিস্মৃতির অনুভূতি। হঠাৎ সুগন্ধ দুর্গন্ধ মিলে বিদ্ঘুটে একটা গন্ধে বিগড়ে দিল মেজাজটা। চোখ খুলে দেখি, সামনের বেঞ্চিতে সামনাসামনি, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে—গাঁজার কলকে চিনি—সেইরকম সরু কলকেতে পরিত্রাণে এক-এক টান দিয়ে হাতবদল করে চলেছে শ্রীমানরা। থামে না। ফুরিয়ে গেলে আবার কলকে সাজায়, আবার টানে টানে আগুন নেভায়। চলল রাত আটটা পর্যন্ত এইভাবে।

বড়দির মুখ গম্ভীর। পিছন ফিরেই বসেছিলেন, আরো পিছন ফিরবার মানসে নড়েচড়ে বসলেন। ঘরে বাইরে পথ চলতে দু পাশে বড়দির সন্তানের ছড়াছড়ি। সকলেই তাঁর 'বাবা' 'বাছা'। এই একটু আগেই দিনের আলোতে বড়দি বলে-ছিলেন এদের, 'বাবারা, যদি তোমাদের মেয়ে ভলেণ্টিয়ার দরকার হয় তো আমাদের বোলো। আমরা দুজন রোজ কিছুক্ষণ করে তোমাদের সেবা-সমিতির কাজে লাগতে পারব—কী বলো গো রানী?' বলি, 'মন্দ কী? ফিরে যাবার খরচটা যদি দিয়ে দেয়।'

সেবাধর্মের সঙ্গে স্বার্থ জড়াতে দেখে বড়দি বিচলিত হন। বারে বারে 'বাবা'-দের কাজ কত মহৎ তার ব্যাখ্যা করতে থাকেন। সেই বাবাদের কিনা শেষে এই আচার? গাঁজার পর্ব মিটলে বল্লভদাসের মস্ত মস্ত থালা কোলে টেনে নিয়ে বসে। গোগ্রাসে শেষ ক'রে, প্রাণপাত-করা বিদ্ঘুটে রকমের কতকগুলো ঢেকুর তুলে লাল লাল চোখ মেলে দাদাকে বলে, 'মোশয়, ইস্পেশাল অর্ডার দিয়ে হামি পরোটা করিয়েসি। বলেসি, দাম্কা লিয়ে ভাবনা মত্ করো। জিত্না আচ্ছা হোয় লিয়ে এসো। বাড়িতে ভি এরকম পরোটা নেই খাইয়েসি। সে বরষ হামি হামার wife কে লিয়ে গিয়েসি—রাস্তামে খানা আচ্ছা নেই মিলেসে। আজকা খানা বহুত আচ্ছা আছে। মনমে হোয়েছে কি ঘরকা খানা খায়েসে। লেকিন দাম কিছু বেশি লিয়েছে।'

বলি, 'জিজ্ঞেস করো না বড়দি, খরচটা কাদের? ওদের না সেবা-সমিতির?'

বড়দি মুখ ফিরিয়ে নেন।

এখনো সুবাস ছড়াচ্ছে বেল-জুঁইয়ের বাসি গোড়েমালাগুলি, কামরার কাঠের গায়ে গাড়ির ঝাঁকুনিতে থেঁতলাতে থেঁতলাতে। ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে গরম কাপড়ের ভিতর দিয়ে। কাঠের খড়খড়ি, কাঁচের জানালা সব বন্ধ করে এঁটেসেঁটে শুয়ে আছি কম্বল ঢাকা দিয়ে—তবু রক্ষে নেই। দু হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুললাম, কম্বলের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে নিলাম—শুনেছি নিশ্বাসে তাড়াতাড়ি গরম হয় গা। কিন্তু কই, নিশ্বাসও বরফ হয়ে চাপ বাঁধছে যেন। তবে কি আমরা বেলুচিস্তানেই গিয়ে পড়লাম শেষে? মনে হচ্ছে যেন বরফের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি—হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, পা অবশ হয়ে এল, মাথাটাও কেমন জমাট বাঁধল। না, আর সয় না। একটু ঘুমোতে চাওয়ার কী যাতনা! এর চেয়ে জেগে

থাকা ঢের ভালো। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে হাঁকডাক করে গল্প জুড়ে দিই। বাকি রাতটুকু কেটে যায় কোনোমতে। সকলেই এক গবেষণায় মত্ত—চার দিকে আঁটসাঁট, এমন কড়াভাবে বন্ধ, তবু এই হাড়কাঁপুনি হাওয়া ঢুকল কোন্ ফাঁক দিয়ে? যাক, জয় জয় বাবা বিশ্বেশ্বর! হরিদ্বারে এসে ট্রেন থামল। মালপত্র নামানামি ওঠাওঠি করে দুটো টাঙ্গার সওয়ার হয়ে চললাম চারজনে কন্‌খলে।

দাদা বললেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনমে চল্‌না।' রামকৃষ্ণ মিশন বলতে টাঙ্গাওয়ালা বুঝতে পারে না। বলে, 'মিশন কেয়া মালুম নেহি। বাঙ্গালি হাসপাতাল?'

দাদা বলেন, 'হাঁ হাঁ, ওহি হ্যায়—উধরই চলো।' বাঙালি হাসপাতাল বলেই চেনে এখানকার লোক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমকে। অন্য কথায় গোলমাল করে বুঝতে। টগ্‌বগিয়ে ঘোড়া ছোটে পরিষ্কার বাঁধানো রাস্তা ধরে। ঘন কুয়াশা কাটে নি তখনো চার দিকের। লোকের ভিড় জমে নি পথে। ঝাড়ুদার গঙ্গামাঈকি জয়ধ্বনি দিতে দিতে ঝাড়ু বুলোয় ধুলোর গায়ে। খ্যাপা বৈরাগী কাঠের খট্‌খটি বাজিয়ে আপন মনে গেয়ে চলেছে মীরার ভজন—এক পাশ ধরে। পাতলা নামাবলী হাওয়ায় খসে পড়ে কাঁধ হতে—সে খেয়াল নেই মোটে। বাঁধানো ক্যানেলের ভিতর দিয়ে হুড়্ হুড়্ করে ঘোলা জলের স্রোত বয়ে চলেছে শহরের ভিতর দিয়ে। টাঙ্গা চলেছে বরাবর সে পথ ধরে। এইই নাকি গঙ্গা। হরিদ্বারের গঙ্গার রূপের বর্ণনা কত শুনেছি, কল্পনায় কত এঁকে রেখেছি—আর প্রথম দেখাতেই কিনা ধাক্কা লাগল মনে। ঘোলা জলের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে গাঁদাফুলের হলুদ মালা একগাছি। কার পুজোর ফুল দিয়েছে ভাসিয়ে মা গঙ্গার বুকে কী জানি। ছুটে চলল কোথায় সে? বাধা মানে না কারুর। হাত ছিট্‌কে পাশ কাটিয়ে ফস্‌কে পালায়। ঐ তো, এখনো দেখা যায়—শাল গাছটার গুঁড়ির ফাঁকে। ঐ, ঐ যে, যাঃ—চলে গেল এইবার পুল পেরিয়ে চোখের আড়ালে।

টাঙ্গা এসে থামল হলুদ রঙের দেয়াল-ঘেরা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে।

স্বামীজিদের খবর জানানো হয়েছিল আগে হতেই। তাঁরা এসে নিয়ে গেলেন আমাদের নির্দিষ্ট তাঁবুতে। ঝাপ্‌সা আমবাগানের তলায় পর পর কতকগুলি তাঁবু। আমপাতা বেয়ে টস্ টস্ করে শিশির পড়ছে তাঁবুর গায়ে, আমাদের মাথায়, মুখে। ভেজা ঘাসের নীচে নরম কাদামাটি—ছপ্ ছপ্ করে প্রতি পদ-ক্ষেপে। ভারি বৃষ্টি হয়ে গেছে দুদিন আগে। স্বামী অনুভবানন্দ বললেন, 'রোদ উঠলেই শুকিয়ে যাবে সব, মাটিও শক্ত হবে। আসুন, আগে গরম গরম চা খেয়ে নিন। যে শীত, আরাম পাবেন।'

আমতলা থেকে একটু দূরে রান্নাঘর। রান্নাঘরের দাওয়ায় কুশাসন পাতা। টিনের ছোট্ট মগে গরম চা। অন্য সময়ে গরম-চা-ভরা টিনের মগ ধরতে আঁচল টেনে হাতে জড়িয়ে নিই; আর এখন খালি হাতেও হাতের আঙুল বেঁকে থাকে, সোজা হয় না শীতে। মগ ধরব কী করে? আমাদের মধ্যে দাদাই কাবু বেশি। দু হাতের আঙুল থর্ থর্ করছে। রুটি ছিঁড়তে চান—কাঁপতে কাঁপতে আঙুল ফস্‌কে যায় রুটির গা থেকে। সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা সেবার মূর্ত প্রতীক, প্রতিটি যাত্রীর জন্য তাঁদের যত্নের অবধি নেই। এক ব্রহ্মচারী বড়ো বড়ো লোহার হাতায়

গনগনে কাঠের আগুন এনে সামনে রাখলেন। তার উপরে হাতের এপিঠ ওপিঠ সেঁকে নিয়ে গরম চা মুখে তুলি; আটার রুটি, আখের গুড়ে অমৃত-আস্বাদ পাই। আর ভাবি, এমনি একটা আগুনের আংটা যদি গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারতাম— কাপড়ের আড়ালে—আঃ, স্বর্গসুখ অনুভব করতাম বুঝি-বা।

তাঁবুতে ফিরে আসি। এক দুই তিন চার—নম্বর-লাগানো তাঁবু। এক নম্বরেরটা আমাদের। মেঝে-জোড়া চাটাই বিছানো, লোহার স্প্রিংএর খাট, যেন মস্ত বড়ো ঘর একটি। ঘরের আরাম, বাইরের নির্ঝঞ্ঝাট, দুই মিলিয়ে তাঁবুর মোহ আমার বরাবরের। খুশি হয়ে উঠি।

বড়দি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলতে হবে। আপাতত এখানেই আমাদের ঘরসংসার কিছুকালের জন্য। স্তূপাকার মালপত্র। এত জিনিস কী করে এল সঙ্গে? ঠেলেঠুলে ভাগ্নেরা ঢুকিয়ে দিয়েছিল ট্রেনে বেঞ্চের নীচে— হাওড়া স্টেশনে; টের পাই নি তখন কিছু। অথচ বড়দি এবার কড়া নজর রেখে-ছিলেন, মালপত্র বেশি না হয় যাতে। নানা জায়গায় ঘুরতে হবে—যত হালকা থাকা যায় ততই ভালো। বারেবারে আমাকে সাবধান করেছেন লিখে, 'কিছু যেন এনো না সঙ্গে, খানকয়েক কাপড় জামা ছাড়া। বিছানারও দরকার নেই, আমি যা নেব তাতেই তোমার হবে।'

দাদা ইশারায় বলেন, 'এ আর কী দেখছ? ঐ সবুজ মিলিটারি থলিটা, বেতের ঝুড়িটা খুলে দেখো—'নেই' হেন জিনিস নেই তাতে।'

গোছাবার ভান করে থলিটা খুলে ফেলি। ঘটি, মগ, জলের কুঁজো, বিস্কুটের টিন; কেট্‌লি, স্পিরিট, স্টোভ; গামছার কোনায় বাঁধা হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, পিতলের ঘটি ভরা আতপ চাল; তার ভিতরে চেপে বসানো কাঁচের শিশিতে সরষের তেল, টিনের কৌটো ভরা চিনি, নুন; ছুরি, কাটারি, কুকার; চুন—পান খেতে যদি না পাওয়া যায় বিদেশে বিভুঁয়ে? ভেলকিবাজির মতো বের হচ্ছে তো বের হচ্ছেই। লোহার সাঁড়াশি, খুন্তি; কেরোসিনের লণ্ঠন দুটো; মাথার তেল, গ্লিসারিন, হজমি গুলি—কত কী!

দাদা বললেন, 'ঠিক ছিল, মাথা-প্রতি আমরা দুটো করে লগেজ নেব; তোমার বড়দি সেইমতো সব নিজের হাতে গোছাতে গিয়ে এতে ওতে মিলিয়ে কী দিয়ে যে কী করলেন শেষ মুহূর্তে—নির্বিবাদী মানুষ আমি, বসে বসে দেখলাম খালি। গোনো তো ক'টা আছে সবসুদ্ধ।'

গুনে দেখি, বেশি না—মাথা-প্রতি দুটোর জায়গায় ছটা করে হয়েছে মাত্র। বড়দি ওদিকে কী কাজে বাইরে গিয়েছিলেন; এসে বললেন, 'রানী, তোমার শালটা? কই গায়ে তো নেই দেখছি?'

হরিদ্বার স্টেশনে কন্‌কনে হাওয়া। আমার গায়ে খস্‌খসে কম্বলের লম্বা কোট। তাই আমার শালখানাও জড়িয়ে দিয়েছিলাম বড়দির গায়ের সাদা শালের উপরে। ভেবেছিলাম, দুখানাতে আরাম পাবেন খানিক। এতক্ষণে খোঁজ পড়ল, উপরের শালখানা অজানতে কোথায় পড়ে গেল। খুঁজে খুঁজে হয়রান বড়দি। কোথাও নেই। বড়দি বলেন, 'কী হতে পারে?'—বলি, 'একমাত্র সম্ভব—টাঙ্গাতে পড়ে গিয়ে থাকবে। নামবার সময়ে নজর করি নি কেউ।'

'কখন পড়ল, কী ভাবে পড়ল, টের পেলাম না একটু!' বড়দির ভাবনা বেড়েই চলে।

বলি, 'মনে করো-না কেন, তীর্থস্থানে সর্বপ্রথম দান করেছ ওটাকে, তবেই তো হয়।'

কিন্তু তা মানেন না তিনি। ঘোরেন ফেরেন, চাদর বালিশ ঝাড়েন, আর নিজের মনে দুঃখ গেয়ে চলেন, 'ছি ছি, কী করলাম আমি! আজকালকার দিনে একটা জিনিস জোগাড় করা কত কষ্ট—'

এমন সময়ে দু হাত পিঠের দিকে ঘুরিয়ে তাঁবুর সামনে টাঙ্গাওয়ালা এসে হাজির, 'মাঈজি, বক্‌শিশ মিলনা চাহিয়ে।'

বড়দি একমুখ হেসে 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুর, জরুর বকশিশ মিলেগা' বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দু হাতে শালখানা নিয়ে তাঁবুতে ঢোকেন।

দাদা বললেন, 'আশ্চর্য! টাঙ্গাওয়ালা নিজে হতে ফিরিয়ে না দিলে কী করতে পারতাম আমরা! অচেনা জায়গা, অচেনা লোক!'

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে বড়দি মাথায় তেল মাখেন। বলেন, 'চলো এবার গঙ্গাস্নান করে আসি। এলাম এত করে—আজ প্রথম দিন—গঙ্গা নাইব না সে কেমন কথা?' কাপড় গামছা নিয়ে বড়দি তৈরি দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসেন স্বামীজিরা। 'অমন কাজ করবেন না কিছুতে। আজ তো নয়ই, আজ কেন—কালও নয়, পরশুও নয়। এখন তিন-চার দিন ভালো চান তো নামবেন না গঙ্গাতে। জানেন না কি দুদিন আগে বরফ পড়েছে মুসৌরীতে ছ ইঞ্চি? বরফ-গলা জল বইছে গঙ্গাতে—ঘোলা জল, আসবার সময় তো পথেই দেখলেন। এখন গঙ্গায় নামা মানেই পেটে ঠাণ্ডা লাগা। এসেছেন বেড়াতে, পুন্যি করতে—মাঝ থেকে অসুখে ভুগে লাভ কী বলুন? কলে জল আছে, চাই কি কিছু গরম জল বালতিতে মিশিয়ে বাড়িতেই স্নান সেরে ফেলুন।'

কী আর করেন—ক্ষুণ্ন মনেই ফিরে আসেন বড়দি।

নতুন জায়গায় এসে মন মানে না একখানে এক ঠাঁইয়ে বসে থাকতে। স্নানের শেষে চুল শুকোতে রোদের আশায় এক-পায়ে দু-পায়ে ঘুরি বাইরে। ব্যাণ্ড্ বাজিয়ে কিসের এক শোভাযাত্রা চলেছে সামনের পথ দিয়ে। এদিক ওদিক থেকে সকলেই ছুটল সেদিকে ব্যাপার দেখতে। চিরুনি হাতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আমিও ছুটলাম বড়দিকে টেনে নিয়ে। 'আমিই বা বাদ যাই কেন' বলে দাদাও বিছানা ছেড়ে বাইরে এলেন—বিশ্রাম নিচ্ছিলেন একটু পথের ক্লান্তি দূর করতে।

মস্ত মিছিল পথ জুড়ে। আগে আগে চলেছে ঝলমল সাজে ব্যাণ্ড্‌পার্টির দল—বাজনা বাঁশি বাজিয়ে। পিছনে গাঁদাফুলের-মালা-জড়ানো বাঁশের লম্বা ডাণ্ডায় গেরুয়া পতাকা সামনে উড়িয়ে চলেছেন জোড়া জোড়া শতেক সাধু লাইন বেঁধে। মাঝখানে সুসজ্জিত হাতির পিঠে রুপোর সিংহাসনে মঠের মহান্ত বসে। চামর ব্যজন করছে দু জন দু দিক থেকে। হেলে দুলে হাতি চলেছে—সে দোলায় সিংহাসন দুলছে, মহান্ত দুলছে, দুলছে নিশানের মালা। তীর্থ উপলক্ষে মহান্ত এলেন এখানে বাইরে হতে, তাই এই সমারোহের অভ্যর্থনা। 'এখন থেকে সকাল

বিকেল এইরকম দেখতে পাওয়া যাবে কতবার এখানে,' পাশ থেকে বললেন একজন বাসিন্দা। এক এক করে সব সম্প্রদায়ই আসবেন পূর্ণকুম্ভে।

দুপুরে ভোগ খেলাম। সাদাসিদে ডাল ভাত রুটি তরকারি চাটনি দই। নিরামিষ—চমৎকার আস্বাদ। স্বামীজিরাই রাঁধেন, তাঁরাই পরিবেশন করেন। দায়-সারা কর্তব্য নয়। এঁদের নিষ্ঠা অন্তর স্পর্শ করে। তাই কত সহজে তৃপ্তি আসে। চার দিক পরিষ্কার ঝকঝকে। রান্নাঘরে জলকাদার চিহ্ন নেই। রান্নাঘরের সামনেই ফুলের বাগান। বাগানের মাঝখানে রামকৃষ্ণদেবের মন্দির। মন্দিরে রামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ফোটো—ফুলে চন্দনে সুশোভিত। চিক-ফেলা দরজা—সুন্দর ছোট্ট মন্দিরের ঘরখানা। ঠাণ্ডা শীতল। ঘরে ঢুকে খানিক বসে থাকতে মন চায় আপনা হতেই। দরজার বাইরে এক কোনায় কাঠের বাক্সতে যত্নে রাখা প্রসাদী চন্দন, চরণামৃত। স্বামীজিরা স্নান সেরে এক এক করে গিয়ে বাক্সের ঢাকনা খুলে চরণামৃত নিয়ে চন্দনের টিপ কপালে লাগিয়ে চলে আসছেন। দেখাদেখি বড়দি আমিও গেলাম।

ফুলের বাগানের মাঝখানে একটা উঁচু আমগাছ। আমগাছের মাথা ছেয়ে উঠেছে এক ফুলের লতা—নাম জানি না, অথচ দেখি হামেশাই—শৌখিন বাগানের গেটের মাথায়—লম্বা লম্বা কুঁড়ির মতো থোকা থোকা। ঘন গেরুয়া রঙের ফুল-গুলি, যেন সন্ন্যাসীর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে আমপাতার সবুজ ঢেকে। অনেক দূর থেকে দেখা যায় তা। আজ যখন বাইরে গিয়েছিলাম, দূর থেকে এই গেরুয়া রঙের ধ্বজা দেখেই চিনেছিলাম বাড়ি।

সেবাশ্রমই বটে। গরিবদের আর সাধুদের হাসপাতাল। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছে ছিল—হরিদ্বার তপোভূমি, কত সাধু আসেন, সাধুদেরও তো অসুখ হয়; বিনা চিকিৎসায় কত কষ্ট পান—তাঁরা যাতে রোগে সেবাযত্ন পেয়ে সুস্থ হন, আরাম বোধ করেন, সেইজন্যেই এই হাসপাতালের সূচনা। কত সন্ন্যাসী এখানে তাঁদের অন্তিম নিশ্বাস ফেলেছেন—একমাত্র সম্বল তাঁদের সেই নারকেলের মালার ভাঙা কমণ্ডলুগুলি সেই কথা জানায়। গরিবদুঃখীরাও স্থান পায় এখানে। টাঙ্গা-ওয়ালার হাত-পা কেটে গেছে, আসে এখানে। ভিখিরির কলেরা হলে, আসে এখানে। যাত্রীরা হঠাৎ কাবু হয়ে পড়ে রোগের আক্রমণে, আসে এখানে।

সেবাশ্রমের পিছন দিকে সবজি-খেত। বাঁধাকপি ফুলকপি মুলো বেগুন টমেটো পেঁয়াজ—খেত ভরা; দেখে কত খুশি হয়ে উঠি। বড়ো-বড়ো কপি—বীরভূমের লাল মাটিতে এত বড়ো কল্পনাও করতে পারি না। আর এখানে কত অল্প আয়াসে এত ভালো সবজি হয়। তা ছাড়া সেবাশ্রমের ভিতরে এখানে ওখানে লেবু কাগজি কলা বেল আম নিম আমলকী—কত কী গাছ। গাছে গাছে ঢেকে রেখেছে জায়গা। শান্ত পরিবেশ, নির্ঝঞ্ঝাট গৃহস্থালি। এঁরা নিজেরাই কুটনো কোটেন, আমের দিনে আমের আচার দেন; তালাই বিছিয়ে নুন-মাখা আমলকী রোদে শুকিয়ে রাখেন—সুস্বাদু মুখশুদ্ধি। ডাল লঙ্কা ঝেড়ে ভাঁড়ারে তোলেন। এইসবের সঙ্গে আছে রোগীর সেবা, অতিথির পরিচর্যা। সবই হয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটার তালে, নিঃশব্দে। আমরা মেয়েরা হার মানি মনে দ্বিধাশূন্য হয়ে।

বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম পথে পায়চারি করতে করতে। বাড়ির সামনেই

'নিঃশুল্ক-বাচনালয়', নির্বাণী আখড়ার। সন্ন্যাসীরা যাত্রীরা বিনা খরচে সব-কিছু কাগজ বই পড়তে পায়। এখানে এইরকম অস্থায়ী বাচনালয় আরো কয়েকটা খোলা হয়েছে রাস্তার উপরে। উন্মুক্ত জায়গা, সামিয়ানায় ছাওয়া, চেয়ার টেবিল বিজলি বাতি, দড়িতে ঝোলানো খবরের কাগজ, রঙিন ছবির প্রিণ্ট, বই, কিছুরই অভাব নেই। দিনে রাতে খোলা থাকবে, কুম্ভ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। আসবার সময়ে রাস্তায় যেটা দেখে এলাম তা খুলেছেন উদাসী সম্প্রদায়ের এক পাঞ্জাবি সাধু, পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে।

নির্বাণী আখড়ার ভিতরে সারি সারি চালাঘর উঁচু ঢিবির উপরে, সম্প্রতি বাঁধা হয়েছে সাধুসন্তদের জন্য। চার দিক ঘেরা, একটি কেবল দরজা, খুপ্রি খুপ্রি ঘর। লম্বা দোচালা ঘরকে ভাগে ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেন। কেউ-বা তাতে একলা থাকবেন, কেউ-বা ওরই মধ্যে আরো চার-পাঁচজনকে নিয়ে থাকবেন। বেশ কয়েকজন এসে গেছেন এরই মধ্যে। আরো আসবেন শিগগিরই। শেষ দিকে স্থানেরই অকুলান হয় বেশি। তখন ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলি— অগত্যা গাছতলা। প্রত্যেক খুপ্রিতেই একটা করে ধুনি জ্বলতে থাকে, ঠাণ্ডা মাটির উপরে। তাই ভাবি— নয়তো থাকবেন কী করে এঁরা? ধুনির আগুনে গরম হবে ঘর।

নির্বাণী আখড়ার বিপরীতে রাস্তার এপাশে 'হরিহর-মঠ'। পাথরের উঁচু শিবমন্দিরের মাথার ত্রিশূল গগন ভেদ করে উঠেছে মেঘের গায়ে। ভিতরে শিব-লিঙ্গ; আর চার দিকের চার দেয়ালে গণেশ পার্বতী বিষ্ণু সূর্যের পাথরের মূর্তি— জয়পুরের কারিগরের হাতের তৈরি। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে— দরজার লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম দেবতাদের। তেল-চক্চকে রঙ লাগাচ্ছে বাইরে ভিতরে নতুন করে, যাত্রীদের আকৃষ্ট করবার জন্য— গোলাপি নীল সবুজ হলুদ বেগুনিতে পাথরের দেয়াল দরজা লেপে দিয়ে।

বড়দি বললেন, 'চলো মন্দির প্রদক্ষিণ করি।'

খানিকটা যেতেই বড়দি টেনে আনলেন আমাকে; বললেন, 'আর না, শিবের মন্দিরের অর্ধেক পরিক্রমা করে— এই নিয়ম।'

মন্দিরের পিছনে মস্ত এক দালান; সামনে মাঠ, বাঁয়ে উঠোন। উঠোনের পাশে বাঁধানো কুয়ো। কুয়োর পাড় জুড়ে ছায়া ফেলেছে পুরোনো বটগাছ। দালানের সামনে চওড়া বারান্দা। বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। কোনাকুনি— সেই রোদে খাটিয়া পেতে শুয়ে গ্রন্থ পড়ছেন বৃদ্ধ সাধু এক। সিঁড়ির দু পাশে কনকধুতরো গাছ। ঘন বেগুনি রঙের কুঁড়ি ধরেছে অনেক। একটি কনকধুতরো ফুটে আছে গাছে। কাল হয়তো লাগবে পুজোয় এটি। কী সুন্দর ফুলগুলি, যত্নে কেউ বসিয়ে দিয়েছে যেন একটির মধ্যে আর-একটি তুলে এনে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম সাধুর কাছে। সাধু মুখ থেকে বই সরিয়ে দেখলেন আমাদের। বললেন, 'মেহেরবানি করকে বৈঠিয়ে।' বলে হাতের ইশারায় বারান্দার মেঝে দেখিয়ে দিলেন। বসে পড়লাম এক এক করে সবাই। বৃদ্ধের কথাগুলি বড়ো মোলায়েম। বেদান্ত সম্প্রদায়ের মন্দির এটি। বললেন, 'কাল মহান্ত আসবেন এগারোটার গাড়িতে। তখন এলে তাঁকে দেখতে পাবে। কুম্ভ পর্যন্ত এখানেই থাকবেন। পাশেই তো সেবাশ্রম— যখন যা ইচ্ছে, এসে তাঁর সঙ্গে কথা-

বার্তা বোলো।'

হরিহর-মঠ থেকে বেরিয়ে দেখি, রাস্তায় আর-এক শোভাযাত্রা। আবার সেই ব্যাণ্ডপার্টি, হাতি, ঘোড়া, উট, গোরু, ছাগল, সাধুসন্ত, মহান্ত, নাগা, চামরব্যজন, ধ্বজদণ্ড, 'আসাসোটা'—মানে রুপোর লাঠি। এ'দের রক্ষীদলের হাতে রুপোর লাঠি থাকে। এ'রাও সাধু, ধাপে ধাপে উপরে ওঠেন ক্ষমতা অনুসারে। পুরো দল চলেছে রাস্তা ভরাট করে।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম নাগা সাধুদের স্কেচ করতে করতে—খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে। যেতে যেতে জানতে পারি তাঁদেরই একজনের কাছ হতে—কাশী থেকে আসছে এ দল ; তিন বছর ধরে এমনিভাবে হে'টে হে'টে। তাড়াহুড়ো নেই, হৈ হৈ নেই, দিনে তিন-চার ঘণ্টা হাঁটে, রাস্তার পাশেই থেমে বিশ্রাম নেয়, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া করে নিদ্রা যায়—পরদিন আবার রওনা দেয়। কাছাকাছি গাঁ থাকলে তারাই সেবার ভার নেয়। এই করে করে আজ এসে পে'ছিল দল হরিম্বারে। কয়েক মাস থাকবে, পরে আবার এইভাবেই রওনা দেবে—অন্য কুম্ভ পর্যন্ত। নাগাগুলির খালি গা—শীতের এই কন্‌কনে হাওয়া, যেন হুল ফুটিয়ে দেয়, হাতের বুকের অবাধ্য মাংসপেশীগুলি থেকে থেকে কে'পে কে'পে উঠছে। গলায় গাঁদা-ফুলের মালা—দু হাত দু দিকে দুলিয়ে চলেছে, যেন ছোটো শিশু পা তুলে তুলে পা ফেলছে। সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এই দলকে হরিম্বারের মুখে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমরা।

হরিম্বার দেখা হয় নি এখনো। থাক্, দেখব পরে। কন্‌খলে আছি, এখানটাই আগে শেষ করি। কে যেন একজন কবে কোথায় বলেছিল যে, 'কন্‌খল' নাম হল কেন জান? এ এমনি পবিত্র জায়গা যে, এমন কোন্ 'খল' আছে যে এখানে এসে ডেকে ভগবানকে পায় নি! তাই তো নাম 'কন্‌খল'।

দক্ষরাজার রাজ্য বলেই প্রসিদ্ধ এ জায়গা। এখানেই দক্ষরাজকন্যা সতীর জন্ম, বিবাহ, দেহত্যাগ সব। সেবাশ্রম থেকে বেরিয়ে, বাজারের ভিতর দিয়ে, শহর পেরিয়ে উপস্থিত হলাম দক্ষঘাটে। রাজপ্রাসাদ ছিল সে সময়ে—এখন পর্যন্ত সে চিহ্ন কে রাখবে ধরে? তবুও চওড়া প্রাচীরের ভাঙা বিরাট ফটক মনে কল্পনা জাগায় সহজে। উপর দিকে তাকাতে তাকাতে আনমনা হয়ে এগোচ্ছি—কালো রঙের এক প্রৌঢ়া সুন্দরী সন্ন্যাসিনী কোত্থেকে হঠাৎ বেরিয়ে একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়ালেন ; মুখ-ভরা হাসি, যেন কতকালের আত্মীয়তা। বললেন, 'কবে এলে তোমরা?'

হক্‌চকিয়ে গেলাম। বললাম, 'আজ।'

'বেশ বেশ।'

বড়দি বললেন, 'আপনি তো দেখছি বাঙালিনী।'

'হ্যাঁগো, আমি তো বাঙালিনীই গো। তিরিশ বছর আছি সতীঘাটে। যাবে? চলো-না আমার সঙ্গে, নিয়ে যাই!' বলতে বলতে হঠাৎ চোখমুখ পাকিয়ে, মুখ বিকৃত ক'রে, 'আমি—হ'ঃ—অ'ঃ—অ'—' ব'লে সুর টেনে ধরে আরো কাছে চলে এলেন।

ভড়কে গিয়ে বড়দির আঁচল চেপে ধরি।

তীর্থস্থানে এসেছি, নতুন জায়গা, নতুন আবহাওয়া, যা দেখি সবই অপূর্ব লাগে চোখে। অগুনতি সাধুসন্তদের কত অলৌকিক ঘটনা দেখব শুনব মনে বাসনা—প্রথম দিনেই এ কী? দাদারা এগিয়ে গেছেন অনেকখানি, সন্ন্যাসিনীকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তাঁদের সঙ্গ নিলাম। শশী মহারাজ দেরি দেখে ফিরে আসছিলেন, একটু তিরস্কারের সুরেই বললেন, 'এসেছেন তীর্থে, রাস্তায় ঘাটে এরকম বহু দেখবেন ; দেখেই যাবেন, দাঁড়াবেন না কখনো।'

মনে কেমন ছায়া ঘনাল। সবাই যদি এমনি ছিটগ্রস্ত থাকে, ঠিক লোক বেছে বের করব তবে কী করে? এই তো একজনা—হাসিমুখে যখন এগিয়ে এল, কত ভালো লেগেছিল ; মুহূর্তে কেমন ভীতিসঞ্চার করে দিল।

দক্ষঘাটের ঠাণ্ডা জল এক আঁজলা নিয়ে চোখে কপালে দিলাম। চওড়া বাঁধানো ঘাট। পুরোনো বটগাছ ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাড় ছাপিয়ে গঙ্গার উপরে। শুক্‌নো গঙ্গা, পাথরের নুড়িতে ভরা। কেবল একটু জল থমকে থিতিয়ে আছে সিঁড়ির কাছে, ফুল-বেলপাতার আবরণের নীচে। ক্যানেল ডিপার্টমেণ্ট জল ছাড়ে দরকার বুঝে। কে বলবে দেখে যে এই শুকনো গঙ্গাই কূলে কূলে ভরে উঠবে কল্‌ কল্‌ গেয়ে দু দিন পরে। শিবরাত্রিতে যাত্রীরা আসবে এ ঘাটে পুণ্যস্নান করতে। রাতারাতি খোলা দরজা পেয়ে ছুটে চলবে গঙ্গা এই পথ দিয়ে।

ঘাটের পাড়ে শিবসতীর মন্দির আলাদা আলাদা। এখানেই কি সেই রাজ-প্রাসাদ ছিল? হবে হয়তো। প্রাসাদের লাগা'ই তো রাজঘাট থাকে। এই ঘাটেই হয়তো স্নান করতেন অন্দরমহলের পথ দিয়ে এসে রাজরানী রাজকন্যারা ; স্নান করতেন কুমারী সতী সখীদের নিয়ে রোজ সকালে পুজোর আগে। পুরোনো ইঁটের গাঁথনি, ভাঙা চওড়া চাতাল—কত কথা আনে মনে। বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় ঘেরা এ তল্লাট—খানিক বসে জিরিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

দক্ষঘাটের পরেই সতীঘাট। এ সতী সেই সতী নয়, মানবী সতী। ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় স্বামীর সঙ্গে এক অনলে পুড়ে সতী হয়েছেন এ ঘাটে যাঁরা তাঁদেরই এ ঘাট। প্রত্যেক সতীর জন্য এক হাত, দু হাত, তিন হাত উঁচু ছোটো ছোটো মন্দির গেঁথে রাখা হয়েছে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। কারো বা নাম তারিখ আজও আছে স্পষ্ট লেখা। উঁচু নিচু, ছোটো বড়ো, ভাঙা নিখুঁত, কত ইঁটের গাঁথনি অসংখ্য 'সতী'র প্রমাণ দেয় এখনো এখানে।

বড়দি বললেন, 'একবার ভেবে দেখো, কতবড়ো নিষ্ঠাবতী ছিলেন তাঁরা এক-একজনা।' বলে তিনি যতগুলিতে পারলেন, গিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে মাথা ঠুকলেন।

দক্ষঘাট সতীঘাট পেরিয়ে গঙ্গার পাড় ধরে কন্‌খল পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। শশী মহারাজ হাঁটতে বোধ হয় ভালোবাসেন, আমরাও বাসি, কিন্তু তিনি যেভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে চলেন, তাল রাখতে হাঁপিয়ে উঠি। লজ্জায় বলতেও পারি নে কিছু ; উলটে যখন জিজ্ঞেস করেন 'কী, কষ্ট হচ্ছে না তো?' জোর গলায় চেঁচিয়ে বলি, 'কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না।' আর নিচু গলায় আক্ষেপ করি বড়দিতে আমাতে।

শশী মহারাজ বললেন, 'এখান থেকে আর একটু দূরে সতীকুণ্ড। নিয়ে যাব আর-একদিন সেখানে। বনের মাঝে একটা জায়গায় গর্ত—এখন সেখানে জল জ'মে ;

লোকে অনুমান করে, ঐখানেই দক্ষ যজ্ঞ করেছিলেন—যজ্ঞকুণ্ড ওটা। একটা জায়গায় পুরোনো ইঁটের বেদীমতো পাওয়া যায় দেখতে, বনে জঙ্গলে ঢেকে আছে জায়গা। কে আর অত ঐতিহাসিক প্রমাণের জন্য মাথা ঘামায়—সহজ মনে বিশ্বাস করে নিলেই হল।'

যেতে যেতে 'পানচাক্কি'তে এসে পড়ি। যে গঙ্গাকে বাঁধ দিয়ে শহরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তারই স্রোতে চাকা ঘুরিয়ে গম থেকে আটা বের করে নিচ্ছে বস্তা বস্তা রোজ এখানে। ছল্ ছল্ কল্ কল্ গঙ্গা বিনা কাজে নেচে গেয়ে চলে যাবেন সে উপায় নেই।

ফিরতি পথে শহরের ভিতর দিয়ে ক্যানেলের পাড় ধরেই ফিরি। দু পাশ সবজির খেত আর ফলের বাগানে ঠাসা। রাশি রাশি সবজি, ফল। রাঙা-মাটির দেশে থাকি—সবুজ তরকারির এই ছড়াছড়ি দেখে বুকটা কেমন করে ওঠে। আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে খাবারের দোকানে বড়ো বড়ো লোহার কড়াই ভরা ফেনা-ওঠা জ্বাল-দেওয়া মোষের দুধ। এমন দুধ দেখি নি চোখে কতকাল! যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ অজন্মা দারিদ্র্য মারামারি কাটাকাটি পর পর বয়ে গেছে বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে—গ্রাস করেছে সমস্ত ঐশ্বর্য তার। এখানে রাস্তায় ছোটো ছোটো ছেলে দেখি, বই খাতা বগলে চেপে পাঠশালায় যায়; ভিখিরি ছেলে পয়সা মেগে বেড়ায়—লাল টক্ টক্ করে গাল, তাজা রক্তের আভা ফোটে। কী স্বাস্থ্য! দুধ আটা সবজি ঘি—যা খায় টাটকা খাঁটি। মনে হয় বাংলাদেশের ছোটো ছোটো ছেলেগুলোকে এনে ছেড়ে দিই এখানে। কিছুদিন সবুজ তরকারি খেয়ে প্রাণে বাঁচুক তারা। ভয়ে মরি—যে ক্ষীণ প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করে তাদের বুকের পাঁজর ঠেলে—কতদিন তারা টিঁকবে এ জগতে!

বড়দি জেদ ধরেছেন, যে করে হোক গঙ্গাস্নান আজ করবেনই করবেন। বলেন, 'এই গঙ্গা-গঙ্গা করেই এতদূরে এলাম, সেই গঙ্গাতে যেতেই যত বাধা! চলো বেরিয়ে যাই, না বলে কয়ে। কেবলই শুনি "বরফ-গলা জল", "বরফ-গলা জল"—গিয়ে দেখিই-না ব্যাপারটা কী!'

বলি, 'দাদা কী বলেন?'

দাদা আর কী বলবেন! জানি তো তাঁকে। প্রথমে একটু ক্ষীণ আপত্তি তুলবেন, বলবেন, 'যাবে? এই শীতে সেটা কি ঠিক হবে? তা বুঝে দেখো তোমরা। আমার আর আপত্তি কী?'

তার পর যদি জোর করে বলি, 'না, যাবই, কী আর হবে? আর হয় যদি কিছু তো হোক-না, পরে দেখা যাবে।' দাদা বলবেন, 'ঠিকই তো। কী হবে না হবে ভেবে বসে থেকে কী লাভ? গঙ্গাস্নানই তীর্থের আসল জিনিস।'

অবশ্য দাদার 'বিশেষ কুটুম্ব'-স্থানীয় কেউ থাকলে বলতেন, 'এর পর স্নান করে যদি অসুখ করে তো হেমবাবু বলবেন, কী, আমি তো বলেইছিলাম, এই শীতে স্নান করা ঠিক হবে না। কথা শোন না মোটে তোমরা।' আর যদি অসুখবিসুখ না করে কারো তবে তিনি বলবেন, 'আমি তো সেই কথাই বলেছিলাম—

কী আর হবে? গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্যই আলাদা।'

দাদা কিন্তু নিজেই স্বীকার করেন, 'তা যা বল বোন, আমি নিজের মত কিছুই বলি না। জনম-ভর অন্যের কথা শুনেই চলা অভ্যেস আমার। কাছারি-ঘরে চলি মক্কেলের কথা শুনে, কোর্টে চলি হাকিমের কথা শুনে, আর ঘরে চলি তোমার দিদির কথা শুনে।'

সুতরাং কাপড় জামা থলিতে পুরে রওনা দিই হরিদ্বারের মুখে, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে।

এতদিনে খেয়াল হল— তাই তো, চলতে চলতে বড়দিকে শুধোই 'আচ্ছা, এই-যে কুম্ভমেলায় এলাম, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানে চললাম— কুম্ভই কী আর ব্রহ্মকুণ্ডই বা কী? কী মাহাত্ম্য এদের?'

দাদা বললেন, 'তা জান না বুঝি? বলি শোনো। সমুদ্রমন্থন তো জান? এখন দেবতা-অসুরের সেই সমুদ্রমন্থনে কত কী ধনরত্ন, লক্ষ্মী— যাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে ভাগে পাবে— সে-সব উঠতে উঠতে এক ভাণ্ড অমৃতও উঠল। অমৃত আর অসুররা কী চিনবে, তারা তখনো লক্ষ্মীর মোহে মত্ত। ইন্দ্র তাড়াতাড়ি অমৃতের ভাঁড় তাঁর ছেলে জয়ন্তর হাতে দিয়ে ইশারা করলেন— নিয়ে পালাও। কথামতো কাজ, জয়ন্ত ছুটলেন ভাঁড় হাতে নিয়ে। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য, তিনি দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন— ধর্ ধর্, ওরে মুর্খ সব, আসল জিনিস অমৃত ঐ নিয়ে পালায় দেখ্। শুনে, অসুররা ছুটল সব মন্থন ফেলে দিয়ে পিছনে পিছনে। জয়ন্তও ছোটেন প্রাণপণে আগে আগে। আমাদের এক বছরে দেবতাদের এক দিন। জয়ন্ত ছুটতে ছুটতে হয়রান— তিন দিন সমানে ছুটে এক জায়গায় ভাঁড় রেখে একটু জিরিয়েছেন কি অসুররা এসে প্রায় ধরে-ধরে। আবার ভাঁড় নিয়ে ছোটেন, আবার তিন দিন পরে হাত থেকে নামান, আবার অসুররা আসে। এই করে তিন দিন পর পর চার জায়গায় জয়ন্ত ভাঁড় নামান। সেই চার জায়গাই— হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী। তিন বছর বাদে বাদে এইসব জায়গায় "কুম্ভ" হয়, আর প্রতি বারো বছর বাদ "পূর্ণকুম্ভ" হয়— মানে একবার সব জায়গায় ঘোরার পর। আর ব্রহ্মকুণ্ডের বিশেষত্ব এই যে, অমৃতের ভাঁড় রাখবার সময়ে কয়েক ফোঁটা অমৃত উছলে পড়েছিল এখানে। স্নানের জন্য তাই লোকে দূর দূর দেশ হতে ছুটে আসে— যোগ মানে না, দিনক্ষণ মানে না, সারা বছর ভিড় লেগেই থাকে।'

বড়দি বললেন, 'ব্রহ্মকুণ্ডের আর-একটা বিশেষত্ব আছে— পুরাণে যা পড়েছি তাই বলছি আর-কি। গঙ্গা যখন ভগীরথের স্তবে পৃথিবীতে নামলেন, নামার বেগে, স্বর্গের ঐরাবত হাতি, আরো সব যেখানে যা পেলেন পথে অপথে, সব ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। দেবতারা উতলা হয়ে উঠলেন— থামাও থামাও, গঙ্গার গতি থামাও। ঐরাবত চেঁচায়— রক্ষা করো, রক্ষা করো। কিন্তু কে থামাবে গতি? সবাই ইতস্তত করেন। ব্রহ্মা তখন তাড়াতাড়ি তাঁর কমণ্ডলুতে গঙ্গাকে ধরে ঠাণ্ডা করেন। বলেন, ক্লান্ত হয়েছ, একটু বিশ্রাম করে যাও। ঐ-যে গান আছে না—

নারদ-কীর্তন-পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া—
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু উচ্ছল ধূর্জটি জটিল জটাপর ঝরিয়া।

দেখো নজর করে—লোকেরা সেই ক্লান্তা গঙ্গাকে দুধ খাওয়ায় ব্রহ্মকুণ্ডে।'

ব্রজরমণ চুপ করে সঙ্গে সঙ্গে চলে। না জিজ্ঞেস করলে কথাবার্তা কয় না বেশি। সে তার নিজের ভাষা সম্বন্ধে খুব সচেতন। আমাদের সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ-আলোচনায় আগাগোড়া বইয়ের ভাষা ব্যবহার করে। 'তাদৃশ মহানুভব ব্যক্তি মাদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণীকে'—ইত্যাদি আওড়ে যায়। সিলেটি ভাষার ধার দিয়ে ঘেঁষে না আর।

ব্রজরমণ বললেন, 'আমি এ বিষয়ে একটু অন্যভাবে জ্ঞাত আছি। ভাগবত এবং কৃত্তিবাস-রামায়ণে, বিশেষভাবে মহাভারতে পাওয়া যায়, নারদের স্তুতিতে নারায়ণ যখন দ্রাবিত হইয়া গেলেন তখন ব্রহ্মা সেই দ্রাবিত গঙ্গাকে কমণ্ডলুতে ভরিয়া রাখিয়া দিলেন। পরে ভগীরথ যখন পূর্বপুরুষগণকে উদ্ধার করিবার জন্য গঙ্গাকে আহ্বান করিলেন তখন গঙ্গা বলিলেন, কয়েকটা সমস্যা আছে। প্রথমত, আমার বেগ ধারণ করিবে কে? আমি পৃথিবীতে অবতরণ মাত্রই তো বেগের গতিতে পাতালে প্রবেশ করিয়া যাইব। দ্বিতীয়ত, আমি যখন পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতে থাকিব তখন তো যত পাপী আসিয়া আমাতে স্নানাদি করিয়া নিজ নিজ পাপক্ষয় করিয়া যাইবে ; আর তাহাদের পাপে আমি ভারাক্রান্ত হইতে থাকিব।

'গঙ্গাকে আনিবার জন্য ভগীরথকে অনেক প্রযত্ন করিতে হইয়াছিল। ভগীরথ গঙ্গার এই কথা শ্রবণে পুনরায় বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, ভাবনা করিয়ো না। গঙ্গার বেগ ধারণ করিবার জন্য তুমি শিবের আরাধনা করো। একমাত্র তিনিই গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে পারিবেন। আর দ্বিতীয় কথা—গঙ্গাতে যেসব পাপী স্নান করিবে তাহাদের পাপ তো গঙ্গাতেই বিলীন হইবে ; কিন্তু সাধুদের স্নানে গঙ্গা পুনরায় বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে—পাপভার হইতে মুক্ত হইবে। ভগীরথ তখন শিবের আরাধনা করিলেন। শিব খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ভগবৎপাদোদক মস্তকে ধারণ করিব এ তো আমার মহা সৌভাগ্যের কথা। শিব মস্তক পাতিয়া দাঁড়াইলেন। গঙ্গা অবতরণ করিবামাত্র শিব গঙ্গাকে জটার মাঝে আটক করিয়া রাখিয়া দিলেন। গঙ্গা শিবের জটায় ঘুরপাক খাইতে লাগিলেন, বাহির হইতে পারেন না। গঙ্গার গর্ব হইয়াছিল যে তাঁহার বেগ কেহ ধারণ করিতে পারিবে না, তাই মহাদেব এইভাবে তাঁহার গর্ব চূর্ণ করিলেন। শেষে ভগীরথের স্তুতিতে শিব জটা চিরিয়া দিলেন। মন্দাকিনী, অলকানন্দা, সীতা, গঙ্গা—চারি ধারায় সেই প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মকুণ্ড সম্বন্ধে রামায়ণে আছে—ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইবার সময় এখানে আসিয়া পড়ে।'

বড়দি বললেন, 'ঐ তো, ঐ দেখা যায়—এসে পড়েছি আমরা কুণ্ডে। দাঁড়াও, দু পয়সার ফুল-বেলপাতা কিনে নিই এখান হতে।'

ঘাটের পাড়েই ঝুড়ি ঝুড়ি চটকানো থেঁতলানো ফুল-বেলপাতা আগলে নিয়ে বসে আছে ছোটো ছেলে কয়েকটা। তারই দুটো-চারটে ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে মন পবিত্র করলাম—মা গঙ্গাকে স্নানের পর অঞ্জলি দিতে পারব।

বিরাট বাঁধানো ঘাট, আগাগোড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, চাতাল। ছেলেদের আলাদা ঘাট ; মেয়েদের আলাদা, দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ইচ্ছে করলে ছেলেদের ঘাটে মেয়েরাও স্নান করতে পারে, বাধা নেই কোনো। গঙ্গা থেকে ব্রহ্মকুণ্ডটুকুকে

আলাদা করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন বিড়লা কিছুকাল আগে। গঙ্গার স্রোতে পাহাড়ের গা থেকে পাথরের নুড়ি গড়াতে গড়াতে এসে অনেক সময় চড়া পড়ে মাঝখানে। এখানেও নাকি তেমনি চড়া পড়েছিল ব্রহ্মকুণ্ডের গা ঘেঁষে। বিড়লা মজবুত করে বাঁধিয়ে দিয়ে একটা 'ক্লক টাওয়ার' বসিয়ে দিলেন। নাম দিলেন 'হরকি পৌড়ী'— হরের বসবার পিঁড়ি।

সুবিধে হল যাত্রীদেরও। এপার ওপার দুপার থেকেই স্নান করতে পারে কুণ্ডে।

আচ্ছা করে গরম চাদরে গা ঢেকে চার দিকে ঘুরে ঘুরে লোকজন সাধুসন্ন্যাসীর স্নান দেখে সাহস সঞ্চয় করে ফিরতে লাগলাম। এক জায়গায় দেখি ছোট্ট ছোট্ট কাঁচের গোল গোল শিশিতে গঙ্গাজল ভরে পাণ্ডারা ভাগে ভাগে জমাচ্ছে ঘাটের পাড়ে।

এ ক'দিন হরিদ্বারে, কনখলে পথে বের হলেই দেখতে পাই—পর পর লোক চলেছে হন্ হন্ করে রাস্তা দিয়ে টুং টাং ঘুঙুর বাজিয়ে বাঁশের লাঠির দু পাশে বাঁধা দুই চুবড়ি কাঁধে ফেলে। গোরুর গাড়ির ছাউনির মতো ছাউনি টেনে দিয়েছে লাঠির এ মাথা থেকে ও মাথা, খেলো রঙের সস্তা সিল্কের টুকরো দিয়ে। নিজের মাথাও আশ্রয় পায় তার নীচে রোদের তাত থেকে ভর-দুপুরে। চুবড়ি সাজায় রঙিন ঘুড়ির কাগজে কাঁচি-কাটার নকশা জড়িয়ে—চার দিক দিয়ে ঝোলে লাল নীল ফুদনা সোনারুপোর নকল জরির গয়না। তারই গায়ে ছোটো ছোটো ঝোলানো ঘুঙুর বেজে চলে সমানে চলার তালে তালে—ঠুং ঠুং, ঠুঙুর ঠুং। ডেকে শুধিয়েছি, 'কোথায় যাচ্ছ?' থামে না তারা। চলতে চলতেই উত্তর দেয়, 'মোরাদাবাদ।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটি। 'ক্যায়া লে যা রহে হো ভাই?'

বলে, 'গঙ্গা মাঈকো। শিবরাত্রি আনেওয়ালি হ্যায়—শিউজিকো মাথে পড় চঢ়াউংগা— ভাঙ্ ছানুংগা।'

শুনি, চার-পাঁচ দিনের পথ নাকি চলবে তারা এ ভাবেই। মা গঙ্গা থাকবেন কাঁধে কাঁধে, মাটি স্পর্শ করবেন না।

বলি, 'মান লো, কোঈ জরুরত্ আ পড়ে, কান্ধে সে মা গঙ্গাকো নীচে উতরনা পড়ে তো—'

বলে, 'তব্ আওর কিসীকে কান্ধে পর দে দুংগা। হামলোগোঁকি টোলীমে তিন চারজন হ্যায় না?'

'রাতকো সোতে কাঁহা হো?'

'সোতে নেহী। দিনরাত অ্যায়সে হী চল্‌তে রহ্‌তে হ্যায়।'

এই শীতের রাতে না ঘুমিয়ে পারে কখনো? নিশ্চয়ই ঘুমোয় সবাই মিলে, একে অন্যের দোষের সাক্ষী রেখে। তাই গোপন কথা গোপন থাকে নিজ নিজ গাঁয়ে।

দাদা ধমকে ওঠেন, 'যত ময়লা তোমাদের মনে। সহজ কথা সহজভাবে বিশ্বাস করলেই বা! ক্ষতি কী তাতে? চার-পাঁচ দিন একটানা হেঁটে যাওয়া এমন আর অসম্ভব কী? দেখছ না সঙ্গে বিছানা নেই ওদের।'

'কেন, ঐ তো দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে লেপ বাঁধা প্রত্যেকের কোমরে এক-একটা। রাত্তির বেলা ধুনি জ্বালিয়ে লেপ মুড়ে বসে ঘুমোলেই হল। বসে বসে ঘুমোতে

ওদের কত দেখেছি স্টেশনের প্ল্যাটফর্‌মে। আর মা গঙ্গা—তাঁকে ডালে ঝুলিয়ে রাখা—কী এমন শক্ত কথা?' কিন্তু মা গঙ্গা ঝুড়ির ভিতর আছেন কী অবস্থায়? এমনভাবে ঢাকাঢুকিতে চাপা থাকেন, দেখবার উপায় নেই।

আজ ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে সে রহস্যের সমাধান হল। এই কাঁচের শিশিই তুলোর ভিতর বসিয়ে 'হর হর বোম্‌' বলে রওনা দেয় এখান হতে—বাহনরা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নতুন সাজে সেজে। তারই বেচাকেনা চলছে পাণ্ডার হাত দিয়ে।

পুল তৈরি হচ্ছে গঙ্গার এপার-ওপার জুড়ে, এক-একটা গোটা গোটা বনস্পতির খুঁটি বসিয়ে। শুনেছি, পনেরো না ষোলোটা যেন এমনি পুল হবে কুম্ভের আগে। সবে তো দেখছি কাজ শুরু হয়েছে, শেষ হবে কখন? কুম্ভ তো এসেই গেল; তবে অবশ্য যোগ থাকবে একটানা দু মাস। তিনটে যোগস্নান কুম্ভের। সবাই বলেন, কুম্ভমেলা জমবে বেশি শেষ যোগের দিকেই। রোগ, মৃত্যুর প্রাদুর্ভাবও তখনই। আমরা এসেছি, আগেভাগে ফাঁকায় ফাঁকায় পুণ্যি লুটে নিয়ে সুস্থ শরীরে ফিরব ঘরে, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

দাদা বলেন, 'তীর্থস্থানে দেহ রাখা বহু পুণ্যফলের কথা।'

বড়দি বলেন, 'আবার না-হয় আসা যাবে সময় বুঝে। একবারেই সব সারবার কী তাড়া?'

বলি, 'নিশ্চয়ই বৈকি। "দেহ যাঁরা রাখেন" তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা শুনি ঘুরেফিরেই আসেন, দরকার বুঝে দেহ রাখেন, নতুন দেহে আশ্রয় নেন। আর আমাদের জন্য হল "মৃত্যু"; সে আসে, সাপ্‌টে-সাপ্‌টে নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে চলে যায়। "বেঁচে থাকুক সব", মানত করি তাই তো বারে বারে দেবতার দোরে মাথা ঠুকে।'

খোলা ঘাটে দাদাদের সঙ্গ ছেড়ে আমি বড়দি এগিয়ে যাই মেয়েদের ঘাটের দিকে। দেয়ালে ঘেরা ঘাট। হলে কী হয়; নীচ দিয়ে যতটুকু ফাঁক আছে তা দিয়ে বাইরে থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ল—কয়েকজন গৌরবর্ণের বিবসনা স্থূলাঙ্গী পরম নির্বিকারে জল হতে ওঠানামা করছেন। বড়দির ভাবখানা—আমরা দেখি দেখলাম, আর যেন কেউ না দেখে। তাদের পরিত্যক্ত লজ্জা এসে ঘিরে ধরে তাঁকে; পারেন তো নিজের এই ক্ষীণ দেহটুকুর আড়াল দিয়ে ঘাটের এই লম্বা ফাঁকটা ঢেকে দেন বুঝি-বা। মনে হল, কাল তাই কথায় কথায় শশী মহারাজ বলেছিলেন, 'আর বলবেন না মশায়, পাঞ্জাবী মেয়েদের ভক্তি থাকলে কী হবে, লজ্জা শরম একেবারে নেই। ওদের উপদ্রবেই ব্রহ্মকুণ্ডে আলাদা করে ঘাট ঘিরে দিতে হয়েছে। যাবেন যখন দেখবেন।'

বড়দির গম্ভীর মুখে মুখ মিলিয়ে পা চালিয়ে ঘাটে ঢুকি। এমন যে ধব্‌ধবে পাথরের পৈঠা সিঁড়ি—কাদাজলে সপ্‌সপ্‌ করছে চার দিক। সিঁড়ির উপর আলাদা আলাদা তক্তার খাট পেতে বসে আছে ঘাটওলি চারজন—পাণ্ডাদেরই বউ হয়তো। ট্যাক্স দিয়ে জমা নেয় ঘাট। যাত্রীদের কাপড়চোপড় পাহারা দেয়, স্নানের পর কপালে চন্দন-কুম্‌কুমের ফোঁটা এঁকে দেয়। স্নানার্থিনীদের মধ্যে পাঞ্জাবি মেয়েই বেশি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ক'টা ধাক্কা খেলাম এরই মধ্যে। থল্‌থলে শরীর, কিন্তু কী বেপরোয়া শক্তি! দরকার থাক্‌ না থাক্‌ দুমাদ্দুম্‌ ধাক্কা মেরে পাশ দিয়ে

চলে যাবে। স্নানের জন্য শালোয়ার খুলতে খুলতে হঠাৎ কী মনে পড়ল, শালোয়ার ফেলে দিয়ে খালি পাঞ্জাবি গায়েই ছুটে বাইরে গেল—এ-ঘাট ও-ঘাট করল—সিঁড়ি ধরে উঠল নামল, ঠেলাঠেলি করল, আবার ফিরে এল। এমন একজন নয়, ক'জনকেই দেখলাম। কেউ-বা বাপের কোলে শিশুর মাথায় জল ছোঁয়াতে ছোটে, কেউ-বা ভুলে-ফেলে-আসা গঙ্গাজলের ঘটি আনতে যায়; কেউ-বা চট্ করে এক পয়সায় দুটো নারকেলি কুল কিনে আনে গঙ্গাকে খাওয়াতে। শেষ মুহূর্তেই যেন মনে পড়ে সব। যে যত বেশি স্থূলকায়া তার যেন ততই—মানে শরমবোধটা কম।

বড়দি বললেন, 'আর তোমাকে মোটা বলব না কখনো। যা দেখছি, তুমি তো শিশু এদের কাছে।'

বলি, 'কিন্তু কী রঙ দেখছ এদের বড়দি? কাঁচা সোনার বর্ণ—জলে নামে যখন যেন জ্বলতে থাকে। এই যদি দেখতাম তরুণী রূপসী একটিকে—মনে রঙ ধরত। যমুনার জলে শ্রীরাধাকে দেখতে পেতাম—দেখতাম চাঁদের ছায়া ভাসছে কালো জলের বুকে।'

বড়দি বললেন, 'হবে না? শালোয়ার-পাঞ্জাবিতে ঢেকে রাখে গা—তাই এত রঙের জৌলুস। সূর্যের আলো জন্মে বোধ হয় লাগে নি বুকে পিঠে।'

একটি মেয়ে আমাদের বয়সী, দু সিঁড়ি জলে বসে গা ডোবাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠছে বারে বারে সেই তখন থেকে। মাঝে মাঝে উঠে দৌড়ে ঘাটের কোনায় যায়, সেখানকার ছোট্ট কাঠের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে, আবার এসে কাঁপতে কাঁপতে জলে বসে। চোখাচোখি হলেই দাঁত বের করে হাসে। পাগল নাকি? গায়ে একটুকরো সুতোর চিহ্ন নেই। আর ঐ খুপরিটাই বা কী?

বড়দি হাত ধরে টানেন, 'যাচ্ছ কোথায়? হাতমুখ ধোবার জায়গা হয়তো ওটা।'

কৌতূহল দমে না। এক ফাঁকে বড়দিকে এড়িয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি মারি। ছোট্ট ঘর: এক কোনায় কাঠকয়লা, পিতলের থালা, একটা গ্লাস, মেঝেতে ছেঁড়া চাদর, পাঞ্জাবির পুঁটলি, আর ময়লা কম্বলের টুকরো কয়েকটা।

ঘাটওলি—যার কাছে কাপড় জিম্মে রেখেছি—সে বললে, 'ও তো সেবাওলি হ্যায়। গঙ্গামাঈকী সেবা করতা।' মানে, ঘাট সিঁড়ি ঝাঁটিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখে, ফুলপাতার আবর্জনা সরায়; আর ঐ খুপরিতে বাস করে; কাঠকয়লার তোলা উনুনে রুটি সেঁকে খায়, ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঠান্ডা মেঝেয় ঘুমোয়।

জলে তখন আর কেউ নেই বড়ো। ঝুপ্‌ঝাপ্ একটা দুটো ডুব দিয়ে সকলেই উঠে গেছে পাড়ে।

'তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে শীত কমবে না একটুও, জলে নামবে চলো' বলে বড়দি আদেশ জানান। কোমরে কাপড় জড়িয়ে এগিয়ে যাই। গঙ্গা স্পর্শ করি; 'নমো গঙ্গা নমো গঙ্গা'—মাথায় জল ছিটোই। কী ঠান্ডা—বরফ-গলা জলই বটে। হাতের আঙুলে সিঁটে ধরে গেল। পায়ের পাতা জলে ছুঁইয়েই তুলে আনি—নামবার শক্তি পাই নে মনে। বড়দি দেখি চোখ বুজে নেমে গেছেন জলে স্তব পাঠ করতে করতে।

জোর করে দু পা জলে ডুবিয়ে চেপে ধরি। মনে হল যতখানি ডুবিয়েছি ততখানি আর আমার নেই, শরীর থেকে হাঁটু পর্যন্ত যেন কেটে নিল কিসে।

কোমর ডুবোই—কোমর কেটে নেয়। বুক ডুবোই—শ্বাস ঠেলে উঠে আসে। মরি বাঁচি ঝুপ্ করে একটা ডুব দিয়ে জল ঝাড়ি—মাথাটা আর মাথা নেই—এক তাল বরফের ভার সেখানে। তাড়াতাড়ি জলের সিঁড়ি ভাঙি উপরে উঠতে। মনে হল দিদি বলে দিয়েছেন আসবার সময়ে—'যাওয়া আমার ঘটল না—আমার নামে তুমিই ডুব দিয়ো গঙ্গায়। আর আমার বাবু, লাবু—ওদের নামেও দিয়ো। কিসে কী হচ্ছে—শান্তি নেই মনে।'

আজ প্রথম গঙ্গাস্নান আমার এখানে, দিদির করুণ মুখখানি মনে পড়ে গেল। ফিরে জলে নামলাম, দিদির নামে ডুব দিলাম। মার নামেও দিলাম একটা। ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী—আহা, এত ভালো মানুষ তাঁরা—তাঁর নামে না দিয়ে কি পারি? বাবু, লাবু, ছোটোন, মঞ্জু—তাদের নামে চারটা; আর রামু—তার নামেও একটা; আর—আর—; আর পারি না। দম আটকে রইল গলা পর্যন্ত এসে, এদিক-ওদিক হতে চায় না। নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে হাঁ করি, হাঁ-মুখে জল ঢোকে—নিশ্বাসের জায়গায় নিশ্বাস থাকে। ঝুপ্ ঝুপ্ ডুব সারি। আরো দুটো বাকি—আর একটা। ব্যস্ তৃপ্ত।

উঠে এলাম উপরে।

বড়দি বললেন, 'কমগুলি তো হল না দেখলাম গুনে।'

সাড় নেই হাতে পায়ে। কাঁসার গেলাসে সেবাওলি জল গরম করছিল ভাঙা উনুনটায়—বসলাম সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে।

গঙ্গাস্নান করেছি, চন্দন পরতে হবে। নইলে স্নানের আনন্দ পূর্ণ হয় কী করে? মনে পড়ে, ছেলেবেলায় কলকাতায় এলে মা যেতেন গঙ্গাস্নানে গঙ্গার ঘাটে, বায়না ধরে সঙ্গে যেতাম আমরা দু বোন। স্নানের শখে নয়, ঘোলা জলে স্রোতের টানে কী ভয়ই না পেতাম! তার উপরে গুড়ি গুড়ি কাঁকড়ার বাচ্চা—কানে ঢোকে, নাকে ঢোকে—সে কী আতঙ্ক! তবু কোনোমতে দু কানে দু আঙুল ঢুকিয়ে চোখ মুখ বুজে একটা ডুব দিয়ে উঠতে পারলেই হল পাড়ে। পাড়ের উপর পর পর বাঁশের ছাতার নীচে পাণ্ডারা বসে আছে চন্দন সিন্দুর নিয়ে। তাড়াতাড়ি দু বোনে আড়াআড়ি করে বসতাম সেখানে, যে যার মুখ বাড়িয়ে দিয়ে। পাণ্ডা বাঁ হাতের তেলোয় তিলকমাটি ঘষে পদছাপ ছেপে দিত কপালে। কেবল কপালে হলেই চলবে না, গালেও চাই। সার সার এ গালে ও গালে সারা মুখে ছাপ নিয়ে হাসি আর ধরে না। পাণ্ডার টিনের ছোট্ট আয়নাখানায় কেবলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ দেখি আর হাসি। এই ছিল শখ তখনকার গঙ্গাস্নানে। সেই শখই কি জাগল মনে আজ আবার এতকাল বাদে?

কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে পদছাপ দেয় তিলকমাটি দিয়ে; এখানে কিন্তু তা নয়। সকলের কপালেই দেখি হলদে চন্দনে কপালজোড়া ধানছড়ার নকশা কাটা; তারই মাঝে লাল কুম্‌কুমের ছোটো ছোটো টিপ। ভারি সুন্দর। কাঠি দিয়ে এঁকে দেয় বোধ হয়।

বড়দিকে টেনে নিয়ে বসালাম আগে চন্দন পরাতে।

বাটি-ভরা জাফরান মেশানো চন্দন, জলে গোলা কুম্‌কুম্; ঘাটওলি হাতের আঙুলে সেই চন্দন তুলে নিতেই তার হাত চেপে ধরি। বলি, 'না, না, আঙুল

দিয়ে লেপে নয়—অ্যায়সা—অ্যায়সা' ব'লে মাটিতে দাগ কেটে নকশা দেখাই, যেমনটি দেখেছি আর-কি অন্যের কপালে।

ঘাটওলি হেসে মাথা নাড়ে ; বলে, 'হাঁ হাঁ, ওয়সাই হোগা—এই দেখিয়ে না।' বলে বড়দির মাথাটা বাঁ হাতে কাত করে ঘুরিয়ে থক্‌থকে চন্দন সমেত ডান হাতের মধ্যমা কপালের ওদিকে চেপে সোজা এক টানে টেনে এনে দিল ছেড়ে। এই আঙুলের টানাতেই কী কায়দা এদের—দু পাশে চন্দন ছিটকে ছিটকে কপালে ধানছড়া পড়ে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপার। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে আগে হতেই ঘাড় কাত করে মাথা হেলিয়ে দিলাম। ঘাটওলি বিড়্ বিড়্ করে 'সোহাগ ভাগ বনা রহে', 'বাল বাচ্চা আচ্ছা রহে' ব'লে চন্দন সিন্দুর পরিয়ে দিল। স্নানপর্ব সমাধা হল।

ব্রহ্মকুণ্ডের পাড়ে রাস্তার দু দিকে সারি সারি দোকান। ইচ্ছে হয় ঘুরে ঘুরে দেখি, এটা সেটা নাড়ি। কিন্তু দাদা সঙ্গে, তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। বলবেন, 'খালি খালি দোকানদারকে বিরক্ত করা এই এক স্বভাব তোমাদের।' মনে হল ঠিক তো, একটা প্যাঁচওয়ালা মুখ-আঁটা পিতলের ঘটি কিনতে হবে তো। মা বলে দিয়েছেন যোগের জল নিয়ে যেতে। জোরে জোরে দাদাকে শুনিয়ে বলি, 'চলো বড়দি চলো, দরকারি জিনিস কিনি গে যাই চলো।'

কাঁসা-পিতলের বাসনের বড়ো শখ বড়দিরও। বাসন দেখলেই ঠিক সেই বাসনটিরই যে তাঁর জরুরি প্রয়োজন, নয়তো কত অসুবিধে হচ্ছে, এ কথা হঠাৎই মনে পড়ে যায়। বলেন, 'শনিবার উপোস করি, মঙ্গলবারে নিরামিষ খাই, এমনি একটা ঢাকা-দেওয়া পিতলের বালতি থাকলে পরিষ্কার-মতো জল তুলে রাখা যায়। এমন একটি কাঁসার গামলা নাড়তে-চাড়তে কেমন সুবিধের। জামদানি বাটিটার কী সুন্দর গড়ন! আর এই কানা-উঁচু থালাটা দেখো, ঝোলঝালি ঢেলে রাখতে বেশ, না? ছোটো ঘটি নিলে হয় কয়েকটা। লক্ষ্মীর আসনে "আমসরা" দিয়ে রাখতে লাগবে কাজে। ফি বিষুদ্‌বার লক্ষ্মীব্রত করি। সোনাদি, সুন্দরদিরাও পেলে খুশি হবেন। গঙ্গাজলি-ও তো নিতে হবে গঙ্গাজল দেবার জন্যে। এও তো আমার চাই ডজনখানেক ; দুই বেয়ান, টুনি, কিরণ, মাঐমা, দেশের বাড়িতেও দিতে হবে একটা।' হিসাব শুনে বাসনের দোকানে দাঁড়াবার আর ভরসা পাই না। টানতে টানতে বড়দিকে নিয়ে ঢুকে পড়ি সামনের সরু গলিতে। সরু—ওঃ কী সরু! তিনজন লোক চলতে পারে না পাশাপাশি। এমনি দোকান-ঠাসা সরু গলি দেখেছি দিল্লীর চাঁদনি চকে, কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাবার পথে। বড়ো ভালো লাগে দু পাশে দেখে দেখে আস্তে ধীরে পা ফেলে চলতে, বা চলতে চলতে দেখতে। সারা দিন কাটিয়ে দিতে পারি-বা এইভাবে। হাঁটতে হাঁটতে নামলাম এসে গলির শেষে। এখানে আমরা নতুন সবাই, শহরের কোথায় যে এসে ঠেকেছি কেউ জানি নে তা।

শুনি দমাদ্দম্ ঝমাঝম্ ড্রাম ব্যাণ্ড্ বাজছে কাছে-পিঠে। নিশ্চয়ই সেইরকম শোভাযাত্রা হবে আর-একটা। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলাম সে দিকে। শোভাযাত্রারই আয়োজন বটে। রাস্তা খালি, লোক-চলাচল হাল্কা ; টাঙ্গা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীসমেত রাস্তার দু পাশের দেয়াল ঘেঁষে। পুলিস পাহারা দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে। হাতের রুল ঝাড়ছে ঘন ঘন লোক ঠেকাবার দায়ে।

দাদা শুধোলেন, 'ইয়ে কিস্‌কা জুলুস আ রহা হ্যায় ভাই?'

পুলিস বললে, 'হরিহর-মঠকে মণ্ডলেশ্বর কা। কাশীসে আয়ে হ্যায়—ইসি রাস্তে যা রহে হ্যায়।'

সেই—যাঁর কথা সেদিন সেই কালো বৃদ্ধ সাধুটি বলেছিলেন আমাদের। সেবাশ্রমের পাশেই তো। মনটা খুশি হয়ে উঠল—মনে হল যেন আমাদের নিজে-দেরই দল আসছে একটা। ভাবতে না ভাবতেই বানের জলের মতো হু হু করে শোভাযাত্রা এসে ভরিয়ে দিল গোটা রাস্তাটা। সেই—সেইরকমই—আগে আগে চলেছে ব্যাণ্ড্ পার্টি, তার পিছনে সোনার জরির কাজে ঠাসা লাল শাল গায়ে সাধু সান্ত্রীর দল রুপোর লাঠি ঘাড়ে; তার পিছনে নানা অলংকারে ভূষিত দু-দুটো হাতি—সুউচ্চ ধ্বজদণ্ডের ঘাড়ে রঙিন হাওদার উপর রুপোর সিংহাসনে বিগ্রহ ঠাকুর নিয়ে। ধ্বজদণ্ডের উপর পতাকা উড়ছে রাস্তার দু পাশের তেতলা চৌতলা বাড়ি ছাপিয়ে। ধ্বজদণ্ডে বাঁধা মোটা দড়ি সমান টানে টেনে রেখে দু পাশ থেকে দু দল হেঁটে চলেছে হাতির পায়ে পায়ে। পড়ে যাবার আশঙ্কা নেই। তার পিছনে দলে দলে নাগা সন্ন্যাসী; তার পিছনে মোটা-ডাণ্ডা-ওয়ালা, ফুলের মালায় ঘেরা, রুপোর চতুর্দোলায় মণ্ডলেশ্বর কুড়ি জোড়া কাঁধের উপর। মহা সমারোহ—রীতি অনুসারে। হাওয়ায় ওড়ে সিল্কের পাগড়ি চাদর, আলো ঠিকরোয় চশমার কাঁচে, হাতের সাদা রুমালে ঘন ঘন ঘাম মোছেন কপালের; গুরুগম্ভীর চেহারা—গাঁদা-ফুলের রঙে পরিধানের গেরুয়াতে মিলে জমাট মূর্তি একটি।

খানিক গিয়েই মায়াদেবীর মন্দির। শোভাযাত্রা থামল সেখানে। সেখানকার মহান্ত এসে সসম্মানে নামিয়ে নিলেন মণ্ডলেশ্বরকে। মায়াদেবীর মন্দিরের সামনে আঙিনার পাশে উঁচু বেদীর উপর দত্তাত্রয়ের পাদুকা—মণ্ডলেশ্বর সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন বেদীর সিঁড়িতে। পূজারী শিঙা ফুঁকলেন। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট—মণ্ডলেশ্বর নেমে এলেন। এবার গিয়ে ঢুকলেন বেদী-বরাবর মণ্ডপে। ঘরেরই মতো অনেকটা, সামনেটা খোলা। সেখানে গিয়ে মণ্ডলেশ্বর গদির উপর পাতা গালিচা-আসনে একবার বসেই বেরিয়ে এলেন। নিয়মরক্ষা নিয়ে কথা, দেরি করে লাভ কী? কুম্ভে এঁরা যে-কেউ আসেন—আগে মায়াদেবীর মন্দিরে ঋষি-শ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয়কে সম্মান দিয়ে তবে যান তাঁরা নিজ নিজ আস্তানায়।

এবার চতুর্দোলার পিছনে যত কৌতূহলী সাধারণের দল—শহর ভেঙে চলেছে যেন এদের পিছু পিছু, ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষে ঠেসে। আমাদেরও তো যেতে হবে এই রাস্তা দিয়ে সেবাশ্রমে। কতক্ষণে ভিড় সাফ হবে, কতক্ষণে যাব। ওদিকে আবার ঘড়ি-ধরা খাবার সময় উৎরে না যায়, স্বামীজিদের কষ্ট না হয়। ভাবতে ভাবতে একটু একটু করে এগোতে থাকি। কতক্ষণ কাটে জানি নে। ঘাড় নিচু করে চলছিলাম; ঘাড়ে ব্যথা হতে মুখ তুলতে দেখি, মোড়ের মাথায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশ থেকে একদল পাঞ্জাবি মেয়ে দূর হতেই দু হাত জুড়ে আমাদের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম জানাচ্ছে বারে বারে।

আমাদের কেন? হক্‌চকিয়ে যাই। আগে পিছনে তাকাই। সামনে নাগা, পিছনে নাগা। আন্‌মনে চলতে চলতে ভিড়ের চাপে কখন যেন ঢুকে গেছি এঁদের দলে। গরদ-পরা, সদ্য-স্নাতা চন্দনতিলক-কাটা পিতলের কমণ্ডলু হাতে বড়দি;

আজই সকালে কেনা হয়েছে ওটা স্নানের পথে গঙ্গাজল আনতে। ঘরে রাখবেন, দরকারমতো বিছানাপাটিতে ছিটোবেন, তা নইলে নাকি পবিত্র লাগে না মন। ফিরে তাকিয়ে দেখি, সেই মেয়ের দল তখনো বারে বারে মাথায় হাত ঠেকাচ্ছে আর অঞ্জলি পেতে আমাদের কৃপাভিক্ষা চাচ্ছে।

অতি কষ্টে অনেক ধস্তাধস্তির পর ছিট্‌কে বেরিয়ে এলাম দল হতে। লক্ষ্য-হারা না হই—দাদা নজর রেখে চলছিলেন তফাত হতে। এতক্ষণে সুবিধে পেয়ে কাছে এলেন ; বললেন, 'ফিরে এলে তবে? আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম তোমাদের ভাবগতিক দেখে।'

আজ গঙ্গার জল অনেক স্বচ্ছ। আর দুদিন পরে নাকি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে—তলার নুড়িগুলি স্পষ্ট চোখে পড়বে। আর কী মাছ—আজ আর ক'টা দেখা যাচ্ছে! হাজার হাজার মাছের হুড়োহুড়ি দেখা যাবে এখানে। মাছের গুঁতো খেয়েছি সেদিন নাইতে নেমে—ঘোলা জলের নীচে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ—অনেকটা রুই মাছের মতো, তবে মুখটা রুইয়ের চেয়ে সরু—এরা এখানে একে বলে 'মাসোল' মাছ। আটার গুলি নিয়ে ফিরছে ছোটো ছেলেরা পিতলের থালায় করে ; এক পয়সায় দু গণ্ডা তিন গণ্ডা—যাত্রী বুঝে। টুপ্‌টাপ্‌ সেই গুলি জলে ফেলে মাছের খেলা দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একমনে।

হাঁটতে হাঁটতে পুল পেরিয়ে চলে যাই ওপারে। অপূর্ব দৃশ্য ওখান থেকে এপারের—হরিদ্বারের। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সারি সারি দালান, তার কোল দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা তর্‌ তর্‌ করে কারো সিঁড়ি ডুবিয়ে, কারো বারান্দা ভিজিয়ে, কারো-বা ঘরের ভিতর উঁকিঝুঁকি মেরে। ওপার থেকে তার খেলা দেখে মন হেসে ওঠে খুশিতে। ওপারে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসে ঢাকা স্নিগ্ধ মাটির আশ্রয়টুকু আড়াল করে রেখেছে নীল ধারাকে গঙ্গার হাত হতে।

এখান থেকেই গঙ্গার মুখ ঘুরিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে শহরের বুক দিয়ে সংযত করে। বড়ো বড়ো কাঠের বন্ধ দরজায় খরস্রোত স্তব্ধ। দরকারমত খুলে দেয় একটা দুটো কাঠ—গঙ্গার দাক্ষিণ্যে নীল ধারা ভরে ওঠে ক'দিনের জন্য। আহ্লাদিনী অভিমানিনী গঙ্গা—ভাগাভাগি সয় না, তারই প্রাধান্য বেশি। নিঃস্ব রিক্ত নীল ধারা পড়ে আছে পাশে—কাদামাখা শুক্‌নো নুড়ি-বিছানো বিছানা বুকে নিয়ে—যেন আত্মভোলা মহাদেব পড়ে আছেন ভস্ম মেখে অনন্ত আকাশের পানে তাকিয়ে। ধূসর বালির চড়ায় শুক্‌নো ঘাসের গুচ্ছ—সবেতেই যেন সন্ন্যাসীর গায়ের সেই রুক্ষ রঙ, ত্যাগী জৌলুস। নুড়িগুলি হিমালয়ের গা থেকে কবে কখন গড়াতে গড়াতে এসে পড়েছে এখানে আকার খোয়াতে খোয়াতে, একই আকারে গোল হয়ে। বড়দি বলেন, 'দেখেছ, মনে হয় যেন কেউ তৈরি করে সাজিয়ে রেখেছে এগুলিকে।'

নীল ধারার ওপাশে নীল পাহাড়ের সারি নীল আকাশের গায়ে। কী গম্ভীর শান্ত পরিবেশ! লোকে বলে এ তপোভূমি। তপোভূমিই বটে। এই নীলের আকর্ষণ মনকে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যায় ; ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে করে না মোটে।

মনে হয়, ঘুড়ির সুতোর মতো কেবলই ছাড়ি মন-সুতোকে নাটাই হতে।

গঙ্গার ওপারে ভিড়, এপার স্থির। ওপারে প্রাসাদের সারি, রোদের ঝাঁজ; এপারে গাছের ছায়া, পাখির কাকলি; ওপারে আলো ঝল্‌মল্‌ করে প্রতি ঘরে, এপারে কচি ঘাসের নরম আসন মায়া ছড়ায় ধরে রাখতে।

দাদা বলেন, 'কত কত মহাপুরুষের সাধনা এই তপোভূমিতে। কত যুগ ধরে চলে আসছে তা। তাঁদের সেই সাধনার প্রভাব যাবে কোথায়? হাওয়াতে মিশে আছে।' ভাবি, সেই প্রভাব কি নাড়া দেয় সবাইকেই।

ওপারে মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। ধীরে ধীরে চলে আসি এপার ছেড়ে। বাঁধানো চওড়া চাতাল গঙ্গার বুকে ব্রহ্মকুণ্ড থেকে আধ মাইল অবধি।

সবুজ পাতার ঠোঙা-ভরা রঙিন ফুলের মাঝে ঘিয়ের পিদিম জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে মেয়ে-পুরুষে। কেউ-বা ভাসায় গঙ্গামাঈয়ের নামে, কেউ-বা ভাসিয়ে দেয় বিগত প্রিয় মুখটি মনে করে তার উদ্দেশে। পর পর ডালা ভেসে যায়, স্রোতের মুখে ক্ষীণ আলোর শিখা চোখের আড়াল হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে স্থিরমূর্তি পাড়ে উঠে পড়ে। বড়ো করুণ, বড়ো মধুর এ দৃশ্য। কারো যদি ঠেকে যায় ডালা, বা নিভে যায় বাতি দৃষ্টির গোচরে, মনে ব্যথা পায়, চাপা আশঙ্কায় আকুল হয়ে ওঠে নীরবে।

বড়দি দু হাতে দুটি ফুলের ডালা তুলে নিয়ে বললেন, 'সেবার এসে দিয়েছিলাম "তার" নামে, এবার আরো একটি বেড়ে গেল। না, আর দেব না।' ব'লে বড়দি একটি ডালা রেখে দিয়ে অন্যটি মাথায় ঠেকিয়ে জলে নামিয়ে দিলেন; হাতের আঁজলার ঢেউয়ে ডালা সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'খালি গঙ্গামায়ের নামেই দিলাম ভাসিয়ে এবার।'

মায়াদেবীর মন্দির, মায়াপুরী নাম, সপ্ত পুরীর এক পুরী। পীঠস্থানও বটে। সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যাপার দেখেছি, দেবী দেখা হয় নি। আজ দেখতে হবে তাঁকে। মন্দিরের ভিতরকার দেবদেবীর উপরই ঝোঁক বেশি বড়দির। এখন থেকে এক-এক করে দেখাসাক্ষাৎ না সারলে পরে 'দেবতা দেখি কি মানুষ দেখি' হুল্লোড় লেগে যাবে ভিড়ে। ছোটো মন্দির, মাটির টিলার উপরে। আগে এই মন্দির নাকি আরো ছোটো ছিল। সঙ্গের স্বামীজি চিনতেই পারছিলেন না এইই সেই মন্দির কি না। বললেন, 'অনেকদিন আগে এসেছিলাম, আর আসি নি, কিন্তু তখন তো এমন ছিল না। দাঁড়ান, একটু জিজ্ঞেস করে আসি। বলে তিনি কাছেই 'ছড়িদার' ছিলেন, তাঁকে শুধোতে গেলেন।

এক ভক্ত মন্দির পরিক্রমার জন্য চার দিক ঘিরে ঢাকা বারান্দা দিয়ে একটুখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। ছড়িদার বলেন, 'শেঠজিকি বিমারী কিসী তরহ আচ্ছি নহী হোতী থী। তভী কুছ মানত্‌ কী থী। আচ্ছে হোনে পর পচিস হাজার রুপেয়া লাগাকর ইস্‌ মন্দিরকো বাড়াওয়া দিয়া হ্যায়। আউর ইয়ে জো দিওয়ার পর দসমহাবিদ্যাকে চিত্র হ্যায়, বাঙ্গালকে কিসী চিত্রকর কো বোলাকর বানওয়াএ গয়ে থে।'

শুনে গর্ব হয়, চেয়ে দেখি। দশমহাবিদ্যার দশ অঙ্গের তুলির খোঁচা চোখে বর্শা হানে। বাংলাদেশের পরিচয়টুকু না থাকলে হয়তো এতটা হত না।

বড়দি ডাকেন, 'এদিকে এসো, দেবীদর্শন করে যাও।' দেবী তো তিন-চারটি ভিতরে একই সারিতে। মায়াদেবী কোন্‌টি? ছড়িদার হাতের আঙুল বাড়িয়ে দেন ; বলেন, 'ও যো বীচওয়ালি হ্যায়, ওহী মায়াদেবী হ্যায়।'

মায়াপুরীর কাছেই গীতাভবন। নতুন বাড়ি, সবে তৈরি হয়েছে মাস আষ্টেক আগে। ভিতরে গান হচ্ছে, গীতা পাঠ হচ্ছে। বাইরে লাউডস্পীকারে তল্লাট মাত হয়ে যাচ্ছে। ঢুকতেই বড়ো একটা 'হল', মেঝে-জোড়া পুরু কার্পেট পাতা ; বসে আরাম, বিশেষ করে শীতের কালে। হলের ঐ মাথায় শ্বেতপাথরের মানুষ-সমান বিষ্ণুমূর্তি, হাসি-হাসি চোখ—নতুন কারিগরের সৃষ্টি। হলের দেয়ালেও ছবি পুরাণ-গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে। খানিক দেয়াল-চিত্র, খানিক রিলিফ-এর কাজ, খাঁজে খাঁজে লাল কালো রঙ দিয়ে দাগ টানা। সহজে যেন বোঝে লোকে একবার দেখলেই।

রাত হয়ে এল। ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। পিছনদিকের শর্টকাট রাস্তা ধরি শুক্‌নো নালার উপর দিয়ে। বড়ো বড়ো কাঠের তক্তা গঙ্গা থেকে তুলে জড়ো করা হচ্ছে এখানে সরকার-পক্ষ থেকে। লছমন্‌ঝোলার ওদিকে বন হতে কেটে নীচে গঙ্গায় ফেলে দেয় এগুলি, স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে আসে সোজা এ পথে।

চলতে চলতে হুমড়ি খেয়ে পড়ি বারে বারে কাঠের গায়ে হোঁচট খেয়ে। কাঁটায় ভরা জংলি একটা গাছের নীচে ফাঁকা জায়গাটুকুতে ধুনি জ্বালিয়ে আসন পেতে বসেছে ষণ্ডা সন্ন্যাসী এক। লাল ফতুয়া গায়ে হিন্দুস্থানী জোয়ান ধন্না দিয়ে পড়েছে পায়ে। শুনি, সাধু তাকে বলছে হাত নেড়ে, 'দেবতা অপদেবতা সবকো বস মেঁ কর সাক্‌তা হুঁ। শনি, রাহু, কেতুকা দম্‌ ঘোঁটকর উনহেঁ মার সাক্‌তা হুঁ। লছমীকে পাওঁমে বেড়ী ডালকর গায় কী তরহ্‌ খুঁটে সে বান্ধ্‌ কর রাখ সাক্‌তা হুঁ—সব কর সাক্‌তা হুঁ। লেকিন্‌, পহ্‌লে খরচ তো করেগা, তব্‌ না ফল পায়েগা?'

হংসদেব অবধূত এসেছেন কুম্ভে ; আছেন সপ্তসরোবরের তীরে। বড়দি বললেন, 'সিদ্ধপুরুষ তিনি, খ্যাতি আছে অনেক। তাঁকে দেখা ভাগ্যের কথা।'

হরিদ্বার ছাড়িয়ে শহরের প্রান্তে সপ্তসরোবর। একটানা রাস্তা নেই কোনো। যাঁরা আগে গেছেন তাঁদের কাছেই শুনি, টাঙ্গা থামিয়ে হেঁটে যেতে হয় অনেকখানি।

এলোমেলো দাম-কষাকষির পর টাঙ্গাওয়ালা রাজি হয় নিয়ে যেতে। ঠিক দুপুরে রোদের তাত মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম স্মরণ করে।

বেশ চলল গাড়ি শহর অবধি ; তার পরেই শুরু হয় এবড়োখেবড়ো কাঁচা পথ ; কোনোটা পায়ে চলার, কোনোটা গোরুর গাড়ির—জলে কাদায় থক্‌থকে, কোনোটায়-বা ঘাস আর ডোবা দু পা অন্তর অন্তর।

টাঙ্গাওয়ালা চেনে না রাস্তা। বলেছিল, ও ঠিক হয়ে যাবে। আশা করেছিল পথ চিনে নিতে বেগ পেতে হবে না কিছু। নতুন টাঙ্গাওয়ালা এ শহরে। এরা প্রায় সকলেই তাই। এসেছে পশ্চিম-পাকিস্তান হতে—রিফিউজির দল। অনেকেই ভালো ভালো কাজ করত আগে। এখানে এসে এই ব্যাবসাই নিয়েছে তুলে—হাত পেতে

চেয়ে খাওয়ার বদলে।

বড়ো ভদ্র এরা ; দেখলাম তো এতদিন এদের সঙ্গে চলে। দাদা তো গাড়িতে উঠেই আলাপ জুড়ে দেন টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসে। প্রথম কথাই শুধোন, কোত্থেকে আসা হয়েছে? ছেলেপিলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, না দেশেই আছে?

ছেলেপিলের কথা উঠতেই আলাপ জমে যায়, নানা দুঃখের কাহিনী—সহানুভূতিতে রাস্তাটুকু ভরে থাকে মন। নামবার সময় বিদায়ী বন্ধুর করুণ সুর ফোটে গলার স্বরে।

এই কালকেই চড়েছি এক টাঙ্গাতে। যথারীতি আলাপ জুড়েছেন দাদা তার সঙ্গে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুরুষ, রুক্ষ চুল, ছেঁড়া কোট গায়ে ; কথার মাঝে মাঝে ইংরেজি বলে ; পরিষ্কার উচ্চারণ। জানতে পারি, ফ্রন্টিয়ারে সে ছিল একজন হেড-ক্লার্ক বড়ো অফিসে। বলে, 'ক্যায়া কিয়া যায়! আওরত্ বাচ্চোঁ কো খিলানা তো হোগা?' এখানে কে কাকে চাকরি দেবে? যা টাকা ছিল হাতে, এই গাড়ি ঘোড়া কিনল। দিনশেষে যা পায় দু বেলা খাওয়াটা হয়ে যায়। ছোটো ভাই ইঞ্জিনিয়ার, সে একটা কাজ পেয়েছে কাপড়ের দোকানে। বলে, 'পিছে ইরাদা হ্যায়, দোনে ভাই মিলকর কোই আপনা রোজগার করেঙ্গে।' মানে, স্বাধীন ব্যবস্থা করবে একটু গুছিয়ে উঠতে পারলে।

আজকের টাঙ্গাওয়ালাও তাই ; নতুন লোক, রাস্তাঘাট জানে না ভালো এখনো পর্যন্ত। এতগুলি পথ মাঠের উপর দিয়ে যেতে দেখে ভড়কে যায়। লোকজন নেই কাছে পিঠে যে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে।

এগিয়ে এসেছি অনেকখানি, পিছনো চলবে না। সাহসে ভর করে টাঙ্গাওয়ালা পায়ে-চলার সরু পথেই ঘোড়া চালিয়ে দেয়। পায়ে-চলার পথে উঁচুনিচুতে পা ফেলে চলতে কষ্ট নেই কোনো ; কিন্তু গাড়ির চাকা যখন একবার নামে একবার ওঠে, কাঠের ছাউনিতে ঠোক্কর খেয়ে মাথার খুলিতে ফাটল প্রায় ধরে। ভয়ে মরি। যে যার মাথা দু হাতে চেপে ধরি। লাগে লাগুক ছেঁচা হাতের আঙুলে, মাথাটা তো বাঁচবে। এ দিকে বৃষ্টি-জমা জল গাড়ির চাকায় ছিট্‌কে ছিট্‌কে কাপড়ে বুটি তুলতে থাকে ছোটো বড়ো নানা আকারে। সপাং সপাং চাবুক পড়ে হাওয়ার গায়ে। খানিক চ'লে ঘোড়া বেঁকে বসে, আর এগোয় না এক পা কিছুতে।

সহিস হাল ছেড়ে দেয়। লাগাম ধ'রে ছড়ি হাতে নেমে পড়ে মাটিতে, বলে, 'আব আগে পায়দোল চলে যাইয়ে। দেখিয়ে না, ইসপর সে গাড়ি ক্যায়সে যায়েগী।' দু হাত লম্বা, আট আঙুল চওড়া ছোটো ছোটো বাঁশের পুল, খানিক বাদে বাদেই বৃষ্টির জলের নালার উপর। সত্যিই তো, কেমন করে যাবে গাড়ি এর উপর দিয়ে?

সহিস বলে, এইখানেই সপ্তসরোবর, এগিয়ে গিয়ে খুঁজলেই পাব। কিন্তু কই, সপ্তসরোবরের তো একটা সরোবরও দেখছি না চোখে।

তবু নেমে পড়ি। হাঁফ ছেড়ে জলে কাদায় ছপ্ ছপ্ করে চলতে থাকি হাঁটু পর্যন্ত কাপড় বাঁচিয়ে। বড়দি বলেন, 'চলো নাক-বরাবর। এতদূর টেনে এনে কি আর হংসদেব ছেড়ে দেবেন মাঝ-পথে?' সরু পথ ধরেই এগোতে থাকি। পথের বাঁ পাশে পোড়ো বাড়ি কয়েকটা। যে বাড়িই চোখে পড়ে ছুটে যাই। ভাবি, এখানেই বোধ হয় পাব হংসদেবকে। গিয়ে দেখি, বাড়ি খাঁ খাঁ, জনমানবের লক্ষণও

নেই। কোনোটা ভাঙা, কোনোটা তালাবন্ধ, কোনোটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা। একটা বাড়িতে যেন লোকের গুঞ্জন শুনতে পাই। ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাই। হ্যাঁ, লোকই তো বটে। একজন কেন, বেশ কয়েকজন। বড়ো বাড়ি, চুন-সুরকি লাগিয়ে দেয়াল মেরামত হচ্ছে, সামনের বাগানে মালি ঘাস চেঁচে ফেলছে, মরচে-ধরা বড়ো বড়ো লোহা-পিতলের কড়াই হাঁড়ি ধরাধরি করে এঘর-ওঘর করছে চাকররা। হাঁকডাক, ব্যতি-ব্যস্ত ভাব। মনটা আগ্রহে উল্লাসে উছলে উঠল। এখানেই তবে আছেন হংস-দেব। অনেক ভক্ত তাঁর, তাঁকে আর একলা থাকতে দেবে তারা? শুনেছি, সবে এসে ডেরা ফেলেছেন লোকজন নিয়ে। হয়তো গুছিয়ে উঠতে পারেন নি এখনো। কিন্তু সরোবর? সপ্তসরোবর বলতে সাতটা না হোক্ অন্তত একটা যে বিরাট সরোবর কল্পনা করে এসেছি, তা কই? সেদিন মণিবাহাদুরের স্ত্রী রেবাদি এসে-ছিলেন; বলেছিলেন, 'ভাই, জলের ধারে সে কী ঠান্ডা হাওয়া! যাও যদি তো গরম জামা চাদর বেশি করে নিয়ে যেয়ো।' সপ্তসরোবরের জলের জন্য চার দিকে তাকাই; মনটা খারাপ হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি সামলে নিই। তা নাই-বা দেখতে পেলাম জল; যাক গে যাক, হংসদেবকে তো পেয়ে গেলাম—এত আশা করে আসা যাঁর জন্য।

বড়দি পিছন ফিরে ফিরে তাকান। দাদা পিছিয়ে আছেন। একসঙ্গে ঢুকতে চান ভিতরে; আগুপিছু কেন আবার মহাত্মাদর্শনে। বললেন, 'ডাকো-না ওঁকে, একটু পা চালিয়ে আসুন।'

বুকের ভিতর ধুক্ ধুক্ করে। হংসদেব! কেমন না জানি দেখব তাঁকে। প্রথম দেখা নষ্ট যেন না হয়। তৈরি করি নিজেকে।

গেটের ভিতরে ঢুকি। কে আগে যাবে খোঁজ নিতে? দাদাকেই ঠেলে পাঠাই। বাবুগোছের একজন দালানের বারান্দায় বেরিয়ে আসতে দাদা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে আবেদন জানালেন, 'হংসদেবের দর্শন কখন মিলবে? বহু দূর হতে আসছি।' শুনে ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চোখ ছোটো করেন—'হংসদেব! ও কৌন হ্যায়? ম্যায় নহীঁ জান্‌তা।' বলে হাত উলটে দেখান।

হতাশায় স্তব্ধ হয়ে পড়ি। দাদা উৎসাহ দেন, 'কোনো ভাবনা নেই, খুঁজে বের করবই। যাবেন কোথায়?'

ফের এগোতে থাকি। এতক্ষণে দু-চার জন চাষী শ্রেণীর লোক পথে পড়ে। ঘাস নিয়ে চলেছে কেউ, কেউ নিয়েছে শুক্‌নো কাঠের বোঝা, কেউ ফিরছে ঘরে শহর হতে কিনে আটা নুন গামছার খুঁটে বেঁধে। যাকে পাই কাছে তাকেই একবার জিজ্ঞাসা করি, 'হংসদেব কোথায়?' দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শোনে তারা। শুনে খানিক ভাবে। ভেবে, কেউ সামনে, কেউ পিছনে, কেউ ডাইনে, কেউ বাঁয়ে পথ দেখিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যায়। চরকিবাজির মতো ঘুরতে থাকি আমরা। যখন যার কথা শুনি ভাবি, এইই বুঝি ঠিক জানে, ঠিক বলছে। অমনি সেদিকে পড়ি-মরি করে ছুটি। একবার একজনের কথায় এগিয়ে যাই, আবার আর-জনের কথায় পিছিয়ে আসি। আর পারি না, অনিশ্চিত পথ চলার কষ্ট আর সয় না।

মনে মনে রাগারাগি, গালাগালির তুমুল তোলপাড় করেও যখন হংসদেবের কোনো হদিশ মিলল না, এতখানি পথ হেঁটে গিয়ে আবার টাঙ্গাতে উঠতে হবে

ভেবে কান্না যখন প্রায় আসে-আসে, এমন সময়ে সেইরকম পথেরই একজন এসে সামনাসামনি দাঁড়াল। বললে, 'হংসদেবকে চাও? ও যো পাথরীলা উঁচা নীচা বান্ধ্ হ্যায়, ওসীকে বগলমে সপ্তসরোবর হ্যায়। ওসীকে কিনারে বহুত সে মহাত্মাওঁনে ডেরা ডাল রাখা হ্যায়। যা কর পাত্তা লাগাও, ওহী হংসদেব মিল যায়েঙ্গে।'

এ সত্যি বলছে কি আন্দাজে বলছে অন্যদের মতো, কে জানে? এই তো এক-জনের কথায় বাঁধের কাছ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। আবার যাব অতদূর? কাঁটাঝোপে ভরা ওদিকটা। এখনো পায়ের কত জায়গায় চিন্ চিন্ জ্বলছে কাঁটার আঁচড় লেগে।

দাদা বললেন, 'এতই যখন হল, আর-একবার দেখি ঘুরে। এবারই শেষ।'

আঁচড়ে-আঁচড়ে উঠলাম গিয়ে বাঁধের উপরে।

'ও দাদা, ও বড়দি, শিগ্‌গির করো, দৌড়ে এসো,' চেঁচিয়ে উঠি জোরে।

স্বচ্ছসলিলা নীল গঙ্গা ব'য়ে চলেছে ধীরে, সাদা বালির চড়ার মাঝ দিয়ে।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শীতল হাত বুলিয়ে দিল মুখের উপরে। জুড়িয়ে গেল ক্লান্তি সব এক মুহূর্তে।

গঙ্গার এপারে বাঁধের ঠিক নীচেই বালির পাড়; তার উপরে হলদে খড়ের ছোটো বড়ো অগুনতি ছাউনি। কোন্ ছাউনিতে থাকেন হংসদেব জানা নেই মোটে। এত তাঁবুর মধ্যে খুঁজে বের করা, এও তো আর-এক ফ্যাসাদ। কার মুখ দেখে রওনা হয়েছিলাম আজ!

হংসদেবকে দেখি নি কেউ চোখে আগে। বইয়ের পাতায় ছাপা ছবির যেটুকু স্মৃতি, তারই ভরসা দাদা বড়দির। তা ছাড়া আর-এক আশা মনে, তাঁর আস্তানার সোরগোল হয়তো টের পাওয়া যাবে বহু দূর হতে। কত লোকের ভিড় জমবে সেখানে—যাত্রীদের যাওয়া-আসার ধাক্কাধাক্কি, নিশান-পতাকা—একটা বিশেষ জাঁক-জমক নিশ্চয়ই। এড়িয়ে যাবার উপায় কী?

প্রতি ছাউনিতে তফাত হতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ফেলে চলি। বেশি কাছে যেতে ভয় হয়। কোন্ সাধু কেমন, কী জানি? হঠাৎ যদি রেগে ওঠেন কেউ? সাধুর মধ্যে দুর্বাসাও তো থাকেন শুনি।

গঙ্গা হতে খর্পরের কমণ্ডলু হাতে জল নিয়ে উঠে আসছিলেন এক সাধু; বললেন, 'আপলোগ বহুত আগে নিকাল আয়ে হ্যায়। আব গঙ্গাকে কিনারে কিনারে পিছে কো চলে যাইয়ে। ও—ও দেখিয়ে বড়ে বড়ে পাত্থর হ্যায়—যাঁহা সে আভি এক বগুলা উড় গয়া—উসীকে পিছে এক পেড় হ্যায়, ওহী যা কর পাত্তা লাগাইয়ে। হংসদেব অ্যায়সি হী জগহমেঁ রহতে হ্যায়।'

দিক ঘুরে উলটো মুখে চলতে শুরু করি। এবার দাদা আগে, আমি বড়দি পিছনে। নাকে মুখে হাওয়ার ঝাপট লাগে, চুল এলোমেলো ওড়ে, শাড়ির আঁচল গরম চাদর আঁকড়ে ধরি গায়ে।

আগে পিছনে কত দূর দূর অবধি খড়ের ছাউনি পড়েছে, গঙ্গার এপারে, ওপারে, মাঝের চড়ায়, ওদিকে ঐ বনের কাছে। না জানি কারা থাকেন ওখানে।

আমাদের মতো অন্য যাত্রীরাও দু-চার দল বেড়াচ্ছে ছাউনি খুঁজে খুঁজে, যে

যার উদ্দেশ্যে এসেছে এখানে তাঁর দর্শন উপলক্ষে।

হঠাৎ বড়দি হাঁটা থামিয়ে চোখের উপর হাতের ছায়া ফেলে দূরের কী যেন দেখতে লাগলেন।

হাল্কা সবুজ ঘাসে ঢাকা উঁচু জমি ঢালু হয়ে নেমে এসেছে গঙ্গার দিকে। সেই উঁচু জমির এক পাশে লম্বা একটা টিন্‌টিনে গাছ, তারই ঝির্‌ঝিরে ছায়ায় কে যেন এক তক্তপোশে বসে। দেখি, দাদা উঠে গেলেন পাড় বেয়ে, পায়ের জুতো খুলে রেখে প্রণাম করলেন তাঁকে।

তবে কি ইনিই হংসদেব? বড়দি মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলেন।

পিছন ফিরে বসে ছিলেন হংসদেব; প্রণাম করলাম। খেজুর পাতার তালাই এনে ঘাসের উপর পেতে দিলেন এক ভক্ত। বসে পড়লাম তাতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হংসদেবের মুখোমুখি হয়ে।

কান-ঢাকা লাল টুপি, লাল গেরুয়ার পাতলা আলখাল্লা গায়ে, লাল ডুরে গামছা হাতে, লাল টক্‌টকে চেহারা নিয়ে বসে আছেন হংসদেব কালো কম্বলের উপরে।

ফিস্‌ফিসিয়ে বড়দি বলেন, 'এঁর রূপের বর্ণনা বহু শুনেছি; আরো সুপুরুষ ছিলেন আগে। এখন শরীর ভেঙে গেছে।'

কম্বলের পাশে দুটি পাতলা বালিশ, সাদা ওয়াড়ে ঢাকা, কোনায় সবুজ রেশমে ফুলকারি করা—কোনো ভক্তের হাতের যত্নে তোলা। দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন হয়তো এখানে।

এই ঠাণ্ডা খোলা হাওয়ায় বিশ্রাম হয়? 'জয় জয় রাম' বলে এক সাধু এসে হেসে দাঁড়ালেন সামনে। যেন হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এখানে। দেখে মনটা খুশিতে নেচে ওঠে। আরে, এঁকেই তো দেখেছি আজ আসবার মুখে, কন্‌খলের বটগাছটার কাছে।

সেবাশ্রম হতে বেরিয়ে একটা মোড় ফিরতেই বটগাছ। তার তলা দিয়ে টাঙ্গা চলেছে, বসেছি পিছন দিকে উলটো-মুখী মুখ করে; জড়োসড়ো শীতে, আপাদ-মস্তক মোটা চাদরে ঢেকে। দেখি, এক সাধু হেঁটে আসছেন হন্‌হন্‌ করে খালি গায়ে। কী দৃপ্ত ভঙ্গি! প্রৌঢ়, শ্যামল রঙ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ, উন্নত কাঁধে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল খর্পর; হাস্যোজ্জ্বল—স্থির গম্ভীর মুখ, পৌরুষের প্রতিমূর্তি। আমরাও চলেছি, তিনিও আসছেন; অনেকক্ষণ দেখেছি তাঁকে সামনাসামনি।

এই তো সেই তিনি। এতক্ষণ হাল্কাভাবে এঁরই ছাপ তো লেগেছিল মনে দেখছি তলিয়ে। তিনি 'জয় জয় রাম' বলে এসে দাঁড়াতেই হংসদেবও 'হরিহর' বলে অভিবাদন করলেন। সাধু কী যেন বললেন—তন্ময় ছিলাম, শুনতে পেলাম না। হংসদেব তাঁকে হাত দিয়ে দূরের একটা ছাউনি দেখিয়ে দিতেই তিনি আবার 'জয় জয় রাম' বলে দৃঢ় পদক্ষেপে সেদিকে চলে গেলেন।

চালাঘর বাঁধছে মজুরের দল আঙিনায়, খড়ের আঁটি খুলে। হংসদেব হেঁকে বললেন, 'খড়গুলি ভালো করে ঝেড়ে নাও চালে বিছোবার আগে।'

অনেক ভক্ত আসবে কুম্ভ উপলক্ষে এখানে। থাকবে কিছুদিন। সাধুসন্তদেরও আশ্রয় দেবেন, যাঁরা চান। সেইজন্য চালা বাঁধা হচ্ছে পর পর এক সারিতে। সভা-মণ্ডপও বাঁধা হবে একটা, যেখানে জমায়েত হবেন অনেকে একসঙ্গে—আলাপ

আলোচনা, আদেশ উপদেশ গ্রহণ করতে।

ইঞ্জিনিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্ল্যানের কাগজ হাতে নিয়ে। হংসদেব তাঁকে ডেকে কাগজে দাগ টেনে বোঝালেন, 'মণ্ডপটি হবে অর্ধচন্দ্রাকারে, এই জায়গায় এই ভাবে—' বলতে বলতে ঝট্ করে ডুরে গামছাটা কোমরে বেঁধে উঠে গেলেন নিজেই। গিয়ে, হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে বললেন, 'এই—এতখানি জুড়ে।'

ছেলেমানুষের মতো খুশিতে ব্যস্ত। একবার করে এসে বসেন, ঘাড় নেড়ে 'বাঃ, বাঃ' করেন; আবার গিয়ে মাটিতে আর-একটা দাগ কাটেন। বলেন, 'আর দিন-দশেকের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে সব ছাউনি।'

ইলেকট্রিক ডায়নামোও বসবে। গুজরাটি এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছেন সঙ্গে; তিনিই নিয়েছেন এ ভার।

মস্ত একটা শিমুলগাছ সীমানার মাঝখানে ডালপালা মেলে। হংসদেব গাছটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এর মাথায় নিশান চড়াব, তার উপরে বিজলি বাতি জ্বলবে; অনেক দূর থেকে দেখা যাবে।' বলে, তিনি দুলে দুলে হাসতে থাকেন সেই আনন্দে।

হংসদেব পাঞ্জাবি; কথা তিনি হিন্দিতেই বলেন, কিন্তু বাংলা বোঝেন বেশ। বাংলাদেশেই বেশি সংখ্যক ভক্ত তাঁর। বাংলাদেশের রসগোল্লার উপরেও তাঁর খুব অনুরাগ। বলেন, 'বাংলা মুল্লুকের রসগোল্লা খেয়েই তো আমার এই অসুখ। এখন মিষ্টি খাওয়া একেবারে বারণ।'

দাদা বললেন, 'আপনার কথা প্রথম পড়ি দিঘাপাতিয়ার হেমলতা দেবীর বইয়ে।'

হংসদেব হাসলেন—'অ্যায়সা? বাঃ।'

দাদা বললেন, 'তিনি আপনার কথা বড়ো চমৎকার ভাবে লিখেছেন; সেই অবধি আপনাকে আমাদের দেখবার ইচ্ছে। এতদিনে সফল হল।'

আগ্রহভরে ব্রজরমণ প্রশ্ন তোলেন—সাধনা, শুদ্ধি নিয়ে।

একজন কথা তুললে শোনা হয় সবারই। যদিও সেই একই প্রশ্নের একই উত্তর; তবু বারে বারে শোনায় লাভ আছে। কোন্ এক মুহূর্তে জানা কথারই নতুন এক মানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মনের চোখে, গাঁথা হয়ে থাকে চিরদিনের তরে।

হংসদেব বললেন, শেঠজির দুই চাকর। একজন প্রতি মাসে মাইনে নেয়; একজন বলে, 'আপনার কাছেই থাক্, দরকারমত নেব।' এখন, যে চাকর মনিবের উপর এতখানি নির্ভর রাখে, মনিবের মন তার উপর প্রসন্ন থাকবে তো? মাইনে তো মনিব দেবেনই; কাজ করেছে মাইনে মিলবে না? মজুরি তো জরুর মিল যায়গা। লেকিন, নিষ্কাম হয়ে সাধনা করো; কামনা কর তো মজুরিমাত্র পাবে।

মণিবাহাদুর, রেবাদি আর মাসিমা—রেবাদির মা—এলেন। মাসিমাকে দেখলেই মার কথা মনে পড়ে যায়। মাসিমা ফল এনেছেন থলি ভরে। বলেন, সাধু আর দেবতা-দর্শন খালি হাতে করতে নেই, শাস্ত্রমতে। ফলগুলি বের করে চৌকির উপর সাজিয়ে রাখতে, হংসদেব সেগুলি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এ-হাত ও-হাত লুফতে লাগলেন। যেন খেলার রবারের বল ছোটো ছেলের হাতে।

সেই গুজরাটি ভদ্রলোকের স্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন কাছে; হংসদেব তাঁকে বললেন ফলগুলি কেটে দিতে। ভদ্রমহিলা তাঁবু থেকে বড়ো একটা কলাই-করা পিতলের

থালা ও ছুরি এনে সেখানেই বসে কাটতে লাগলেন।

মনে হল, মা হলে ধোওয়া কাপড় পরতেন, বঁটি ধুতেন, থালা ধুতেন, যে জায়গায় বসে কাটবেন সেখানে গঙ্গাজল ছিটোতেন, তবে জল-ভরা গামলায় ডুবিয়ে ফলগুলি কেটে কেটে পাথরের থালায় সাজিয়ে রাখতেন।

মাসিমা পাত্র নিয়ে এসেছেন সপ্তসরোবরের জল নিয়ে যেতে। ঘরে রেখে দেবেন।

বলি, 'সপ্তসরোবর কোথায়?'

শুনে হংসদেব বললেন, 'এখানকার এই গঙ্গার নামই সপ্তসরোবর। আগে কোনো কালে সাত ধারা ছিল হয়তো। উঠে দেখলে বুঝতে পারবে। এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সাতটি ধারা সাত দিক হতে এসে এখানে গঙ্গাতে মিশেছিল। বশিষ্ঠাদি সপ্ত ঋষি এখানে তপস্যা করেছিলেন। পরীক্ষিৎকে স্বয়ং শুকদেব এখানে এই সপ্তধারায় ভাগবত শুনিয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ দেহরক্ষাও করেন এখানে। বড়ো পবিত্র জায়গা।'

সত্যিই, অতি সুন্দর স্থান—নিরিবিলি, খোলা। শহরের কোনো কোলাহল এসে পৌঁছোয় না এখানে। দূরের পাহাড়গুলি কত কাছে মনে হয়। সেই নীল পাহাড়, নীল আকাশ, নীল গঙ্গার জল। তার পাড় দিয়ে হেঁটে চলে উজ্জ্বল গেরুয়ায় অঙ্গ-ঢাকা একাকী সন্ন্যাসী। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ মন ছুটে চলে সাথে; তাকিয়ে থাকি পলকহীন চোখে।

হংসদেব বললেন, 'এইজন্যই বেছে নিয়েছি এ জায়গা। হরিদ্বারে বড়ো ভিড়; কত লোক! আমার এখানেও আসবে অনেক, তবু ভিড় মনে হবে না জায়গার গুণে।'

কেবল হরিদ্বারেরই পূর্ণকুম্ভে এইবার নিয়ে সাতবার এলেন হংসদেব।

তা হলে তাঁর বয়স কত এখন?

তিনি বললেন, 'কুম্ভমেলার হিসাব জানি, বললাম। বয়সের হিসাব তো করি নি কখনো।'

বড়দি জিজ্ঞেস করলেন, 'কুম্ভমেলায় স্নান করার ফল আছে—এ কি সত্যি?'

'বিশ্বাস রাখলে সবই সত্যি। ধরো, এই যে সব সম্প্রদায়ের এত সাধু এই এক জায়গাতেই কেন আসছে এত কষ্ট করে, কোন্ দূর দূর দেশ থেকে, কোন্ দুর্গম পাহাড়ের গুহা থেকে—কিসের টানে? রাজা মহারাজা কোটি কোটি টাকা খরচ করেও তো পারবে না এত সাধু এক জায়গায় জড়ো করতে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাই বলেই তো আসেন।

'আর-একটা দিক আছে; সহজ কথায় ধরে নাও—এটা হল সাধুদের কংগ্রেস। সবাই আসেন, সবার সঙ্গে দেখা হয়; একটা উপলক্ষ নিয়ে এক জায়গায় সবাই এক হয়।'

দাদা বললেন, 'আচ্ছা, পিতৃমাতৃতর্পণ লোকে যে করে, তা কি পৌঁছোয় গিয়ে ঠিক জায়গায়?'

'দেখো, এও সেই বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাস করলে সবই সম্ভব।' বলে হংসদেব চুপ করলেন। খানিক পরে মুখ তুলে বললেন, 'একটা কথা মেনে নাও-না যে, যে মা-বাবা তোমাকে ছোটো থেকে এত বড়োটি করলেন, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্নজল দিলেন,

তোমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করলেন, তাঁদের নামে একদিন তুমি একটু তর্পণ করলেই বা ; কষ্ট তো নেই কিছু তাতে।'

থালা-ভরা কাটা ফল সামনে এনে ধরলেন, কাটছিলেন যিনি। হংসদেব নিজের হাতে বিতরণ করলেন সবাইকে ; নিজেও খেলেন কিছু রেকাবিতে তুলে নিয়ে। বললেন, 'যাও, আমার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার দেখে এসো।'

চালাঘরেরই একটাতে ভাঁড়ার ; বস্তা বস্তা আটা, টিন টিন ঘি, ঝুড়ি-ভরা আলু কপিতে বোঝাই ঘর। হাজার লোকের 'ভাণ্ডারা' হবে রোজ, মেলার সময়। তারই ব্যবস্থা এসব।

উঁচু চালার বিরাট রান্নাঘর তৈরি হচ্ছে গঙ্গার পাড় ঘেঁষে ; জল তুলতে বেগ পেতে হবে না বেশি। বেদী-বাঁধানো উনুন ; কত না জানি রুটি সেঁকা হবে এক এক বেলা।

হংসদেব এ ক'দিন তাঁবুতে ছিলেন। আজ খড় ছাওয়া হল যে ঘরে তাতে ঢুকবেন। খুব খুশি নতুন ঘর পেয়ে। বললেন, 'মাটিতেই বিছানা করে দাও। নীচে পুরু খড় দিলে ঠাণ্ডা লাগবে না।'

ছোটো বড়ো সব কিছুতেই লক্ষ তাঁর ; নিজে দেখছেন, শুনছেন, হিসাব করছেন। সৌন্দর্যের দিকটাও বাদ যায় না। চালাঘরের দরজাটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কতবার সে দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করলেন, আবার নিজে নিজে সান্ত্বনাও নিলেন, 'কী করা যাবে। বড়ো আনাড়ি এরা।'

সময় হয়ে এল, উঠতে হয় এবার। লাল রঙের বাস একখানা ছিল সেখানে। এঁদেরই। শহরে নানা কাজে যায় আসে, জিনিসপত্র আনে হাটবাজার হতে। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, কী কাজে ফের শহরে যাবে ; হংসদেব ডেকে তাকে হাত নেড়ে থামালেন। বললেন আমাদের, 'তোমরা ফিরবে কী করে? এই বাসেই চলে যাও।'

বলি, 'দরকার হবে না, গাড়ি সঙ্গে আছে। টাঙ্গাওয়ালা হয়তো অপেক্ষা করছে বনের ধারে।'

বলতে না বলতে সে এসে হাজির সামনে। খুঁজে বের করেছে, এই তার ভারি গর্ব। বলে, বেলা চলে গেল, আর যেন দেরি না করি আমরা মেহেরবানি করে।

'যাচ্ছ? তবে যাও। থাকবার যদি অসুবিধে হয় তো চলে এসো এখানে। অনেক ডেরা আছে। তোমাদের সবার জন্যেই তো করা।' বলে হংসদেব বিদায় দেন আমাদের।

হাল্কা মনে টাঙ্গাতে গিয়ে উঠি।

উঠবার আগে মুহূর্ত থেমে একবার পিছন ফিরে তাকাই—দূরে কোথায় তিনি মিলিয়ে গেছেন, আমার সেই সাধু। মনে হল, আর একটিবার যদি দেখতাম তাঁকে!

ফটক পেরোতেই দেখি দুটো বানর ; বসে আছে হাঁটু মুড়ে দেয়াল ঘেঁষে। দেখেই পিছু হটে এলেন শশী মহারাজ। বললেন, 'বানর সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন।'

না, হাসি না। এখন অবশ্য অত বানর নেই এখানে, ধরে ধরে চালান দিয়েছে বাইরে। কিছুদিন আগেও যা বানর ছিল! আর অত্যাচারের কথা কী বলব মশায়। একদিন আমি আসছি রাস্তা দিয়ে, প্রায় পেঁাছে গেছি সেবাশ্রমে; হঠাৎ দুটো বানর দু দিক থেকে এসে আমাকে টেনে একেবারে নালায় নিয়ে ফেলল। আমি তো হক্‌চকিয়ে গেছি, কী করি ভেবে পাই না। শেষে নির্বাণী আখড়ার লোকেরা এসে বানর দুটোকে তাড়িয়ে আমাকে তোলে নালা থেকে। পরে অবশ্য বুঝলাম কেন তারা ধরেছিল আমাকে। শীতের জন্য হাত দুটো আমি চাদরের নীচে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলাম, আর বানর দুটো ভেবেছে বুঝি খাবার নিয়ে চলেছি।'

সুবিধে পেলেই শশী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হই। অনেক কথা জেনে নিই তাঁর কাছ হতে, পথ চলতে চলতে। বহু ঘটনায় জড়িত এ স্থান। শোনা দেখা, অতীত বর্তমান, দুই মিলিয়ে গেঁথে নিলে স্মৃতি থাকে স্পষ্ট মনে। স্নেহশীল রোগা পাতলা মানুষ শশী মহারাজ, জ্ঞানের পথেই চলেন সোজা। সহজ কথার সহজ মানে; বিচার বুদ্ধির পরিষ্কার মীমাংসা। ভক্তিরসের আবরণে গুলিয়ে যায় না কিছু। তদুপরি দরদী প্রাণের ছোঁয়াচ পাই তাঁর আচরণে। এসেছি তীর্থে; বৃথা না হয় আসা, নানা আবর্তে পড়ে হাবুডুবু না খাই আমরা, সদাসতর্ক সে সম্বন্ধে তিনি। কোথায় কী দেখতে হবে, কী ভাবে দেখতে হবে, কী জানা দরকার, কতখানি দরকার—সব বিষয়েই একটা পরিষ্কার ছক দেগে দেন আগে হতে। তাই অকারণ খোঁজাখুঁজি, আকুলি-ব্যাকুলি, ছট্‌ফটানির হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে যাই সহজে।

শশী মহারাজ আসামের লোক। অনেক দিন ছিলেন শিলচরে; বড়দি দাদার সঙ্গে আলাপ তাঁর বহু দিনের। কতকাল বাদে আবার দেখা এখানে। ঘুরে ফিরে তিনি কেবলই আসেন, হঠাৎ হঠাৎ-মনে-পড়ে-যাওয়া নানা লোকের কথা জিজ্ঞেস করেন—এ কেমন আছে, সে কী করে? ছেলেবেলার গল্প বলেন, শৈশব কেটেছে যেখানে সেই স্মৃতি ভেসে ওঠে মনে। বলেন, 'সে জায়গাটা কেমন হয়েছে এখন? তেমনই আছে? আমাদের সময়ে যা জঙ্গল ছিল সেখানে। সেই ভৈরবী? কবে মারা গেল সে? সেবারে ফ্লাডে আমি তাকে প্রায়ই মুষ্টিভিক্ষার চাল দিয়ে আসতাম। থাকত একটা উঁচু জায়গার মতো ঢিবির উপরে, একটা চালাঘরে। বানের জলে সেটা যেন দ্বীপের মতো হয়ে গেল। গলা অবধি জল। চার-পাঁচ দিন যেতে পারি নি। জল একটু কমলে চাল নিয়ে গেলাম; জিজ্ঞেস করলাম, এ ক'দিন কী খেলেন? ভৈরবী বললে, কী আর খাব? আমি বললাম, কিছু না খেয়ে থাকলেন কী করে? সে বললে, হাঁ রে, এতদিন ধরে এত ভাত খেলাম, আর কটা দিন ভগবানের নাম খেয়ে কাটাতে পারব না?

'জাতে কিন্তু চাঁড়াল ছিল ভৈরবী, অথচ কী কথা তার মুখে বুঝে দেখুন। তার পর চাল দিয়ে চলে আসছি, ভৈরবী আমাদের ধরে পড়ল; বলল, এসেছ যখন তখন আজ না খেয়ে যেতে পারবে না। চাল এনেছ, আমি রান্না করি, একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে। আমার সঙ্গে আর-একটি ছেলেও ছিল। ঘরের চার দিকে কলাগাছ অনেকগুলি; ভৈরবী গাছের কাঁচকলা সিদ্ধ ভাত রাঁধল। কী বলব মশায়, যেন অমৃত খেলাম সেদিন। এতদিন তো হয়ে গেল, এখনো সে স্বাদ মুখে লেগে আছে!'

শশী মহারাজের এইরকম ছোটোখাটো সুখস্মৃতিগুলি শুনতে বড়ো ভালো লাগে। সন্ন্যাসীর মনে সাধারণ মানুষের এই-যে কোমলতা, এ অন্তর স্পর্শ করে।

বড়দির বড়ো আকাঙ্ক্ষা, শ্রীমার গল্প শোনেন এ'দের মুখে। বলেন, 'বইয়ে যা পড়ি, তৃপ্তি হয় না। তাঁর নিজ শিষ্য, যাঁরা মার অতি কাছাকাছি ছিলেন, তাঁদের কাউকে পেতাম যদি তো শুনতাম বসে।'

শশী মহারাজ নিয়ে এলেন রামময় মহারাজকে। শৈশবেই তিনি মার কাছে দীক্ষা নেন। শিশুর হাসি তাঁর মুখে, মধুর কণ্ঠস্বর কথার ধ্বনিতে। গল্প বলবার ভঙ্গিটিও বড়ো সুন্দর; তন্ময় হয়ে শ্রীমার কথা বলেন। বলতে বলতে ভাবের আবেগে কোথায় চলে যান, যেন মার কোলে কচি শিশু বসে দোলা খায়। মুগ্ধ হয়ে শুনি, তাঁর গল্পের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট মাকে দেখি। যেন পর পর ছবি এক-একটি। এ আর-এক ধরনের সৃষ্টি। এর মাধুর্য আলাদা। ভিতরের সেই বিশেষ যোগাযোগ না থাকলে এমন মধুর রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারে না।

রামময় মহারাজ বললেন, 'তখন কি ছাই অত বুঝেছি। ছেলেমানুষ ছিলুম, আদর আবদারেই কেটে গেছে সময়। মা'ও ছোট্টছেলে বলেই খুব কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর। মার বড়ো বড়ো শিষ্যরা বলতেন, রামময় ছোটো হয়েই জিতে গেল। কত সহজভাবে মা আমাদের কত বড়ো শিক্ষা দিতেন। মার জন্মদিন। তিনি তখন আছেন জয়রামবাটিতে, ছোট্ট একখানা ঘরে। অনেক শিষ্য এসেছেন সেই উপলক্ষে। মা সবাইকে নিজের হাতে রে'ধে-বেড়ে খাওয়াতেন। সব কাজ নিজের হাতেই করতেন। আমি যখন প্রথম মার কাছে যাই, ভাবতে ভাবতে চলেছি, না জানি কেমন দেখব মাকে। গিয়ে দেখি ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন মা—অতি সাধারণ "মাতৃমূর্তি"—ঘরে ঘরে যেমন দেখি। অনেক দিন পর্যন্ত কথাটা মনে খচ্ খচ্ করেছে; ভেবেছি, মা কি ঘর ঝাঁটটা না দিয়ে পারতেন না? অন্ততঃ ঐ সময়টায়? শিশুমনে মার ঐ ঘর ঝাঁট দেওয়ার মূর্তিটা নিতে পারি নি সহজ মনে। খোঁচা বি'ধত। তা, সেদিন জন্মদিনে মা আমাকে বললেন, ওরা এসেছে, যাও তো কিছু দুধ জোগাড় করে আনো গাঁ থেকে; পায়েস রাঁধব। আমি তখনি ঘড়া কাঁধে বেরিয়ে গেলাম। ঘর ঘর ঘুরে আট সের দুধ জোগাড় করে আনতে বেলা হয়ে গেল। ফিরে এলে পর সবাই বকলেন, কেন এত দেরি করলে? মা বসে আছেন সেই অবধি, মুখে জল দেন নি এখনো পর্যন্ত।

'ঘরে ঢুকে দেখি মা বসে আছেন চৌকিতে পা ঝুলিয়ে। খোলা চুল। সবাই মাকে পুজো করেছেন। আমি আসতেই মা বললেন, এসেছ? এতখানি বেলা হল খাও নি কিছু। এবার তোমার পুজো সেরে নাও।

'পাশেই একটা পাত্রে সাদা পদ্ম লাল পদ্ম ছিল; কোন্‌টা নেব ভাবছি, মা বলে দিলেন, লাল পদ্ম নাও; দেখো, তুলসীপাতা লেগে নেই তো ওতে? মা'ই মন্ত্র বলে দিলেন। সেই মন্ত্র আওড়ে মার পায়ে পদ্ম দিয়ে প্রণাম করলাম। মা বললেন, রোসো, আরো দুটো পদ্ম নাও, জ্ঞান আর গিরীন আজ উপস্থিত নেই, তারা তোমায় ভালোবাসে, তাদের নামে তুমি আমায় পদ্ম দাও।

'এই জ্ঞান-দাই আমায় প্রথম নিয়ে গিয়েছিলেন মার কাছে। জ্ঞান-দার কাছে দুবার আমি যা বকুনি খেয়েছি! একবার মার থালায় বসেই খেয়ে ফেলি। আমার

দোষ নয়, আমি তো তখন ছোটো, স্কুলে পড়ি। কাছাকাছি গ্রাম, শনি-রবিবার এসে মার কাছে থাকি; সোমবারে একেবারে ক্লাস সেরে বাড়ি ফিরি। বাড়িতে আমার নিজের মা-বাবা অবিশ্যি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন প্রথম প্রথম; কিন্তু পরে আর কিছু বলতেন না। লেখাপড়ায়ও সকলের চেয়ে ভালো ছিলুম, সেদিক দিয়েও বলবার কিছু ছিল না। তা, সেই শনিবারে, মা জানতেন আমি আসব—তাঁর পাথরের থালাতেই প্রসাদ বেড়ে রেখে দিয়েছেন ঢাকা দিয়ে। বললেন, আগে খেয়ে নাও। সেই কখন খেয়েছ।

'আমি তখনি বসে গেলুম খেতে। এমন সময়ে জ্ঞান-দা ঢুকে পড়লেন; বললেন, কী আক্কেল তোর; মার থালা এঁটো করে দিলি?

'মা কিন্তু থালা আর বদলালেন না। বললেন, কী হয়েছে, ছেলে খেয়েছে তাতে কি এঁটো হয়? তুমি ওকে বোকো না জ্ঞান, ঐ পাথরেই আমি খাব।

'আর একবার, শরৎ মহারাজের থালা এঁটো করে দিই। ঐ জয়রামবাটিতেই এসেছেন শরৎ মহারাজ; প্রায়ই এসে থাকতেন। তখন দেখেছি সে আর-এক রূপের প্রকাশ। শরৎ মহারাজ থাকতেন পাশের ঘরে। প্রতিদিন সকালে মাকে প্রণাম করতে আসবেন—আমাকে দিয়ে খবর নেওয়াতেন, যা তো, দেখে আয়, মা এখন কী করছেন। দেখে এসে বলতুম, মা এখন তরকারি কুটছেন, কি ঘর ঝাড়ছেন, কি আটা মাখছেন, বাসন ধুচ্ছেন, মশলা বাটছেন—এমনি সব। তিনি আবার সাবধান করে দিতেন, মাকে যেন কিছু বলবি নে, চুপটি করে দেখবি আর এসে আমায় বলে যাবি। পাছে মাকে বিরক্ত করা হয় তাই সাবধান করে দিতেন। শেষে, যখন এসে বলতুম মা এইবার বসে আছেন, তখন "ঠিক বলছিস তো, ঠিক বলছিস তো" বলতে বলতে শরৎ মহারাজ উঠতেন। প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া মানুষ ছিলেন, সেই মানুষ যখন হেলতে দুলতে মাকে প্রণাম করতে যেতেন—দেখবার মতো ছিল। শরৎ মহারাজ ঘরে ঢুকে সেই বিরাট শরীর মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করে চলে আসতেন।

'শরৎ মহারাজের কাছে কত গল্প শুনতাম স্বামী বিবেকানন্দের। বসে বসে আমাকে শোনাতেন সেসব।

'একবার স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎ মহারাজ আর স্বামী অভেদানন্দ বেরিয়েছেন —কোন্ পাহাড়ে। স্বামীজির শরীর খারাপ হল; একদিন একটু বেগুনের ঝোল খেতে চাইলেন। শরৎ মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, এক অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ির খেতে অনেক বেগুন ধরে আছে। তাঁরা দুটি বেগুন চাইলেন তা থেকে; লোকটি একটিও দিতে রাজি হল না। কী করেন তাঁরা, ফিরে চলে এলেন। শুনে স্বামিজী বললেন, তোরা আমার কিরকম গুরুভাই রে! আমার জন্যে দুটো বেগুন চুরি করে আনতে পারলি নে? শরৎ মহারাজ স্বামী অভেদানন্দকে নিয়ে আবার গেলেন সেই গৃহস্থের বাড়িতে। এবার পরামর্শ ছিল, একজন গিয়ে লোকটির সঙ্গে "পরমার্থ-প্রসঙ্গ" জুড়বেন, আর একজন পটাপট্ দুটো বেগুন খেত থেকে তুলে নিয়ে আসবেন।

'এমনি সব মজার মজার কত গল্প।

'আর একবার পাহাড়েই ভ্রমণে বেরিয়েছেন এই তিনজন। খাবার পান নি সারা

দিন ; ঘুরতে ঘুরতে এক অর্থবান লোকের দুয়োরে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু লোকটি ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যা-তা করে তাড়িয়ে দিল তাঁদের। স্বামী অভেদানন্দ বললেন, এই করে হবে না। তোমরা হেসো না, দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখো। জানো না কি এদের রীতি—

গাড়োয়াল সে দাতা নেহি ;
লাঠি বেগর দেতা নেহি।

—লাঠি দেখিয়ে ভিক্ষে আদায় করব। বলে তিনি ক'ষে মাথায় পাগড়ি বেঁধে, লম্বা একটা লাঠি হাতে নিয়ে ফের সেই গাড়োয়ালের বাড়িতেই গেলেন। গিয়ে হাতের লাঠি উঠোনে ঠুকে হুমকি দিয়ে দাঁড়াতে সেই গৃহকর্তা ছুটে এসে পায়ে পড়ল। অভেদানন্দ একবার করে হুম্‌কি দিয়ে মাটিতে লাঠি ঠোকেন আর বলেন, “আটা লাও”, “ঘিউ লাও”, “মিঠাই লাও” ; আর লোকটি দৌড়ে দৌড়ে ঘর থেকে তা এনে এনে পায়ের কাছে জড়ো করে। তিনি সেইসব নিয়ে স্বামীজিদের কাছে ফিরে এলেন। তিনজনের তখন কী হাসি।

‘এই শরৎ মহারাজের থালাতে বসেই একদিন আমি খেয়ে ফেলি। মা তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে সেই পাতেই আমায় খেতে দিলেন। মা খেতে দিয়েছেন, ভাববার কী আছে? বসে গেলাম খেতে। কিন্তু কপালে আছে বকুনি খাওয়া— পড়ে গেলাম সেবারেও জ্ঞান-দারই সামনে।’

রামময় মহারাজের এই জ্ঞান-দার কাছেও শুনি কত গল্প মায়ের। আলাদা করে সব লিখবার মতো। মা সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন ; কিন্তু এ মার আর-এক ‘রূপ’। জ্ঞান মহারাজ বলেন, ‘শরীরময় দগ্‌দগে পাঁচড়া, চার মাস বিছানায় ছিলুম ; মা নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন, ঘা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন। মাছ খেতে পছন্দ করতাম না ; মা বাড়া ভাতের ভিতরে কাঁটা বেছে মাগুর মাছ লুকিয়ে রেখে প্রতি গ্রাস মুখে তুলে দিতেন। কী, না রক্ত পরিষ্কার হবে।’

শুনি আর ভাবি, মায়ের এই ‘রূপ’ ছিল বলেই তো তিনি ‘মা’। তাই তো তাঁর সন্তানরা আজও পাকা-চুলে-ভরা মাথা নিয়ে শিশুভাবে রূপান্তরিত হন মার কথা বলতে গিয়ে। এ জিনিস বোঝায় কে কাকে?

সারা দিন কেটে যায় তাঁবুর ভিতরে বসে গল্পে গল্পে। কোথা দিয়ে কাটল টের পেলাম না মোটে। কিন্তু হাতপাগুলো একবার না নাড়লে নয় ; আড়ষ্ট হয়ে গেছি শীতে।

হাঁটতে শুরু করি শহরের ভিতর দিয়ে। দলে দলে যাত্রী আসছে এখানে, নানা ট্রেনে। সারাক্ষণ তাদের ভিড় লেগে আছে রাস্তা জুড়ে।

হাঁউমাউ করে উঠল বুড়ি যাত্রী টাঙ্গা হতে নেমে, ‘কোথায় এনে ফেলল বাবা দেখো ; আবার কোথায় নিয়ে যেতে চায়।’

টাঙ্গাওয়ালা নামতে দেবে না গাড়ি হতে। পিছন পিছন ছুটে আসে, বলে, ‘আগে ভাড়া দাও, পিছে উতর যানা।’

বুড়ি আঁচলের খুঁট শক্ত করে চেপে থাকে, বলে 'কী কপালের গেরো রে বাবা! ডাকাতের হাতে পড়লাম যে। ও বাবা, বাবা—'

দাদা এগিয়ে যান, 'কী বুড়ি মা, কী বুড়ি মা?'

বুড়ি বলে, 'দেখো-না, ইস্টিশানে ভিড়ের মধ্যে দলছাড়া হয়ে পড়লুম। আসছি কোন্নগর হতে। আরো একবার এসেছিলুম এখানে, বহুদিন আগে। জানা জায়গাই তো। বললুম, নিয়ে চলো আমাকে সেখানে। তা মুখপোড়া গাড়োয়ান আমাকে কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে মারছে দেখো।'

টাঙ্গাওয়ালা বলে, 'কী করব বাবু? সওয়া দুই ঘণ্টা হল এ বুড়ি কেবল আমাকে ঘুরিয়ে মারছে। কোথায় যাবে বলে না। খালি বলে, চলো চলো।'

দাদা বললেন, 'কোথায় যাবেন আপনি?'

'জায়গাটার নাম ঠিকানা তো জানি নে বাবা। তবে সেবার যে এসেছিনু, রাস্তাটা মনে আছে। এই এতখানিই চওড়া একটা বড়ো রাস্তা, তার পাশেই ডানহাতি একটা সরু গলি দিয়ে ঢুকতে হত।'

দাদা চিন্তায় পড়ছেন—কত তো বড়ো রাস্তা, কত তার সরু গলি এখানে। কিন্তু বুড়ির কোন্‌টা?

বুড়ির আর তর সয় না। দাদার দুহাত চেপে ধরে, 'দাও-না বাবা আমাকে আমার দলে পেঁছে তাড়াতাড়ি। তারাও না জানি কত ভাবছে এতক্ষণে।'

দাদা বললেন, 'কার সঙ্গে এসেছেন? পুরুষ একজন ছিল তো সঙ্গে? তার নাম কী?'

'সে বাবা, তার নাম তো জানি নে। তা, তাতে কিছু আটকাবে না। আমি না জানলেও দলের লোক জানে বৈকি। তারাই নাম বলে দেবে তোমায়। তুমি আগে আমাকে নিয়ে চলো সেখানে।'

হতাশ দৃষ্টিতে দাদা তাকান।

বড়দি বললেন, 'এক কাজ করো। ঘাটে নিয়ে গিয়ে এক মুরুব্বি-মতো পাণ্ডা দেখে তার হাতে বুড়িকে ছেড়ে দাও। পাণ্ডা ঠিক খুঁজে বের করবে দলকে।'

বড়দি আর আমি অপেক্ষায় থাকি হরকি পৌড়ীর পুলের পাশে। লোক আসে যায়, আটার গুলি জলে ফেলে। একমনে মাছের খেলা দেখি দাঁড়িয়ে।

বচসা লাগে ভৈরবীতে বৈষ্ণবীতে, সিঁড়ির কোণে। থল্‌থলে বৈষ্ণবী ঠোঁট টিপে হেসে উস্কে দেয় আগুন; ভৈরবী ওঠে তিড়িং-বিড়িং করে জ্বলে।

গালির তোড়ে বুঝতে পারি, ঝগড়া লেগেছিল ভৈরবীতে ভৈরবীতে, খানিক আগে। একজন সংগ্রাম-স্থল পরিত্যাগ করতেই দর্শক বৈষ্ণবী অকুস্থানে এসে ইন্ধন জোগাচ্ছে অন্যটিকে। রসালো ঝগড়ার স্বাদ—কে চায় সহজে ছাড়তে?

বেঁটে খাটো কালো রঙের ভৈরবী; অল্প বয়েস, হাতে ত্রিশূল খর্পর, গলায় রুদ্রাক্ষ—আচম্‌কা আমায় টানতে টানতে নিয়ে চলল। বললে, 'ঐ—ঐ দেখুন যাচ্ছে, ঐ যে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। ঐ বেটিরই যত হিংসে আমার উপরে। আমি কেন ভিক্ষে বেশি পাই। আরে, আমি হলাম আসল ভৈরবী, আট সাল হল এখানে

আছি। ও তখন ছিল কোথায়? দেখি নি কি আমি? ও তো ক্যাংলার মতো পড়ে থাকত রাস্তায়। আজ এই দু বছর না হল মাত্র ভৈরবী হয়েছে। কিসের এত দাপট? আমি ভিক্ষে বেশি পাই তো, বলি, তোর তাতে কি? আমি গোঁসাইর ঘরের মেয়ে, গোঁসাইর ঘরের বউ। নবদ্বীপের পাঁচুগোপাল গোঁসাই—নিত্যানন্দ মন্দিরের সেবায়েত—তাঁর মেয়ে আমি। না জানে কে? তারকেশ্বরের নাম শুনেছেন তো? পাপমুখে বলতে নেই—' ব'লে, সে হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে দৃষ্টি আত্মস্থ করে আঙুল দিয়ে বুক দেখাল। বললে, 'মানে, সেই তারকেশ্বর আমার মধ্যে দেখা দিয়েছেন কিনা!'

ভাবখানা, যেন এসব কারো জানবার কথা নয়। নেহাত পুণ্যবলে জেনে ফেললাম আমি। হাত দিয়ে সে যেন দৈবাৎ খোলা দরজাটা দুম্ করে বন্ধ করে দিল। বলল, 'যাক সে কথা। এখন, আমার মধ্যে লোকে যদি কিছু দেখতে পায়, আমাকে যদি কিছু বেশি বেশিই দেয়, তবে হিংসে কেন করবে, বলুন? বলি, আমি কি তোদের মতন ভিখিরি? দিনরাত ভিক্ষে করেই বেড়াই? আমি হলাম আসল ভৈরবী। গেরুয়া পরি, নিয়ম-মাফিক বাঁধছাঁদ দিই, কপালে সিন্দুর ভস্ম মাখি, মন্তর পড়ে খপ্পর হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাই ; দশ কোশ জানি না, বারো কোশ জানি না, একটানা ভিক্ষে করে চলে আসি। ফের মন্তর পড়ে সাজসজ্জা খুলে ফেলি। হয়ে গেল সারা দিনের মতো। আর, আমার সঙ্গে কিনা তোর তুলনা? অ্যাঁ!'

বলি, 'গোঁসাই ঘরের বউ যে হও, তোমার স্বামী—'

'হ্যাঁ, স্বামীও আমার সঙ্গেই এসেছেন সাধু হয়ে। ঐ যে বললাম তারকেশ্বরের কথা ; ধন্না দিয়েছিলাম, তিনি আমার মধ্যে দেখা দিলেন ; তখন কি আর পারি ঘরে থাকতে? তা আমাদের তো আবার একলা চলে আসতে নেই। মেয়েমানুষ ; জানেন তো, একলা এলেই লোকে রটাবে—বেরিয়ে গেছে। স্বামীকে বললাম, উপায় কী? আমার তো আর ঘরে থাকা চলবে না। বুঝে-শুনে স্বামীও চলে এলেন। এখানেই থাকেন, আলাদা থাকি। মাঝে মাঝে দেখা হয়।'

'সন্তান সন্ততি?'

'তাও ছিল। দুই দুই ছেলে। তাদের ঐ গঙ্গার জলে রেখে দিয়েছি। বেশ আছি, নিশ্চিন্দি।'

দাদা এসে তাড়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত বুড়িকে পেরেছেন দলে পেঁৗছে দিতে, পাণ্ডার মারফত পাণ্ডা ঘেঁটে ঘেঁটে। বুড়ির দলের পাণ্ডা এসে নিয়ে গেল তাকে।

রাত হয়ে গেছে।

বড়দির থলি ছিল আমার কাছে, আনি দু'আনিতে ভরা, সারা দিনের দান-খয়রাতের বরাদ্দ করা। তাই খুলে মনের সুখে এক মুঠো আনি দু'আনি তুলে ফেলে দিলাম ভৈরবীর খর্পরে। হাত বাড়িয়ে খর্পরে পয়সা নিতে নিতে ভৈরবী তাকায় চার দিকে। ভাবখানা—সেই আগের ভৈরবী কানা বেটি গেল কোথায়? কাছে পিঠে থেকে থাকিস তো দেখ্ কেন আমি ভিক্ষে বেশি পাই।

বিছানার ভিতরে পা দুটো গরম হয় না সারা রাতেও। ঠাণ্ডা পা পেটে ঢুকিয়ে কত আর পারি! আজ মোজা পায়ে দিয়ে তবে শোব।

বড়দি বাক্স খুলে দাদার একজোড়া গরম মোজা বের করে দিলেন আমায় ; নিজের হাতে বুনে দিয়েছিলেন দাদাকে গত শীতে। মোজাজোড়া হাতে নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাই ; বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি ; পায়ে দেব কী করে? গোড়ালি, পায়ের পাতা—সরু মোটা কোনো গড়ন নেই। ঠিক যেন মার হাতের তৈরি বোতল-ঝুলিয়ে-রাখার শিকে দু'টি।

বড়দি রুখে ওঠেন, 'পায়ে দিয়েই দেখো-না। এ হচ্ছে মিলিটারি মোজা, নতুন প্যাটার্ন্।'

বেচারা দাদা!

আজই সকালে কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অনুভবানন্দ বলছিলেন শ্রীমার উল্লেখ করে যে, 'মা' ছিলেন সর্বংসহা। ভাবি, কিন্তু আমার এই দাদার মতো সর্বংসহা কে এই সংসারে, যাঁকে নাকি অম্লানবদনে এই মোজা পায়ে দিতে হয়েছে এবং দিয়ে খুশি হয়েছেন এই ভাবও ভাবে ফোটাতে হয়েছে।

'ভাণ্ডারা' হচ্ছে রোজই এখন আখড়াগুলিতে। এ এক সামাজিক ব্যাপার সাধুমণ্ডলীর মধ্যে। প্রতি আখড়া একটা করে ভাণ্ডারা দেবেই দেবে। যে পারে, মানে যার সামর্থ্যে কুলোয়, 'সমষ্টি ভাণ্ডারা' দেয় ; অর্থাৎ যত সাধু যত সম্প্রদায়ের সকলেরই নিমন্ত্রণ থাকে তাতে। আর যে না পারে সে 'ব্যষ্টি ভাণ্ডারা' দেয় ; প্রতি আখড়া থেকে দু-পাঁচ জন করে আসেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হিসাব অনুপাতে।

'ছাড়িদার'এর কাছে আগে হতে লিস্ট দিতে হয়, কে কী 'ভাণ্ডারা' দিতে চায়। সেই বুঝে সে দিন ফেলে—কবে কবে 'সমষ্টি' হবে, কবে কোথায় 'ব্যষ্টি'। একদিনে দু-তিন জায়গায় 'ব্যষ্টি' হতে পারে ; কিন্তু একদিনে একাধিক 'সমষ্টি' হলে অসুবিধে দু পক্ষেরই। নিমন্ত্রিতেরা যেখানে দুদিন খেতে পাবে সেখানে তাদের একদিন ফাঁকি পড়ে ; আর যাঁরা খাবার আয়োজন করেন, দু জায়গায় খাইয়েদের ভাগাভাগি হওয়ার দরুন তাঁদের খাবার নষ্ট হয়। সঠিক সংখ্যার নিশ্চয়তা থাকে না কোনো।

স্বামী অনুভবানন্দ বললেন, 'আমাদেরও ভাণ্ডারা দিতে হয়। আমরা দিই ঠাকুরের জন্মতিথিতেই ফি কুম্ভে। "ব্যষ্টি" দিই, "সমষ্টি"র টাকা কোথায়? এই "ব্যষ্টি"র টাকা ক'টাই কত কষ্টে জোগাড় হয়। কিন্তু এবার এখানে এত বেশি ভাণ্ডারা হচ্ছে যে, ফাঁক নেই একেবারে। সব দিনই আগে হতে লিস্টে উঠে ভরাট হয়ে আছে একেবারে। ছাড়িদার দিন দিতে পারছে না মোটে। আজও গিয়েছিলাম ; অনেক কষ্টে শেষে ২০শে একটা খালি দিন পাওয়া গেল। সেইদিনই আমরা ভাণ্ডারা দিয়ে দেব ভাবছি। এক-একটা আখড়া এবার পাঁচ-বার ছ-বার করে ভাণ্ডারা দিচ্ছে। ওদের ভাবনা কী? ছ-বার কেন, সারা মাস দিতে পারে। প্রভূত সম্পত্তিশালী আখড়াগুলি ; বিশাল জমিদারি। এই তো নির্বাণী আখড়া—সকলের চেয়ে ধনী। তার মণ্ডলেশ্বর কৃষ্ণানন্দ সেবার কেদারবদরী গেলেন, দু শো চেলা সঙ্গে নিয়ে।

পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে এলেন এক যাত্রায়। এবার শুনছি কৃষ্ণানন্দ ছ'টা ভাণ্ডারা দেবেন। দেবেন বৈকি। ভাণ্ডারার খরচ তো আর ওঁদের লাগে না। কোটিপতি লাখোপতি গুজরাটি মারোয়াড়ি ভক্ত আসে ; সারা বছরের ব্যাবসা-বাণিজ্যের পর ভাণ্ডারা দিয়ে সাধু খাইয়ে পাপক্ষয় করে যায়। শাস্ত্রেই তো আছে বিধান, সাধুদের খাওয়ালে পুন্যি হয়।'

কয়েকটা আখড়া মিলে একটা পঞ্চায়েতি। মহান্ত তার প্রধান ; মহান্তের উপর মণ্ডলেশ্বর— সর্বপ্রধান। খুব পণ্ডিত জনই মণ্ডলেশ্বর নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েতি হল 'কর্মসমিতি'। ক্ষমতা থাকে এ'দের হাতে ; মণ্ডলেশ্বর হন পঞ্চায়েতির হাতের পুতুল। মহান্তরা চেলা তৈরি করে মন্ত্র দেন, মণ্ডলেশ্বর দেন সন্ন্যাস। বর্তমান মণ্ডলেশ্বরদের মধ্যে সব চেয়ে পণ্ডিত হলেন জীবানন্দ ; আর ধনী হলেন কৃষ্ণানন্দ।

সেদিন এই কৃষ্ণানন্দেরই আখড়ায় গিয়েছিলাম ভাণ্ডারা দেখতে। 'ভাণ্ডারা হচ্ছে', 'ভাণ্ডারা হচ্ছে'— শুনিই কেবল ; ভাণ্ডারাটা কী ব্যাপার দেখতে হবে চোখে। দূরে দূরে হয়, দুপুর বেলা— যাওয়া ঘটে ওঠে না সময়মতো।

নির্বাণী আখড়া কাছে, আজ সেখানেই ভাণ্ডারা। শুনে ছুটতে ছুটতে গেলাম খাওয়া সেরেই। গিয়ে দেখি, ততক্ষণে লোহার শিকের প্রকাণ্ড ফটক বন্ধ হয়ে গেছে, ভিতর থেকে তালাচাবি দিয়ে। নিমন্ত্রিতেরা এসে গেছেন সবাই ; এখন বাজে লোকের ভিড় আটকানো দরকার।

আমাদেরই মতো আরো অনেকে জড়ো হয়েছে ফটকের সামনে। সাধুদর্শনে মহাপুণ্য ; আর একসঙ্গে এত সাধু দর্শন— এই ভাণ্ডারার মতো সুযোগ আর কিসে? তাই যেখানেই ভাণ্ডারা হয়, রাস্তার দু দিক ঠাসা— পুণ্যার্থীরা রোদ জল মানে না, অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু কতক্ষণ আর থাকা যায় এভাবে? পুষ্ট মারোয়াড়ি গিন্নি তিনজন শুয়েই পড়লেন ধুলোতে আঁচল বিছিয়ে। ফটকের ওদিকে টুল পেতে বসে আছে ছড়িদার মুখ ঘুরিয়ে রুপোর 'আসাসোটা' নিয়ে। বাইরে হতে কাকুতি-মিনতি জানাই— 'এ সাধুজি, এ বাবাজি, একবার জেরাসে খোলিয়ে।' কিছুতেই পাষাণ মন গলে না, বন্ধ দুয়ার খোলে না। কী আর করি— এক পা এগোই, তিন পা পিছোই ; ধীরে ধীরে বিষণ্নবদনে ফিরে চলি।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ভদ্রলোক, বললেন, 'যাতে কেও, এখানে দাঁড়াও, সাধু লোক এহি রাস্তাসে লোটেঙ্গে।'

পা ভারী হয়ে উঠেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আর দাঁড়াব কত! বক্ বক্ করি নিজের মনে।

রাস্তার পাশে উঁচু দেয়াল, কারো বাড়ির সীমানা ঘেরা ; সেই দেয়ালের মাথা দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'উস্‌পর চহ্‌ড়কে বৈঠো।'

এবার মেজাজ বিগড়ে ওঠে। এ ওর মুখ তাকাই। লোকটা ঠাট্টা করছে না তো? নয়তো দেয়ালের উপর উঠে বানরের মতো পা ঝুলিয়ে সারি বেঁধে বসে থাকা, এ কি মানুষের পক্ষে সম্ভব— বিশেষ করে মেয়েমানুষের?

ভদ্রলোক কী বুঝলেন, 'আইয়ে' 'আইয়ে' বলে আদর করে ডেকে নিয়ে গেলেন সেই দেয়াল-ঘেরা বাড়িতে। ভিতরে ঢুকে দেখি, বাইরে হতে যেটা উঁচু দেয়াল

মনে হয়েছিল, তার মাথা-সমান মাটি ফেলা উ'চু আঙিনা। হে'টে হে'টে সোজা উঠে যাওয়া যায় দেয়ালের মাথায়।

এই ভদ্রলোকেরই বাড়ি এটা। সাধুদের আসতে দেরি আছে ; ইত্যবসরে তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের তাঁর বাগান দেখাতে লাগলেন। যত্নে লাগানো নানারকম ফলের গাছে ভরা বাগান—আম পেয়ারা জাম আমলকী কত কী। একটা গাছে দেখি পাতাশূন্য কালো ডালের গায়ে অগুনতি সাদা ফুল। কী সুন্দর।

কী গাছ এটা?

ভদ্রলোক বললেন, 'নাসপাতি কা পেড়।'

নাসপাতি গাছ দেখেছি পাতায় ছাওয়া, ফলে ভরা অবস্থায়। এর এমন বাহার দেখি নি আগে কখনো। বাগানের সবুজ গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে এক-একটি নাসপাতি গাছ যেন সাজানো ছবি এক-একখানি।

রব উঠল—'সাধুরা আসছেন,' 'সাধুরা এসে গেলেন'। এ ওকে ধাক্কা মেরে ছুটে এসে বসলাম সেই দেয়ালেরই মাথায়, দু পা বাইরে ঝুলিয়ে।

মোটর রিক্সা, হর্ন ঘণ্টা, টাঙ্গা শিঙ্গা, মানুষের হর্ষ উল্লাস, সব মিলিয়ে এক প্রচণ্ড কলরব। ঝক্‌ঝকে মোটরে চেপে চললেন মণ্ডলেশ্বররা ; ফুলের মালার বোঝা গলায়, দেখেই তাঁদের আলাদা করা যায়। বৃদ্ধ সাধু, যাঁরা অসমর্থ, রিক্সা টাঙ্গা ভাগে ভাড়া নিলেন তিন-চারজন এক-একটায়। বাদবাকি সব হাঁটলেন এ-মুখে ও-মুখে—যাঁর যে দিকে গন্তব্য।

আশ্চর্য, এ'দের মধ্যে কে যে কী, কিছু বোঝবার উপায় নেই। শুনেছি সমষ্টি ভাণ্ডারায় নাকি অনেক বড়ো বড়ো মহাত্মা সাধুও আসেন, যাঁরা নির্জন তপস্যায় দিবারাত্রি কাটান লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু চোখের দেখা দেখে আমরা সাধারণ মানুষে মানুষ বুঝব কী উপায়ে? সবাই তো প্রায় একই রকম। একজনের মুখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলতে না ফেলতে, তিনি এগিয়ে যান ; আর একজনের মুখ ধরি। ভিড় সাফ হয়ে যায়, মনে গাঁথা পড়েন না কেউ। কী পরিহাস!

এখানে প্রায় ষাট-সত্তরটা ছোটো বড়ো আখড়া। ভাণ্ডারার খাওয়াও বাঁধাধরা। মোটা মোটা পুরি—বাঙালি সাধুরা বলেন 'ঘু'টে রুটি'। সেদিন বলছিলেন স্বামী অনুভবানন্দ, 'বেটারা কি খেতে জানে? একবার রামকৃষ্ণ মিশনের ভাণ্ডারাতে সেক্রেটারি-স্বামী বললেন, কী শক্ত শক্ত পুরি কচুরি খায় রোজ, ছে'ড়া যায় না দাঁত দিয়ে। আমাদের দেশের খাবার করে ওদের খাওয়াতে হবে। এবার পুরির বদলে ফুল্‌কো লুচি করো। খেয়ে দেখুক।

'কিন্তু কাকে খাওয়াব ফুল্‌কো লুচি? ময়াম-দেওয়া লুচিগুলি ওরা হাতে নিয়ে টিপে গু'ড়িয়ে দেয় আর বলে, এগুলি খাব কী করে? দেখুন ব্যাপার! ওদের ঐ ঘু'টে রুটি নইলে মুখে রোচে না।'

তা, সেই মোটা মোটা শক্ত পুরি কচুরি তরকারি—এখানে এরা বলে শাক—চাট্‌নি, আর কড়াপাকের শক্ত লাড্ডুর মতো বু'দের মণ্ডা। ডাল ভাণ্ডারায় অচল, কারণ ডাল জল দিয়ে ফোটাতে হয়। যে তরকারি জলে রান্না হবে তা হল 'কাঁচা ভাণ্ডারা', অনেকের আপত্তি থাকে খেতে। শাকসবজি আলুকপির তরকারিতে আলাদা জলের প্রয়োজন হয় না, কাজেই ভাণ্ডারায় চলে তা।

ভাবি, প্রতি ভান্ডারায় এই একই খাবার খুশিমনে খান কী করে সাধুরা? কত দূর দূর থেকে হেঁটে আসেন তাঁরা ভান্ডারায় খেতে। দেহ রাখতে দুটি আহারের প্রয়োজন তো সকলেরই।

শশী মহারাজ বললেন, 'ভান্ডারা দেখবার এত শখ—আজ হরিহর-মঠে ভান্ডারা, গিয়ে দেখে আসুন।'

হরিহর-মঠ তো সেবাশ্রমের রাস্তার এপার ওপার। কিন্তু যাব যে, সময় নিয়েই তো যত গোল। ঠিক যে সময়ে সেবাশ্রমে খাবার ঘণ্টা পড়ে সে সময়েই হরিহর-মঠে ভান্ডারা শুরু হবে। খাওয়া ফেলে ভান্ডারা দেখতে গেলে এখানে এঁদের অসুবিধেয় ফেলতে হয়। খাবার আগলে বসে থাকবেন হয়তো গিরীন মহারাজ, মানিক ব্রহ্মচারী—সে বড়ো অন্যায়। আর খেতে গেলে ভান্ডারা দেখা ঘটে না। খাওয়া সেরে যতক্ষণে যাব ততক্ষণে ওদের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।

বড়দি বললেন, 'বড়ো ভুল হয়ে গেল। যদি বলে রাখতাম কাল যে আজ আমরা খাব না দুপুরে, তবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। একদিন না খেয়ে থাকলে কী হয় এমন?'

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আখড়ার ঘাটে স্নান সেরে ফিরছি, ভিজে কাপড়ের পুঁটলি হাতে নিয়ে। হরিহর-মঠের পাশ দিয়ে আসতে দেখি, হুড়্ হুড়্ করে সন্ন্যাসীর দল ঢুকছে ভিতরে, নারকেলের মালার কমণ্ডলু হাতে নিয়ে। ফটকে সেই দিনের সেই ছড়িদার বসে। এ নাকি সব ভান্ডারাতেই এভাবে উপস্থিত থাকে, ফর্দ হাতে নিয়ে। কোন্ আখড়ার সাধু এল, কে এল না, কেন এল না, সব হিসেব রাখা, তদারক করাই কাজ এর এ সময়ে।

সাধুরা ঢুকছেন, এখন কি আর পারব ঢুকতে? এক-পায়ে দু-পায়ে বড়দির হাত ধরে এগোতে এগোতে সাধুর দলে ভিড়ে ঢুকেই পড়লাম মঠের ভিতরে। এখন যাই কোন্ দিকে? চার দিকেই আয়োজন। মাঠ জুড়ে, বারান্দা জুড়ে, মাটির গেলাস পড়েছে সারি সারি। সাধুরা বসলেই পাতা আর খাবার পরিবেশন করা হবে একসঙ্গে। নয়তো উড়ে তচ্নচ্ হবে শুকনো পাতার থালা হাওয়াতে। এর মধ্যে পা বাড়িয়ে কি ধমক খাব শেষটায়? ইতি-উতি চাই আর গলা বাড়িয়ে দেখি। সামনের বারান্দা পেরিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে যে সবাই—কী ওখানে? গুটি গুটি চলে আসি সামনে। বড়ো একটা হলঘর; মেঝেজোড়া কার্পেট; দেয়ালের গা ঘেঁষে সাদা ফরাসের উপর বিশেষভাবে একসার ফুলকারি আসন পাতা। অন্যান্য মণ্ডলেশ্বরদের নিয়ে হরিহর-মঠের মণ্ডলেশ্বর বসে আছেন, যে যার জায়গায় নিশ্চল পুতুলের মতো। নেড়া মাথার ঠিক মাঝখানে একটি করে গাঁদা ফুল। ভক্তরা কেউ বোধ হয় পুজো করে গেছেন এঁদের, একটু আগে। যেন শিবের মাথায় ফুল চড়িয়েছে নিশ্চিন্ত মনে।

বুঝলাম, এই বিশেষ আসন কেবল মণ্ডলেশ্বরদের জন্য। তাঁরা—আরও যাঁরা আসবেন—বসবেন এগুলিতে। অন্যরা বসছেন কার্পেটের উপর; অকুলান হলে অগত্যা যে যেখানে পারেন। এ নিয়ে বিসম্বাদ নেই কোনো। কেবল মণ্ডলেশ্বর-দের বেলায়ই রীতিনীতির এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই এক চুল। এইসব ভান্ডারায় 'মান' দিতে হয় মণ্ডলেশ্বরদের। ভক্তরা, যাঁরা যখন ভান্ডারা দেন, খাবার

আগে তাঁদের স্ত্রীপুত্র পরিবার উপযুক্ত অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে এসে এ'দের প্রত্যেককে পুজো করে গাত্রবস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ ও টাকা প্রণামী দেন। ভালো মন্দ, কম বেশি, এ দিতেই হবে। সিল্কের চাদরই গাত্রবস্ত্র হিসাবে দেওয়া হয় বেশির ভাগ। যাঁরা এত টাকা খরচ করে সমষ্টি দেন তাঁদের আর টাকার কী অভাব?

মাঝ-বয়সী একজন সাধু, এই মঠেরই কর্তাব্যক্তি, সুন্দর শক্তিশালী, দেখেছি এ'কে দু-একবার আগে—সোনা-বাঁধানো দাঁত, হাসতেই চিনতে পারলাম; তিনি এসে বললেন, 'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে গিয়ে বোসো; পরে ভিড় বেড়ে গেলে ঢুকতে পারবে না, দেখতেও পাবে না কিছু।'

সাধুটিকে ভালোই লাগত; কথা শুনে সাহস বেড়ে গেল, বললাম, 'এখন তো থাকবার উপায় নেই। খানিক পরে যদি আবার আসি?' মনে পড়ল ছড়িদারের কথা, ঢুকতে যদি না দেয় সে? সাধুকে জানাই মনের ভীতি। সাধু আমাদের নিয়ে চলে এলেন ফটকে; হাত দিয়ে আমাদের দেখিয়ে ছড়িদারকে কী যেন সব বললেন তড়্‌বড়িয়ে। ছড়িদার সম্মতি জ্ঞাপন করতে করতে ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে মুখ চিনে রাখল আমাদের।

সেবাশ্রমে ফিরে এসে গোগ্রাসে গিলে আবার চলে এলাম মঠে। ভোজ শুরু হয় নি এখনো। সবে পরিবেশন চলছে পাতে। শয়ে শয়ে সাধুরা বসে গেছেন এক-এক সারিতে; গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় আওড়াচ্ছেন সমবেত সুরে। খাবার পূর্বে নিয়ম এ'দের এই।

খোলা জায়গা, দলে দলে কাক চিল উড়ছে মাথার উপরে; ছোঁ মারছে অনবরত এদিক-ওদিক হতে। অতিষ্ঠ হয়ে জনকয়েক পরিবেশনকারী পুরিমিঠাইর ঝুড়ি নামিয়ে রেখে ছোটো ছোটো টিনের আয়না এনে ধরল রোদে। সূর্যের আলো ঠিক্‌রে ওঠে আয়নার গায়ে, দেখে চিল কাক পালায় ভয়ে।

বলি, 'বড়দি, এ বড়ো মজার এক ফন্দি তো। ফিরে গিয়ে লাগাব কাজে— ক্রিয়াকর্মে, চড়ুইভাতির উৎসবে।'

গীতার শ্লোক থামতে একজন ঘুরে ঘুরে দেখলেন, সবার পাতে সব কিছু পরিবেশন করা হয়েছে কি না। দেখেশুনে তিনি সংকেত করতেই শিঙা ফুঁকে উঠল, ঘণ্টা বাজল; সঙ্গে সঙ্গে সাধুদের খাওয়া শুরু হল। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিলেন সাধুরা রোদে পিঠ মাথা পুড়িয়ে খাবার সামনে নিয়ে। এত লোকের পরিবেশন করা তো অল্প সময়ের কথা নয়।

এত আগ্রহ নিয়ে কী খান সাধুরা ভাণ্ডারায়! একবার খেয়ে দেখতে ইচ্ছে যায়। শশী মহারাজকে বলেওছিলাম সেদিন। শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন; বললেন, 'ভিক্ষালব্ধ খাবার—আপনারা গৃহী লোক, খেতে যাবেন কেন ওসব? না না, ছি।' অথচ উগ্র কৌতূহল। মন্দিরের উঁচু দাওয়ায় বসে সাধুদের খাওয়া দেখতে দেখতে যুক্তি জোগাই মনে, 'দোষ কী তাতে?'

খাওয়া শেষ হল। শেষ হলেই যে হুড়্‌মুড়্‌ করে উঠে-পড়া তা নয়। একেবারে মিলিটারি ডিসিপ্লিন। খাওয়া শেষ হলেও বসে রইলেন যে যার জায়গায়। আবার সেইরকম করে একজন ঘুরে ঘুরে দেখলেন, সবার খাওয়া শেষ হয়েছে কি না; দেখে, আবার তিনি সংকেত করলেন, আবার শিঙা বাজল, ঘণ্টা পড়ল; একসঙ্গে সাধুরাও

সব উঠে পড়লেন পাত ছেড়ে। দলে দলে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন ফটক দিয়ে। শুক্‌নো-শাক্‌না খাওয়া, খুরির জলেই আঙুল ডুবিয়ে মুখে বুলিয়ে নিয়েছেন খালি পাতে বসে থাকবার কালে। জটাজুট-গেরুয়াধারীদের ভরাট জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল নিমেষে। পড়ে রইল কেবল সারি সারি শালপাতা আর মাটির খুরিগুলি গড়াগড়ি দিতে দিতে।

আমাদের আর তাড়া কী? বসেই থাকি। বলি, দেখি না, আর কী কী হয় না-হয়। নাগা সন্ন্যাসী কিন্তু দেখলাম না ভাণ্ডারায়। বড়দি বললেন, 'শুনেছি, এসব সামাজিক ব্যাপারে নাগারা "নাগা" হয়ে আসতে পারেন না। নিদেন একটা কৌপীন পরতে হয়। তাই চেনা মুশকিল, কে নাগা, কে নয়।'

দুই বৃদ্ধ সাধু ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে উঠে এলেন মন্দিরের চাতালে। মুখোমুখী বসে গল্প জুড়লেন কত কী। বহুদিন পরে দেখা দুজনের, খুশি উপচে পড়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে। একজন বাঙালি, একজন পাঞ্জাবি। একজনের বর্ণ গৌর, একজনের শ্যাম। একজন গিয়েছিলেন উত্তরে তিব্বতে, একজন দক্ষিণে সমুদ্রতটে। দুদিন আগুপিছু এসেছেন হরিদ্বারে ; আজ পুনর্মিলন এই সমষ্টি ভাণ্ডারাতে। তিব্বতের ফেরত যিনি তাঁর গায়ে এখনো মোটা কম্বলের আলখাল্লা হাঁটু অবধি লম্বা, কোমরে পাটের পাকানো দড়ি বাঁধা। আর দক্ষিণ-ফেরত যিনি তাঁর খালি গায়ে একটি গেরুয়া চাদর, পরনে সুতির কাটা কাপড়।

সাধুরা বেশির ভাগ একখানা ধুতি কেটে দুখানা করে ব্যবহার করেন। একটি পরেন, একটি গায়ে জড়ান।

সাধু দুজন নিজের নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত বলতে বলতে তেমনি ভাবেই মুখভরা হাসি নিয়ে উঠে গেলেন। কত কথা! এত অল্পেতে শেষ হয় কি! চলতে চলতে বলবেন পথে।

ছোকরা সাধু এক গড়াগড়ি দিচ্ছিল এক ধারে। এত মণ্ডা খেয়েছে, উঠবার উপায় নেই—বলছে সঙ্গীকে। হিন্দি কথায় বাঙাল টান শুনে বড়দি শুধোন, 'বাড়ি কোথায়?' সে বলে, 'হামারা বাড়ি হোতা, "অমুক" গেরাম মে।'

বড়দি বললেন, 'আঃ কপাল। এ যে তিপ্‌রাই বেটা। দেখ নাই, সেবার ত্রিপুরা যাবার পথে ঐ গ্রামটা বাঁয়ে রেখে ঢুকলাম? সুষির শ্বশুরবাড়িও তো ঐ গ্রামেই।'

ছোকরা সাধুর দিকে ফিরে বড়দি বলেন, 'তা হিন্দি বাত্‌ বোলতা কাঁহে? বাংলাই কও।'

দেশী লোকের মুখে দেশী কথা শুনে সে ভারি খুশি। একগাল হেসে উঠে বসে তাড়াতাড়ি। বলে, 'বামুনের পোলা নু আমি। ছেইলা বেলায়ই বাড়ি ছাড়ছি। মায় কান্দে, বাপে কান্দে ; আর ফিরি নাই দ্যাশে।'

'বড় কাম করচ! তা লেখাপড়া কিছু করছিলা নি? পেটে একটু বিদ্যা ঢুকছিল নি?'

'হ, কেলাস ফোর অবধি তো পড়ছিলামই। কতকটা বিদ্যা শিখছি বৈকি গুরুর কিরপায়। এংরাজি অক্ষরও চিনি কুছ্‌কুছ্‌। বড়ো খুশ লাগল মন্‌মে আপনারার সাথে কথা কইয়্যা। কত্‌দিন থাইক্‌তায়? পর্‌সাদ পাইছন নি?'

মাথা নেড়ে বলি, 'না, কে আর দিল বলো?'

শুনে সে ছুটল লাফে লাফে রান্নাবাড়ির দিকে। বড়দি বলল, 'এ আবার কী ফ্যাসাদ ঘটালে দেখো দেখি। প্রসাদ নিয়ে কি শেষে বিড়ম্বনায় পড়ব? এখানে বসে তো খাওয়া হবে না, সেবাশ্রমেও নিয়ে যাওয়া চলবে না। যদি তাঁরা কেউ দেখে ফেলেন, কী মনে করবেন? ছিঃ।'

বলি, 'ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে দেব তাঁবুতে; বিকেলে যখন যাব হরিদ্বারে, গঙ্গার ঘাটে বসে বসে খাব। কে দেখতে আসবে?'

বলতে না বলতে দেখি, সে পাতার ঠোঙা-ভরা প্রসাদ দু হাতে আঁকড়ে ধরে ছুটে আসছে এ দিকে। দুটো চিল সঙ্গ নিয়েছে মাথার উপরে। তাড়াতাড়ি হাতের খাবার বুকে চেপে উপুড় হয়ে খাবার বাঁচালো। তবু বাগ মানে না চিল। উত্ত্যক্ত সে এবারে গায়ে-জড়ানো কালো কম্বলটার নীচে দু হাত ঢুকিয়ে নিলো।

দেখে নাক সিঁট্‌কে উঠি। রামঃ রামঃ। কত না জানি ধুলো বালি পড়ল খাবারে। একমাত্র কম্বল; যেখানে-সেখানে রাখে, পেতে ঘুমোয়! দরকার নেই অমন প্রসাদে। বলি, 'চলো, ভেগে পড়ি ও আসবার আগে।'

প্রসাদে অশ্রদ্ধা সয় না বড়দির। বলেন, 'প্রসাদ প্রসাদই! ওসব কথা বলতে নেই মুখ ফুটে।'

একগাদা পুরি কচুরি মণ্ডা তরকারি সামনে ধ'রে দেশী লোকদের আপ্যায়ন করল দেশী সাধু হাসিমুখে। বলে, 'তরকারিটা আরো খানিক আনবার ইচ্ছা আছিল, পাতায় ধরল না।'

উচ্ছ্বাসে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে আসে সে। বলে, 'আবার আপনাদের দেখবার সাধ রইল চিত্তে। দেখি, তাঁর কির্‌পা থাকলে এই ভিড়ের থনেও খুইজ্যা বাইর করমু। রইলেন তো আরো কিছুদিন এখানে?'

ব্রহ্মকুণ্ডের পাড়ে দোকানগুলিতে গাদা গাদা রসুই, ডালডা, হ্যাম, বেকন, মাখন, জেলির খালি টিন, মুখ বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে দোকানি। ঠুংঠাং টিন পিটিয়েই চলেছে অনবরত সে মাঝখানে বসে। যাত্রীরা সস্তায় এই টিন কিনে ইচ্ছেমতো কম বেশি জল ভরে নিয়ে যায় নিজের দেশে। উছ্‌লে পড়বার ভয় নেই। দোকানির সঙ্গে চুক্তি বাঁধা থাকে—জল নিয়ে পাড়ে উঠে এলেই ঝালাই দিয়ে টিনের মুখ বন্ধ করে দেয়। একেবারে দেশে ফিরে গিয়ে কেটে খুলতে হয়।

বড়দি বললেন, 'অনেক জল নিতে হবে আমাদের; জনে-জনের গঙ্গাজলিতে এখান থেকে জল না ভ'রে এইরকম দুটো টিনে জল ভরে নেওয়াই তো সুবিধের। পরে এ থেকেই ঢেলে ঢেলে দিতে পারব সবাইকে।'

বেছে বেছে পাঁচ-সেরি ডালডার দুটো খালি টিন কেনেন তিনি। ফুটোফাটা নেই তো টিনে? না যাচাই করে পয়সা দেওয়া কি ঠিক? ব্রজরমণকে পাঠানো হয় ঘাটে, টিন হাতে দিয়ে, জল ভরে দেখতে। এক মিনিট, দু মিনিট করে পনেরো মিনিট হয়ে কুড়ি মিনিট হল; ব্রজরমণ ফিরে আসে না। ঐ তো ঘাট, ঐ জল; এত সময় লাগে কিসে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তি জাগে। আধ ঘণ্টা উত্‌রে যায়; দোকানে বড়দিকে রেখে আমি দাদা এগিয়ে যাই।

জমাট ভিড় ঘাটে। পাড়ে দাঁড়িয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে একমনে। ভিড়ের কাঁধ ডিঙিয়ে উঁকি মারি আমিও গিয়ে। বাঁধানো ঘাট সিঁড়ি ধরে নেমে গেছে নীচে। জলের কাছাকাছি চওড়া সিঁড়িটাতে দাঁড়িয়ে নাগা সন্ন্যাসী এক, খেলা দেখাচ্ছে ঝকঝকে লম্বা বর্শা হাতে নিয়ে। প্রথমে ঠাহর হয় নি। পরে বুঝতে পারি, এ যেমন আশ্চর্যের, তেমনি বীভৎস, অশ্লীল। অথচ খোলা ঘাটে জনসমক্ষে নিঃসংকোচে হেলাভরে দেখাচ্ছে একজন, আর উদগ্রীব হয়ে দেখছে দর্শকরা পাশাপাশি বউ-ঝি নিয়ে।

দাদা ডাকলেন, 'চলে এসো। হঠযোগের ব্যাপার ওসব।'

কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই। বড়দিকে দেখাতে হবে। টানতে টানতে নিয়ে আসি তাঁকে। কসরৎ শেষ হয়ে যায় ততক্ষণে।

নাগা এবার গঙ্গাজলে হাত মুখ ধোয়। রুদ্রাক্ষের মালার গোছা পৈতের মতো গলার দু দিকে ঝুলিয়ে দেয়। কোমরে একগাছি সাদা সুতো বাঁধে। ডান হাতে তাগা পরে; আলো লেগে গোল চাক্‌তি চিক্ চিক্ করে ওঠে। সোনার নাকি ওটা? সাজ হয়ে যেতে বর্শা হাতে নিয়ে এবার নাগা ঘুরে দাঁড়ায়, বীরদর্পে এক-একটা সিঁড়িতে পা দেয়। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে সসম্মানে পথ ছেড়ে দেয়।

গঙ্গার আরতি হবে এখনি। হরকি পৌড়ীতে এসে বসি। সামনাসামনি দেখতে পাব ভালো।

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসতে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে আরতির প্রদীপ জ্বলে ওঠে। তিন পাণ্ডা তিন হাতে তিন প্রদীপ নিয়ে নেমে আসে নীচে, দাঁড়ায় শেষ সিঁড়ি-টার উপর। ধীরে ধীরে বাঁ হাতে ঘণ্টা বেজে ওঠে, ডান হাতে আরতি শুরু হয়। ঘিয়ের প্রদীপ; হাওয়া লেগে জ্বলতে থাকে উঁচু হয়ে। সেই আলো ঢেকে দেয় তিন পাণ্ডার মাথা গা, কালো ছায়া ফেলে। এপার হতে দেখি, কেবল আলোর শিখার তিনটি চূড়া যেন উল্লাসে অস্থির, শূন্যে অন্ধকারের বুকে।

বড়দি কোন্ ফাঁকে অন্তর্ধান করেছিলেন, হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। দু হাতের দু মুঠ বন্ধ। বললেন, 'আরতির অগ্নি স্পর্শ করে এলাম। তোমাদের জন্যও এনেছি, এই নাও।' বলে এক মুঠ খুলে আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন, আর মুঠের আরতির অগ্নি দাদার কপালে ছোঁয়ালেন।

কাল শিবরাত্রি। যোগের প্রথম স্নান।

বড়দি বললেন, 'শিবের মাথায় ফল ফুল দেব, কিছু ফল কিনে রাখতে হবে আজ। ফুল না-হয় পথের দুধারে পাব কিনতে, ফল যদি না পাই ভিড়ের মাঝে?'

গঙ্গার বুকের উপরের বাঁধানো চাতাল দিয়ে চলতে থাকি বাজারের দিকে। হরিদ্বারের প্রাণ বলতে যা তা এই চাতালেই। হরেক রকম ব্যাপার চলছে এই জায়গাটুকুতে। চলতে চলতে দেখতে পাই, শ্রীরামচন্দ্রের ছবির সামনে মারোয়াড়ি মহিলা গান গাইছেন হারমোনিয়ম বাজিয়ে এক হাত ঘোমটা টেনে, ঘোমটায় ঢাকা

ভক্তের দল সামনে নিয়ে।

তার পাশেই চলেছে গুজরাটি ভদ্রলোকের বক্তৃতা— পাপপুণ্যের বিচার চিরে।

আটার গুলি থালায় ভরে ঘুরছে বুড়িটা— পাকা ভুরু কুঁচ্‌কে, ছোটো ছেলে-গুলোর দলে ভিড়ে। মুঠো-ভরা আটার গুলি গুঁজে দেয় যাত্রীর হাতে— 'লিজিয়ে বাবু, দো পয়সাকা গুল্লি মছ্‌লিকো খিলাকে পুন্যি করিয়ে।'

ঋষিকুলের গুরুকুলের বালক-ব্রহ্মচারীর দল নামাবলী গায়ে কান-ঢাকা টুপি মাথায় দিয়ে সারি বেঁধে বসে ঘাটে। সামবেদ গান গায় তালে তালে হাত নেড়ে। বিকেল হতেই এসে ব'সে থাকে কুশাসন পেতে, লাল রঙের জপের থলি হাতে নিয়ে। ওঠবার উপায় নেই। শিশু মন, কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চার দিক। নানা দেশের তীর্থযাত্রী নানা কৌতূহলের উদ্রেক করে। থলির ভিতরে ব্রহ্মচারীদের ছোটো হাতের ছোট্ট আঙুলগুলি মালা টপ্‌কাতে গিয়ে থেমে যায়। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ড্যাব্‌ডেবে চোখ মেলে।

ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়া ভিখিরি চেঁচায় হাত পেতে, 'সওয়া পাঁচ আনা বিলা দে, সোহাগ ভাগ বনা লে।' নিলাম চলে এক পাশে। ভিড় ঠেলে ওঠে কালো বাব্‌রি চুলের মাথা। কালো কোট গায়ে, কালো টিনের বাক্স হাতে, টুলের উপর দাঁড়িয়ে সে হাঁকে 'চার আনা, পাঁচ আনা, সওয়া পাঁচ আনা। জল্‌দি জল্‌দি, আভি খতম্‌ হো যায়গা— ছয় আনা।'

আলুর বড়া ভাজে দোকানি, লোহার তাওয়া লোহার আংটায় বসিয়ে গরম গরম।

দইবড়া, ঘুগ্‌নি, ফুলুরি কিনে খায় পাঞ্জাবি মেয়ের দল নেটের উড়নি মাটিতে লুটিয়ে।

দাক্ষিণী সাধু বসেছেন গঙ্গার গা ঘেঁষে দু চোখ বুজে। কথকতা করেন ব্রাহ্মণ রক্তচন্দনের তিলক কেটে।

গান চলে লাউডস্পীকারে— 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে'। সিনেমার বিজ্ঞাপন চলেছে সারি সারি, বুকে পিঠে কাঠের বোর্ড এঁটে— 'ঘরকে ইজ্জত', 'চাঁদনি রাত', 'দিলাক পিয়ারী'।

ইঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্‌টর ছুটোছুটি করে, কুলিমজুর নিয়ে। বড়ো বড়ো গাছ এনে জড়ো করেছে গাদা গাদা। গজাল ঠুকে আটকায় একটার গায়ে একটা। সময় বেশি নেই, পুল শেষ করে দিতে হবে কুম্ভের আগে।

গেরুয়াধারী সাধু পিছু নেয়— 'ভজনকে লিয়ে একঠো গীতা সাধুকো দান কিজিয়ে ; দো পয়সা দাম, এহি দুকান মে মিলেগা।'

নাপিতের দল বসে আছে পর পর, গরম জলের কুকার নিয়ে। আট ইঞ্চি উঁচু ছোট্ট পিতলের কুকার, উপরে গরম জল, নীচে জ্বলে ধিকি ধিকি খানকয়েক কাঠ-কয়লা। অনেকক্ষণ অবধি গরম থাকে জলটুকু। শীতের হাওয়ায় আরাম দেয় গালে গরম জলের প্রলেপ।

মিলের শাড়ি, ছিটের কাপড়ের দর-কষাকষি চলে দোকানে খদ্দেরের সঙ্গে।

ওজন-যন্ত্র সামনে নিয়ে বাপ-বেটা চোঙা ফোঁকে, 'চার পয়সা দেকে ওজন আউর বেমারি-উমারি সব দেখ্‌ লেও একসাথ।' যন্ত্রের উপরে ওজন অনুযায়ী অসুখের নামধাম লেখা। কত বয়সে কত ওজন না হ'লে কী অসুখ আছে তার, বলে

দেয় সে গড়্ গড়্ করে। পিলে, বাত থেকে আরম্ভ করে কালাজ্বর, হাঁপানি, মায় যক্ষ্মা পর্যন্ত।

মোটা মোটা আটার রুটি হাতে টিপে সেঁকছে আগুনে, ময়লা শাড়ি পরে, রুক্ষ মাথা নিয়ে, জীর্ণ প্রৌঢ়া সামনে দু পা মেলে। ভিখিরিরা আসে, পয়সা ফেলে কিনে খায় রুটি পাশে বসে, দু টুক্‌রো আলুর তরকারি, তেঁতুলের চাটনি দিয়ে।

চা'ও মেলে। পিতলের কলসী থেকে ঢেলে দেয় ছোটো ছোটো কাঁচের গ্লাস ভরে জোয়ানমর্দ ছেলে। ঘাড়ে করে বেড়ায় সে চাতালের এ-মাথা ও-মাথা, সুবিধে-মতো নামিয়ে বিক্রি করে এখানে ওখানে। চার পয়সায় 'গুড়কা চা', ছ পয়সায় 'চিনিকা'।

বেনারসি ওড়না দুলিয়ে হিল ঠুকে চলে বেসুরো মেয়ের দল রুজ পাউডার লিপ্‌স্টিক মেখে।

বেলুন বাঁশি—লম্বা মোটা গোল রঙ-বেরঙ—মাথার উপর দুলিয়ে চলে ছেলে, লম্বা লাঠির ডগায় বেঁধে।

অন্ধ ভিখিরি খ্যানর-খ্যান্ করতাল বাজায় গায়ের জোরে। নজর টানে যাত্রীদের।

চার পয়সায় ব্রাহ্মণভোজনের পুণ্য লাভ হয় সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার দোকানে।

ঝুমুর-ঝুম্ চিম্‌টে ঘুঙুর বাজিয়ে কালো দড়িতে বুকপিঠ বেঁধে সারি দিয়ে চলে অলখ-নিরঞ্জনের দল। কথা বলবে না, থামবেও না কোথাও। চলতে চলতে ভিক্ষে নেবে। গৃহস্থ আগে হতে তৈরি থাকে ভিক্ষে নিয়ে। সারা গায়ে তাই বাজনা বাজিয়ে চলে তারা। দূর হতে সংকেত জানায় দাতাদের। দোকানির হাতে ভিক্ষে নিতে দেরি হয়ে যায়, অলখ-নিরঞ্জন 'লেফ্‌ট্ রাইট' করতে থাকে খর্পর বাড়িয়ে একই জায়গায়। পা নাড়ানো চাই। মাঝের ভিক্ষু অন্যমনস্ক হয়ে থেমে যেতেই চিমটার খোঁচা খায় পিছনের জনের কাছ হতে; ইশারা করে, পা নাড়াও। এত লোক চার দিকে, কে কখন দেখে ফেলবে।

গ্রন্থসাহেবে ভিড় জমে এক এক করে।

ফুলের ডালা সাজিয়ে রাখে ঘিয়ের বাতি মাঝে বসিয়ে ফুলগুলি সারে সারে।

ফলের দোকানে এসে দাঁড়াই ফল কিনতে।

তৃপ্তি আর হয় না বড়দির। বেল নারকেল কুল নাসপাতি আপেল বেদানা—'ও কেয়া হ্যায়? টেঁপারি? হাঁ, দেও।' কলা কমলা—'উপরমে ও খরমুজা হ্যায়? নামিয়ে দাও তো। পেঁপে— কেয়া বোল্‌তা ইস্‌কো? হাঁ, ও ভি লাগে গা।' বলেন, 'কী বলো রানী—নিয়ে যাই? দিই শিবের মাথায়। আবার কবে আসি না আসি! এখানকার শিবকে তো আর নাও পেতে পারি জীবনে।'

দোকানের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত থাকে থাকে সাজানো ফল, বেছে বেছে কিনে থলি ভরতে থাকেন তিনি। পাশে সবজির দোকান।

সাদা ওড়নায় গা মাথা ঢেকে, সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবি শালোয়ার পরে, ছিপ্‌ছিপে ছেলেমানুষ বউ দরাদরি করছে দোকানির সঙ্গে। হাতে কমলের মূল। শুনেছিলাম, কোনো কোনো দেশে এই কমলের মূল অতি প্রিয় খাদ্য।

শুধোই, 'এগুলি খেতে কেমন?'

জিবে একটা রসালো শব্দ টেনে সে বললে, 'বহুত আচ্ছা লাগতা। দেখো না এইটুকু জিনিসের কত দাম তাই। পোয়া বলে পাঁচ আনা।'

বলি, 'রান্না কর কী করে?'

কমলের মূলটার গায়ে আঙুল দিয়ে ভাগ ভাগ মাপ দেখাতে দেখাতে বললে, 'এই তো, এটাকে ধরো এক, দুই, তিন—পাঁচ টুকরো করা হবে। ছোটো করেও কাটে অনেকে। কিন্তু বড়ো টুকরোই খেতে ভালো। তার পর পেঁয়াজ ভেজে, জিরে মরিচ নুন হলুদ দিয়ে রান্না করব। আলুও দিতে পারা যায়। কিন্তু দেখো কী মাগ্‌গি! নেব কি না ভাবছি।—এ ভাইয়া, দিজিয়ে না এক পোয়া সওয়া চার আনামে? সাড়ে চার আনা? আচ্ছা, তব্ পৌনে পাঁচ আনা লে লিজিয়ে—আউর জাদা নেহি।'

ব'লে, পাঞ্জাবির পকেট হতে পাঁচ টাকার নোট বের করে এক পোয়া কমলের মূল কিনে বাকি পয়সা গুনেগে'থে নিয়ে চলে গেল বউটি।

'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥'

মুখে গীতা আওড়ে ঠাণ্ডা হাতের ঠেলা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দেন বড়দি, রাত না পোহাতে।

আজ যোগের প্রথম স্নান। আগে হতেই ঠিক ছিল, অন্ধকার থাকতে উঠে চলে যাব ব্রহ্মকুণ্ডে। ভোর পাঁচটা থেকে যোগ, থাকবে দিনভর। এতখানি সময় পাওয়া যায় না বড়ো। তবু ঘাটে গিয়ে নির্বিঘ্নে স্নান করে আসা, এ অতি আশঙ্কার কথা।

আজ সারা দিনই সাধুদের স্নান চলবে; ঘাট তাদের জন্যই খালি করে রাখবে পুলিস। স্বামী অনুভবানন্দ বলছিলেন, 'সকালেই যা সুবিধে। পরে আর ঘাটে নাও ঢুকতে পারেন। তার চেয়ে বরং আগেভাগে স্নান সেরে তৈরি থাকুন। শোভা-যাত্রা করে যাবে সাধুসন্ন্যাসীর দল, দেখবেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। এও তো দেখবার জিনিস বিশেষ রকমে। এগারোটায় যাবে "নিরঞ্জনী আখড়া"; তারা ফিরে এলে যাবে "নির্বাণী আখড়া"—তা প্রায় বেলা একটা-দেড়টা হবে। আমাদের দল যাবে নির্বাণী আখড়ার সঙ্গেই। নির্বাণী স্নানের পর যাবে "জুনা আখড়া"। ততক্ষণে সন্ধ্যা উৎরাবে। তাই বলি, ফাঁক কোথায়? আর ভিড়ও যা হবে—সে ভিড়ে পারবেন না স্নান করতে। শেষে কোথায় ছিটকে পড়বেন—সে এক কাণ্ড হবে তখন।'

বড়দির ইচ্ছে, সাধুদের স্নানের পরে আর-একবার ডুব দেন পবিত্র গঙ্গায়। শুনে শশী মহারাজ বলেন দাদাকে, 'মেয়েদের কথা শুনবেন না। অমন কাজও করবেন না। গঙ্গার জল সদা পবিত্র, সুবিধে পেলেই স্নান করে নেবেন। ভিড়ের কথা আপনারা কল্পনায়ও আনতে পারেন না, তাই এসব কথা বলেন। আমার কথাই বলি। একবার প্রসেশনে স্নান করতে গেছি, ঘাটের কাছে গিয়ে এমন আটকে গেলাম যে, কেবলমাত্র ঘাটে নেমে স্নান করে উঠে আসতে আমার সাড়ে-তিন-ঘণ্টা

সময় লেগে গেল।'

বড়দি আমায় তাড়া দিলেন, বললেন, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হও। এই স্নানের জন্যই আসা আমাদের এখানে। "ঠাকুর ঠাকুর" করে একটা ডুব দিয়ে উঠতে পারলেই শান্তি। গায়ের কাপড় হাল্কা করে নাও। যত পার কম কাপড়ে চলো, যেন ঝট্ করে ভিজে কাপড় বদলে ফেলতে পার।'

উঠে দেখি, বড়দি এরই মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন কুয়োর জলে। কখন অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বাইরে গেছেন টের পাই নি মোটে। বললেন, 'এমন দিনে গঙ্গায় নামব—শুদ্ধ হয়ে নিলাম আগে একবার।' ব'লে কমণ্ডলু হতে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন আমরা যারা স্নান করি নি—আমাদের গায়ে। শুদ্ধ করে নিলেন আমাদেরও।

পথে আসতে ভেবেছিলাম, আমরাই চালাক, আগে আগে চলেছি ; হাত পা নেড়ে স্নান করব বিনা ঝঞ্ঝাটে। ঘাটে এসে দেখি, আমাদের চেয়েও চালাক যারা তারা ভিড় জমিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে।

এ ক'দিনের চেনা ঘাটগুলি এগিয়ে এসে নিয়ে যায় ভিড় ঠেলে। শীতের প্রকোপ, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি ; কাত হয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে শরীর এগিয়ে দিতে দিতে গিয়ে জলে পড়ি। গুনে গুনে কটা ডুব দিই। মার জন্যে ঘড়া ভরে যোগের জল তুলে নিয়ে উঠে আসি।

বড়দি বুক-জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ছেন, আর চোখ বুজে জনে-জনের নামে অঞ্জলি ভরে ফুল ফল পয়সা গঙ্গায় নিবেদন করছেন। সেবাওলির বড়ো ফুর্তি ; বড়দির অর্ঘ্য জলে পড়বার আগেই দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে সে সব লুফে নিয়ে কোঁচড়ে ভরছে।

মনে হল বড়দিকে নাড়া দিয়ে বলি, দেখো চোখ মেলে কাকে কী দিচ্ছ এত কষ্ট করে। পরেই ভাবলাম, বুদ্ধিমতী তিনি, হয়তো বা দেখেশুনেই দু চোখ বুজে ফেলেছেন। বলেন তো এমনিতে প্রায়ই, 'নাম করে দিলাম তাতেই মনের তৃপ্তি। তার পর তা কে নিল, কী হল, কেন মিথ্যে ভাবতে যাওয়া?'

ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝখানে মোটা একটা স্তম্ভের মাথায় গঙ্গাদেবীর মন্দির। অনেকে সাঁতরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে। এটা নাকি আসলে মানসিংহের ভস্মস্তম্ভ। আকবর মানসিংহকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার জন্য এত করলে—আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?'

মানসিংহ বললেন, 'আমার মৃত্যুর পরে ব্রহ্মকুণ্ডে অস্থিভস্ম বিসর্জন দিলে পর তার উপরে যেন স্মৃতিস্তম্ভ গেঁথে দেন।'

ব্রহ্মকুণ্ডে অস্থিভস্ম ফেললে সেই আত্মার আর বন্ধন ঘটে না, এই সকলের বিশ্বাস।

শ্যামাপদ সংসার-ত্যাগী, যোগী। উল্টোপাল্টা কথা কন—মনের কথা ধরতে পারা যায় না সহজে। তিনি বলেন, 'ব্রহ্মকুণ্ডে সাঁতরে স্নান করি কি সাধে? মড়ার হাড়ে গিজ্গিজ্ করে তলা, দাঁড়ালেই পায়ে ফোটে।'

ঘাটে সিঁড়ির উপরে, সিঁড়ির মাঝে, সিঁড়ির নীচে দেবদেবীর ছড়াছড়ি। গঙ্গামাঈ, শিবশম্ভু, রামচন্দ্র, বীর হনুমান, কলকাত্তাকি কালী, পুরাতন কেদারবদরী,

সীতাজি, কত কী মূর্তি— খুপরি-খাপরি ঘরে এক-একজন। দুই কমণ্ডলু ভরা দুধ গঙ্গাজল সবার মাথায়ই একটু একটু করে ঢেলে বেড়াতে লাগলেন বড়দি। বললেন, 'ধরো, তুমিও দাও। ঐ "শিবায় নমঃ" "শিবায় নমঃ" বলে দিলেই হবে সবাইকে।'

সাধুদের স্নানে আসতে এখনো কিছু সময় বাকি। ভিজে কাপড়ের বোঁচকা হাতে নিয়ে ঘুরতে বড়ো অসুবিধে। বলি, 'একবার কন্‌খলে ফিরে গিয়ে গঙ্গা-জলের ঘড়া, ভিজে কাপড়ের বোঝা, এসব রেখে দিয়ে এলে হয় না? বেশ ঝাড়া হাত-পায়ে থাকা যাবে সারা দিন?'

'মন্দ কথা নয়,' দাদা বললেন, 'সেই তো ভালো। দুপুরের খাবারের ভাবনা নেই কোনো। কালই বলে দিয়েছি স্বামীজিদের যে, দুপুরে আজ খাব না আমরা। কখন ফিরতে পারি কি না-পারি ঠিক কী? মিছে কেন তাঁদের বসিয়ে রাখব। তাঁরাও তো আসতে চান স্নান করতে। আমাদের সেই চায়ের দোকানটা তো বেশ পরিষ্কার; খিদে পেলে খেয়ে নেব সেখানেই।'

বড়দির আজ শিবরাত্রির উপোস। বলি, 'আমিও উপোস করব এইসঙ্গে; করি নি তো কখনো।' মনে ভাবলাম, যা দেখছি, খাওয়া তো হবেই না আজ এমনিতে, বরং শিবের নামে থাকলে হয়তো-বা কিছু কাজ দিতেও পারে।

কন্‌খল থেকে হরিদ্বারে ফিরে আসতে পথ আর সেই আগের পথ নেই। শহরের কোন্ প্রান্তে শুরু হয়েছে স্নানের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা— খবর রটেছে দিগ্‌বিদিকে। ঘন ঘন হুইস্‌ল্ বাজছে পুলিসের মুখে। সার্জেণ্ট ছুটছে সাইকেলে চেপে। চওড়া রাস্তা একেবারে খালি। জনপ্রাণীর হাঁটা নিষেধ পথে। গলি ঘুপচি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ছুটি ঘাটের দিকে। একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয় হরকি পৌড়ীতে এঁরা আসবার আগে। কিন্তু ইচ্ছেমতো কি আর এগোনো যায়। ভিড়ের ঠেলায় ঠেলে আনে যতখানি ততখানিই এগোয়। এমনি করে করে ঘাটে এসে তো পৌঁছই একসময়ে, কিন্তু হরকি পৌড়ীতে যাই কী করে? বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে ঘাট, পুলিস ভলেণ্টিয়ার গায়ে গায়ে মোতায়েন। লাঠি বাগিয়ে ঠেলে হটিয়ে দিচ্ছে জনতার স্রোতকে উল্টোমুখে। এক ইঞ্চিও এগোবার আর উপায় নেই। হায় রে, কেন গিয়েছিলাম কন্‌খলে ফিরে। হাত ব্যথা হলে কাপড়ের বোঝা না হয় ঘাড়ে নিয়েই চলতাম, সেই তো ছিল ভালো। এখন যে সব দিকই মাটি। আচ্ছা, চলো তো দেখি ঐ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে পারি কি না। ঐ তো দলে দলে অনেকেই তো যাচ্ছে ঐ পথে। ওদিকটা খোলা থাকতে পারে।

সিঁড়ি ভেঙে সরু গলি দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে ডাইনে রেখে ছুটে যাই; গিয়ে দেখি— 'রাস্তা বন্ধ্'। ওখান থেকে কলকাত্তাকি কালী ডিঙিয়ে আর-এক দিকে ঘুরে আসি— 'রাস্তা বন্ধ্'। পুরাতন কেদারবদরী প্রদক্ষিণ করে ফালি পথটুকুতে ঢুকি— 'রাস্তা বন্ধ্'। দিক্‌শূন্য হয়ে ছুটে ছুটে যেখান দিয়েই ঘাটে ঢুকতে যাই— 'রাস্তা বন্ধ্'। সময় আর বেশি নেই। শোভাযাত্রা নাকি এগিয়ে আসছে। পাগলের মতো ছুটছে সবাই, স্নান দেখবার জন্যে জায়গা নিয়ে দাঁড়াতে চায়। এদিককার ভিড় 'রাস্তা বন্ধ্' দেখে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে, ওদিককার ভিড় পথ না

পেয়ে এদিকে ছুটে আসছে। সবাই ভাবে, অপর দিকে খোলা পথ পাবে। এই আসা-যাওয়ার কী এক প্রাণান্তকর ধাক্কাধাক্কি সারা তল্লাট জুড়ে।

মরিয়া হয়ে ভালোমানুষ-মুখ এক পুলিসকে গিয়ে 'ভাইজি' 'ভাইজি' বলে ধরে পড়লাম। বললাম, 'একবার একটুখানির জন্য পথ ছেড়ে দাও, ভিতরে ঢুকি।'

ভাইজি গম্ভীর হয়ে থাকে, ঘাড় নাড়ে ; রাজি হয় না কিছুতে। দায়ে পড়েছি, কী করি! থেকে থেকে কেবলই 'এ ভাইজি' 'এ ভাইজি' ডাকি, আর করুণনয়নে ঘাটের দিকে তাকাই। এত আশা, এত শখ, সাধুদের স্নান দেখব—এ কী হল। কিছুই তো দেখতে পাব না এভাবে থাকলে। আবার বলি, 'এ ভাইজি—'। এবার কী জানি কী মনে হল ভাইজির, এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে, কেউ দেখছে কি না দেখে, আঙুল নেড়ে ইশারা করে বললে—জলদি আইয়ে। বলেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল, যেন বড়োই অন্যমনস্ক।

এক লাফে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ি ভিতরে। টেনে বড়দিকে ঢোকাই, দাদাকে ঢোকাই। পুলিস হৈ হৈ করে তেড়ে আসে। বলি, 'এ মেরি বহিন হ্যায়, ভাই হ্যায়।' ব্রজরমণও বাদ পড়েন না। মুহূর্তে বেড়া গলিয়ে চলে আসি চারজন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি এতক্ষণে এবার আর তাড়া কী? আস্তে ধীরে গিয়ে বসি হরকি পৌড়ীতে, একেবারে সামনের সারিতে। এখন যতক্ষণ সময় লাগে লাগুক সাধুদের এসে পৌঁছতে ঘাটে।

লোকে লোকারণ্য চার দিক। ঘাটের উপরে, বাড়ির ছাদে, পাহাড়ের গায়ে, গাছের ডালে—যে দিকে তাকাই, লোকের মাথা রঙিন ঘোমটা গিজ্ গিজ্ করে। কখন হতে বসে আছে অপেক্ষায় সব। হাতঘড়িতে সময় দেখি, আর কত দেরি। সময় কাটাতে স্কেচ-খাতা কোলে খুলে বসি। বড়ো হয়রান লাগছে, তার উপর সকাল হতে না-খাওয়া ; কথা বলতে শক্তি নেই। চুপচাপ খাতার পাতায় পেন্সিলের আঁচড় কাটতে কাটতে কেবলই মনে প্রশ্ন জাগে—এত লোকের এই-যে মিলিত বিশ্বাস, কিছুই কি মূল্য নেই এর? এক বিশ্বাসে জড়ো হয় এই-যে লক্ষ লক্ষ লোক—এর ভিত্তি কি একেবারেই ভুয়ো? সাধারণে বিচার করে কোন্ দিক দিয়ে? গঙ্গাজলে পাপ ধুয়ে যায়, শুনে তারা হাসে। গঙ্গাজলের যে কী মাহাত্ম্য, এ তর্ক আর আসে না মনে এ দৃশ্য দেখলে।

'আপনারা কি আনন্দময়ী-মার ওখান থেকে এসেছেন?' ঘাড়ের কাছে মুখ বাড়িয়ে পিছন হতে বললেন এক মহিলা।

খাতার পাতায় দৃষ্টি রেখেই ঘাড় নাড়ি—না।

'তবে কোন্ মার কাছ থেকে?'

দূর ছাই, কথা বলতে ভালো লাগছে না, তবু ঘ্যান্ ঘ্যান্। পাশে বড়দি গভীর ধ্যানে মগ্ন। নামে ভাবে অমিল নেই। চট্ করে তাঁর নাম বলে দি, 'হিরন্ময়ী-মা।'

যাঃ, পেন্সিলের মুখটা ভেঙে গেল। সঙ্গে ব্লেড ছুরি নেই। নখ দিয়ে কাঠ খুঁটতে থাকি, একটু শিষ বের করতে পারলেই হয়। ভাবি, সাধু দেখলেই হেলাফেলা করি, সাধুভক্ত কাউকে দেখলে ঠাট্টা জুড়ি, নিজেকে তুলনায় বুদ্ধিমান ঠাওরাই। আর যত কি বোকার দল এই সাধুরাই? মহা মহা পণ্ডিত, মহা ধনীর

সন্তান কত কত যে এর মধ্যে ছাই মেখে জটা ঝুলিয়ে বসে আছেন শীত গ্রীষ্ম তুচ্ছ করে, আহার নিদ্রা ভুলে উন্মুক্ত আকাশের তলে—তাঁরা কি এমনই নির্বোধ? কিসের আশায় তাঁদের এই কৃচ্ছ্রসাধন? কোন্ দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় এমন উন্মুখ হয়ে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে আনলেন নিজেকে নিজে?

'আপনাদের আশ্রম কোথায়?'

কী জ্বালা! এক কথায় উত্তর সারি—'আসামে।' মৌনব্রত কত সুবিধের। সাধে কি সাধুরা কথায় কথায় মৌনীবাবা হয়ে থাকেন? ধনঞ্জয় দাস—সন্তদাস বাবাজির শিষ্য, তিনি 'মৌন' নিয়েছেন। কবে ভাঙবেন জানেন না। দরকারমতো স্লেটে দু-চার কথা লিখে দেন শিষ্যদের। এই ধনঞ্জয় দাসও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। অথচ মাথা-জোড়া জটের খোঁপা নিয়ে যখন বসে থাকেন—অচেনা লোক কী বুঝবে তাঁর। সন্তদাস বাবাজিও তো কত জ্ঞানী গুণী ধনী লোক ছিলেন। বড়দির কাছে গল্প শুনি, আগে তাঁর নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী—বিখ্যাত উকিল।

'আচ্ছা, আসামে কোথায় আপনাদের আশ্রম? কামাখ্যায়?'

না, আর পারি না। কী উত্তর দিই এবার? কামাখ্যার নাম যখন করলেন ভদ্রমহিলা, তবে হয়তো জানেন আসাম সম্বন্ধে কিছু কিছু। বাজে কথার বড়ো জ্বালা। শেষরক্ষা করা দায়। তাড়াতাড়ি বলে ফেলি—'অরুণাচল আশ্রম।' এই নামে একটা পাহাড় আছে বটে শিলচরের কাছে। ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল।

বড়দি দেখি শঙ্কিত কম্পিত দৃষ্টি মেলে একবার আমার দিকে তাকিয়েই ফের দু চোখ বুজে আত্মস্থ হলেন। হিরণ্ময়ী-মার রূপে এতে আরো জেল্লা ফুটল। দেখে আশান্বিত হই।

দুম্‌দাম শব্দে ঢাক ঢোল ব্যান্ড বাঁশি কানে আসতেই সজাগ হয়ে বসি। দেখতে দেখতে দুদ্দাড় করে শোভাযাত্রা এসে ঘাটে পৌঁছল। শয়ে শয়ে সাধুসন্ন্যাসী, ছাই-মাখা গা; গেরুয়াতে ঘাট, ঘাটের সিঁড়ি ভরে গেল।

নাগা সন্ন্যাসীর দল সকলের আগে জলের কাছে এগিয়ে দাঁড়াল পর পর সার বেঁধে। তাঁদের পিছনে অন্য সাধুর দল গ্যালারির মতো ভরে রইল উপরে-উঠে-যাওয়া সিঁড়ি পর্যন্ত। মণ্ডলেশ্বরদের মাথায় ফুলের মালা জড়ানো জরিজরার রঙিন ছত্র, দু পাশে চামর, পিছনে ঝল্‌মলে পাখা—দুই মর্দ ধরে থাকে ডাণ্ডা। দূর থেকে চেনা যায় চিহ্ন দেখে, কয় মণ্ডলেশ্বর এলেন স্নানে। আর সাধুদের সকলেরই গলায় গাঁদাফুলের মালা।

নাগার দল আগে দাঁড়িয়ে। তাঁরা পট্ পট্ গলার মালা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জলে। এত মালা—ব্রহ্মকুণ্ডের জলটুকু ছেয়ে গেল ছেঁড়া মালার হলুদ ফুলে। দুলছে নড়ছে ফুলগুলি জলের উপর স্রোতের তালে। কী অপরূপ শোভা কুণ্ডের!

সাধুরা দাঁড়িয়েই রইলেন। জলে নামছেন না কেন? যেন কিসের অপেক্ষায় আছেন। ভেবেছিলাম তাঁরা এসেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন—হুড়োহুড়ি, তাল-গোল পাকিয়ে যাবে। তা তো নয়। বিশেষ একটা নিয়মে বাঁধা যেন সব কিছু। বড়ো সুন্দর।

খানিক বাদে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন একজন, ছোট্ট একটি রুপোর সিংহাসন

হাতে নিয়ে। তিনি জলে নেমে সিংহাসন ডুবিয়ে তুলতেই লম্বা ডাণ্ডার মাথায় বাঁধা দুটো ঝাণ্ডা জলে ফেলা হল, সঙ্গে সঙ্গে শিঙা বেজে উঠল। সাধুরা 'জয় জয়, গঙ্গামাঈকি জয়' বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

গেরুয়াধারীরা উঠে কৌপীন বদলালেন, বুকে পিঠে গাত্তা বাঁধলেন ; মণ্ডলেশ্বররা পুরো সাজ করলেন চেলা-শিষ্যদের সাহায্য নিয়ে, আর নাগার দল ভিজে গায়ে কাঁপতে কাঁপতে মুঠো মুঠো ছাই ঘষলেন সর্ব অঙ্গে। জলগায়ে শুকনো ছাই আট্‌কে রইল আঠার মতো। দূর থেকে দেখছি, জল শুকিয়ে সাদা ছাই ফুটে উঠছে কালো অঙ্গের এখানে ওখানে। একটু বাদেই সাদা মহেশ্বর বনে যাবেন এক-একজন। কেউ কেউ জটার মধ্যেও ছাই ছড়ালেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বোধ হয় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নেবার ইচ্ছে। কেউ আবার একে অন্যের পিঠ লেপে দিলেন ছাই দিয়ে। কেমন বেশ মিলমিশ ভাব। এমন ভালো লাগে এ'দের দেখতে। সত্যিই যেন বোম্‌ভোলা সদাশিবের দল। কিছুরই প্রয়োজন নেই এ জগতে। ভুলেছে নিজেকে, ভুলেছে অন্যকে—লাজলজ্জার সীমানার বাইরে। এই তো, বাড়ির পাশে নির্বাণী আখড়া ; ফাঁক পেলেই যাই সেখানে। আঙিনার মাঝে বটগাছের তলায় ছাই বিছিয়ে শয্যারচনা করে আশ্রয় নিয়েছেন যে নাগা—স্কেচ করি তাঁকে। ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর, চার হাত তফাতের আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কখনও তিনি ধুনির আগুন উস্‌কে দেন, কখনও পিতলের ত্রিশূলটা ছাই দিয়ে ঘষে ঝক্‌ঝকে করেন, কখনও-বা ডমরুটা বাজিয়ে দেখেন ঠিক আছে কি না।

ঝট্‌পট্‌ স্নান হয়ে যায় সবার। যেন ক'টি মুহূর্ত মাত্র। তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা আগুপিছু নিয়ম অনুসারে। আবার বাজনা বাজল, আবার পতাকা উড়ল, হাতি চতুর্দোলা নড়ে উঠল ; আবার শোভাযাত্রা চলল শহরের পথ ধরে বিল্বকেশ্বরের মন্দিরের দিকে। শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালবেন আজ সবাই। একদল ঢালবেন বিল্বকেশ্বরের মাথায়, একদল দক্ষেশ্বরের মাথায়। এই দুইই বড়ো জাগ্রত শিব এখানে, বলে সকলে।

ঘাট খালি হতেই পথ ছেড়ে দেয় পুলিস। এক আখড়ার পর আর আখড়ার দল আসতে যেটুকু ফাঁক সেই সময়টুকু দেওয়া হয় সাধারণের স্নানের জন্য। সাধুদের স্নানের পরে সেই জলে স্নান করার বাসনা সকলের।

দলে দলে লোক এসে নামতে লাগল জলে। দাদা বললেন, 'দেখা তো হল ; এবার চলো ফিরে যাই। নয়তো আবার কখন পথ বন্ধ করে দেবে, বের হতে পারব না সহজে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে বড়ো রাস্তায় এসে পড়ি। ছুটতে ছুটতে পিছু নেন এক মহিলা। হাঁপাতে হাঁপাতে নাগাল ধরেন তিনি ; বলেন, 'কোন্‌ পথে যাবেন আপনারা?' মুখ চিনি না, স্বর চিনি। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বড়দিকে বলি, 'দেখো তো, ঘাটের সেই মহিলাই কি না?' 'হুঁ' বলে বড়দি বিব্রত মুখে পাশ ঘেঁষে চলেন।

কী বিপদ! গঙ্গার পাড়ে বসে মিথ্যে যেসব বলেছি, এখন তাল সামলাই কী করে তার?

জোরে জোরে পা ফেলি। ভদ্রমহিলা দৌড়ে দৌড়ে সঙ্গ ধরেন। সৎসঙ্গের

এ কী উৎকট আকর্ষণ!

কী করি! মুখ ঘুরিয়ে এবারে তাঁর মুখ দেখি। সুন্দর শ্যামল মুখখানি। বয়স বেশি নয়; যে বয়সে মেয়েদের মুখে একটা স্থির মেয়েলি সৌন্দর্য ফোটে, সেই বয়সেই পা দিয়েছেন সবে। কথা বলতে টোল পড়ে দুগালে দুটি; বড়ো বড়ো কালো চোখে দীপ্তি ফোটে সরল বুদ্ধিভক্তির। সাদাসিধে আধময়লা একখানা শাড়ি পরনে, হাতে দুগাছি সোনার রুলি।

মেয়েটি বললে, 'আপনারা নব্যসাধিকা, দেখেই বুঝেছি। স্কেচ করছিলেন—আর্টিস্ট আপনি। আমি পুরানপন্থী, তবু আপনাদের যে একেবারে না বুঝি তা নয়।'

বলি, 'কার শিষ্যা আপনি? সঙ্গে কেউ নেই নাকি আপনার?'

'সঙ্গীর দরকার কী? মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল, চলে এলাম একলাই। স্নান করে ফিরে যাব। এই একদিনেরই পথ তো মাত্র। জানেন, ভক্ত আমি অনেকেরই, কিন্তু দীক্ষা নিই নি এখনো কারো কাছে। সকলেই দীক্ষা দিতে চান, আমিই মন স্থির করতে পারি না। বাড়িতেও বলে, এখনি কী দরকার? ধর্মকর্মের সময় অনেক পাবে পরে। কিন্তু আপনারা তো বোঝেন—বলুন দেখি—ভিতর থেকে ঠেলা মারলে কে চুপ করে থাকতে পারে? যেটা ঠেলা মারছে সেটা তো চায় ফুটে উঠতে? আপনিই দেখুন না, যদিও আপনাদের আলাদা সাধনা, তবু এই বয়সে যে এতখানি এগিয়ে গেছেন—ভিতরের তাগিদ ছিল বলেই তো?'

কথায় কথায় কোথায় গিয়ে কথা দাঁড়ায়—ভয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাই। বলি, 'বিয়ে হয়েছে কোথায়?'

'কুমিল্লায়। ছোটো থেকে রাঁচিতে মানুষ, বিয়ে হল একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে। ঐ যে আছে না—

'আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি আনে মৃদুমন্দ—
বায়ু তব উড়াবে অলক।
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লি-রবে কী মন্ত্র শ্রবণে কবে—
মুদে যাবে চোখের পলক॥

'অথচ তখন কিন্তু এর মাধুর্য বুঝি নি। চার দিকে ঝিল্লি ঝিঁ ঝিঁ করে, আমি ভয়ে কেঁদে মরি—এ কোথায় এসে পড়লুম। ঘন বন, সন্ধে হলেই অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। সেই-যে কবিতা আছে—রবি ঠাকুর ঋষির নাম শুনেছেন তো? ঋষিই ছিলেন তিনি, যে সাধনা করে গেছেন অমন ক'জনে পারে? সেই তিনি যে লিখে গেছেন—

'দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল।
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল।

'কী কবিতা! তখন তো বুঝতে পারি নি, এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। প্রতি পদে তাঁর কবিতার সুর প্রাণে ঝংকার তোলে। একটু দূরে এলেই মন তবে

ঠিক জিনিসটা খুঁজে পায়—কেমন কিনা? তাই এখন কেবলই মনে হয়—

'দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

'আচ্ছা আপনাদের সাধনাটা কী ধরনের? ভাববেন না আমি অশ্রদ্ধা করি। জানতে চাই মাত্র। অবশ্য নব্যসাধিকা আমি আরো দেখেছি—শিক্ষিত সম্প্রদায়।'

বড়দি দেখি ঠোঁট টিপে হাসছেন। কী জবাব দিই শোনবার জন্য চলতে চলতেও কান সজাগ রেখেছেন। মনের জ্বালা মনে চেপে, যেন বিশেষ দরকারি কথা এগুলি এইভাবে বলে উঠি, 'আপনি উঠেছেন কোথায়? খাবেন কী? বাজারের খাবার থেকে কিন্তু সাবধান, বেঘোরে মারা পড়বেন।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আজ তো উপবাস, কিছু খাব না এমনিতেই। আর দু-একদিন যা থাকব—না খেলে কী হয়? থাকা কি যায় না ভাবেন? এ বিষয়ে আপনাদের সাধনায় কী বলে?'

হা হরি! ঘুরেফিরে যে সেই একই কথা! বলি, 'ছেলেমেয়ে ক'টি আপনার? কোথায় রেখে এলেন তাদের? কার কাছে—' ভাবলাম, এই একমাত্র পথ, যে কথায় যে-কোনো মার মন ঘুরে যাবে সন্তানের দিকে।

সে বললে, 'মেয়ে আমার একটি, আট বছরের। থাকে তার পিসির কাছেই বেশি। উনি তো রেলের ইঞ্জিনিয়ার, ঘোরাঘুরির কাজ। আজ এখানে কাল ওখানে। মেয়েটার পড়াশুনো হয় না ঠিকমত। পিসি হাইস্কুলের টিচার, তিনিই রেখে দিলেন ভাইঝিকে নিজের কাছে। সংসার আর কী?—একটা মায়া বৈ তো নয়। তাই না? আপনার তো এ বিষয়ে জ্ঞান আরও বেশি। আপনিই আমাকে এ তত্ত্ব আর-একটু বুঝিয়ে বলুন না, শুনি।'

অস্থির মনে এদিক ওদিক তাকাই। সামনেই ভোলাগিরির আশ্রম, মেলা ভক্তের ভিড়। চোখের নিমেষে ভিড়ের মাঝে ঢুকে গা ঢাকা দিই। মেয়েটি খানিক এপাশ ওপাশ খুঁজে, ঘুরে—একটু দূরে একটা ধর্মশালা ছিল, তার ভিতরে ঢুকে গেল।

বড়দি এতক্ষণে মুখ খোলেন, 'মান সম্মান রাখা দায় তোমার যন্ত্রণায়। নিজে যা করো, করো; আমায় যদি জড়াও আর—'

সেখান থেকে সোজা চলে আসি দক্ষঘাটে। দক্ষেশ্বর এখানে। অসংখ্য লোকের ভিড়, বিরাট মেলা বসে গেছে প্রাঙ্গণ জুড়ে। কাগজের বাঁশি, ক্ষীরের পেঁড়া, বেসনের লাড্ডু, গরম জিলিপি, ঘোলের শরবৎ, বেলুন, ঝুমঝুমি, কাঠের ঘোড়া, রঙিন কাগজের খেলনার ছাতা, ফুলের তোড়া, সোলার দাঁড়ে শালিক টিয়া, লেজ-ঝোলা হনুমান, কত কী। ছেলেবেলায় দেখা রথের মেলা যেন বুড়ো বটের তলায়। এক পাশে জোড়া বলদ ঘানিতে জুড়ে আখের রস বের করে বেচছে লোক কাঁচের গেলাসে বরফের টুকরো ফেলে। শুকনো গলায় এই ঠান্ডা সবুজ রস না জানি কী অমৃত ঢালে। কেন যে মরতে আজ উপোসের নাম মুখে এনেছি। ঢোঁক গিলি আর দেখি, গোল হয়ে ঘিরে বসে খাবার কিনে খাচ্ছে এক-এক পরিবার, বউ ঝি ছেলেপিলে নিয়ে।

সারা দিন এরাও ঘোরাঘুরি করেছে—খালি পেটে ক্লান্তি বেশি লাগে। তিন আনা সের নারকেলি কুল, আঁচল ভরে কেনে ছেলের মাসি। কমলালেবু টিপে টিপে দেখে, দরে বনে না, উঠে যায় কোলের শিশুকে কাঁখে তুলে মা। গাছের ছায়ায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছে পশ্চিমের বাবু বন্ধুদের নিয়ে হাঁটুর উপর পা তুলে। চার দিকেই বেশ একটা তৃপ্তি, বিশ্রামের ভাব।

দাদা বললেন, 'আমি এখানেই বসলাম। তোমরা গিয়ে শিবের মাথায় যা দেবার দিয়ে এসো। "সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য"—মেনে নিলাম মনে।'

শিবমন্দিরের কাছাকাছি এসেই চক্ষু চড়কগাছ। যা লোকের ঠেলাঠেলি। তার উপর মন্দিরে ঢুকবার পথটা সরু। পথের দু দিকে আবার উঁচু গাঁথনির দাওয়া—মানে দেয়ালই। যেন সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ-পথ। সেই পথ জুড়ে জোয়ান জোয়ান হিন্দুস্থানি পাঞ্জাবি মারোয়াড়ির ঠাসা 'কিউ'—একেবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা। অর্ঘ্য-ভরা হাত যে যার মাথার উপরে তুলে ধরে কাঁধে বুকে ঢুঁষোঢুঁষি চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। এ লম্বা কিউ যে কবে থেকে এগোচ্ছে, কবে গিয়ে পেঁছিবে মন্দিরে—গতি দেখে ভিরমি লাগে। দক্ষেশ্বরের ছোট্ট ঘরের ছোট্ট দরজা দিয়ে এক-জনের বেশি দুজন ঢুকতে পারে না একসঙ্গে। দুটি মাত্র দরজা ; এক দরজা দিয়ে লোক ঢোকে, আর দরজা দিয়ে এক-এক করে বেরিয়ে আসে। কখন এ ভিড় হাল্কা হবে হদিশ পাই না। পলকে পলকে বেড়েই চলেছে শেষের দিকে লোকের সারি।

বড়দির মুখে বিষণ্নতা ঘনিয়ে আসে। ব্রজরমণ বলেন, 'আপনি এখান হইতেই মনে মনে মহাদেবকে অঞ্জলি অর্পণ করিয়া প্রণাম করুন ; আমি দুধ ও ফল-ফুলাদির পাত্র লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দক্ষেশ্বরের মাথায় ঢালিয়া আসি।'

এ প্রস্তাব তবু ভালো। বড়দি অবুঝ নন। টপ্‌কে চাতালে উঠে পড়লাম। শিবকে দেখা যায় দরজার ফাঁক দিয়ে, নিচু মেঝের মাঝখানে। বড়দি মুঠো-ভরা ফুল বেলপাতা ছুঁড়ে দিলেন শিবের উদ্দেশে। ব্রজরমণ পিতলের বালতি ভরা দুধ ফল শূন্যে তুলে ধরে দাঁড়াল গিয়ে ভিড়ে মিশে।

এখানে আর থেকে কী লাভ? চলে আসি দাদার কাছে। পথের ধারের ভাঙা বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। পা ছড়িয়ে বসি আরাম করে। নীচে এক বৈষ্ণবী গামছা বিছিয়ে বসে ভিক্ষে করছিল ; তাকে দেখিয়ে দাদা বললেন, 'দেখেছ মজা ; এর বাড়ি ময়মনসিংহে। ব্রাহ্মণ বিধবা। এতক্ষণ গল্প করছিলাম এর সঙ্গে।'

হাঁটুতে থুঁতি রেখে বৈষ্ণবী মুখ নিচু করে বসে আছে। যেন কী ভাবছে এক-মনে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। এক সময়ে হঠাৎ সে মাথা তুলে শুধোল, 'মোছল-মানে কি এক্কেরেই ছাইয়্যা ফেলছে?'

'কী?'

'আমাগো দ্যাশ? ময়মনসিং?'

ব্রাহ্মণ বিধবা, অল্প বয়স, তীর্থস্থান—উন্মনা, লাবণ্যবতী, দুঃখী ভিখারিনী—সব মিলিয়ে না জানি কী এক নিদারুণ ইতিহাস অতীতের।

সে বললে, 'ঐ জ্বালায়ই তো আসছি চইল্যা। না আইস্যা উপায় কী? ছেইল্যা বেলায় বিধবা হইছি—বাবা আছিল না বাইচ্যা—দাদার সংসারে থাকি। ঐ-ই

একমাত্র ভাই। মোছলমানে টিকতে দেয় না আমারে, সকাল সন্ধ্যা টালায়। শ্যাষে একদিন দুপুর রাইতে আইস্যা উপস্থিত দলবল, দা সড়কি লইয়্যা। বাড়ি ঘেরাও কইর‍্যা কয়, এমনি না দিলে দাদারে কাইট্যা আমারে লইয়্যা যাইবো তারা! দিদি আমারে বুঝাইলো, তোমার তো আর থাকা চলবো না এইখানে। মায়ের প্যাটের ভাই খুন হইবো তোমার লেইগ্যা? ভাইরে বাঁচাইতে চাও তো তুমি দ্যাশ ছাইড়া চইলা যাও। চইলা আসলাম। তেরো বছর হইল গত আষাঢ়ে।'

এখন বাতে পঙ্গু; হাত-পা নাড়তে পারে না ঠিকমত। এক মাস আগে আবার একটা চোখ কানা করে দিয়েছে গোরুতে গুঁতিয়ে।

পথ দিয়ে এক ধনী দাতা পয়সা ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে মন্দিরে, অর্গেণ্ডির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে। সামনের ভিখিরির সারি থেকে বৈষ্ণবী পড়ে গেছে পিছনে, দাতার নজর পড়ে না তার দিকে। বৈষ্ণবী ছেঁড়া গামছাটা তুলে নিয়ে ছ্যাঁচ্‌ড়াতে ছ্যাঁচ্‌ড়াতে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে মিহি সুরে চেঁচায়, 'বাবু, ও বাবু, একটু ভিখ্‌ষা দ্যাও না এইখানে।'

বড়দি বললেন, 'পোড়াকপালির হাত-পাখানি দেখো, কেমন ছোটো ছোটো পাতার মতন। ভালো ঘরের মেয়েই ছিল গো এককালে।'

নির্বাণী আখড়া এসে পড়ল বলে এখনি। 'রাস্তা ছোড় দেও, রাস্তা ছোড় দেও'— রব উঠল আবার। আজকের দিনে কখন কোথায় আটকে পড়ি ঠিক নেই। এঁরা আসার আগেই বাড়ি ফেরা দরকার। তা ছাড়া সেবাশ্রমেও আজ শিবপুজো হবে প্রহরে প্রহরে। উপস্থিত থাকতে হবে, অন্তত প্রথম দিকে তো নিশ্চয়ই।

বড়দির সঙ্গে পরামর্শ ছিল—শিবরাত্রিতে গাজন হবে নানা জায়গায়, ঘুরে ঘুরে দেখব, সারা রাত জেগে। সে কথা আর তুললাম না ফিরে। দু প্রহর রাত কাটতে না কাটতে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

বড়দি বললেন, 'কুম্ভস্নান, কুম্ভস্নান—হয়ে গেল কুম্ভস্নান। যাক্ নিশ্চিন্ত এবার।'

খালি পেটে ঘুম এল না। হাওয়ার দাপটে তাঁবুর পাশের জোড়া ইউকেলিপ্-টাসের ডালগুলি গায়ে গায়ে লেগে মট্‌মট্ করতে থাকল রাতভর।

গল্প শুনেছিলাম, এক বুড়ি তীর্থ করতে এসেও তার সিম-বরবটি লতার কথা ভুলতে পারে না। মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেখে আর ভাবে, ঐ বুঝি গোরু ঢুকল, ঐ বুঝি ছাগলে মুড়িয়ে খেল। মাচা-ভরা মন নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল বুড়ি। দেবদর্শন আর ঘটল না কপালে।

সেই দশা কি আমারও হল? ঘুম ভেঙে উঠেই কেন লাউ-মাচার জন্য মনটা খচ্ খচ্ করে উঠল। কী না জানি হল তার। কত জালি পড়েছে লতায় লতায়—দেখে এসেছিলাম। সেগুলি বড়ো হয়েছে নিশ্চয়ই এতদিনে। রমু কী করল সেগুলি নিয়ে? কাকে কাকে দিল? কী কী রাঁধল?—কুয়োর ধারে রোদে পিঠ দিয়ে ভাবছি কত কথা!

কী কষ্টের লাউ গাছ! এই প্রথম লাউ ধরল আমার হাতে। লোকের বাড়িতে শুনি শয়ে শয়ে লাউ হয়; খেয়ে, বিলিয়েও কূল পায় না, কেটে কেটে গোরুকে খাওয়ায়। আর, আমার বেলায় গাছ হয়, ডগা মেলে, ফুল ধরে, শেষে মাচা-ভরা লকলকে ডগা হঠাৎ একদিন ঢলে পড়ে। কী, না—শিকড়ে উই ধরেছে, শামুকে গোড়া কেটেছে, আসল মোটা ডালটার ভিতরে পোকা বাসা বেঁধেছে, বেশি সার-জলে গুঁড়ি পচে গেছে—কত কী ব্যাঘাত।

এবারও তাই যখন ঢলঢলে পাতায় ছেয়ে গেল মাচা, দুরন্ত শিশুর মতো এদিক ওদিকে ছুটল ডগাগুলি, সাদা সাদা ফুল ফুটল পাতার মাথা ছাপিয়ে—মায়া কাটিয়ে ফেললাম এক সময়ে। কী হবে আর গাছের তলায় উঁকিঝুঁকি মেরে? শুকিয়ে তো গেল বলে এই।

যাই না আর সেদিক পানে ক'দিন। কী লাভ মায়া বাড়িয়ে? যা থাকবে না তা চলে যাক সহজে।

পোড়া মন চুপ থাকতে পারে না। দিন-পাঁচেক পরে দিনের কাজ সেরে বিনুনি পাকাতে পাকাতে এক-পায়ে দু-পায়ে দাঁড়াই গিয়ে মাচার কাছে। আড়ে আড়ে তাকাই গাছের দিকে। মায়া কাটিয়েছি যার, তার দিকে কি সোজাসুজি চাওয়া যায়?

'রমু রে রমু, দেখে যা এসে, দৌড়ে আয়'—চেঁচিয়ে উঠি জোরে। 'জালি যেন দেখছি একটা পাতার ফাঁকে।' রমু ছুটে আসে—'কই, কই? ও মামিমা, ঐ তো আর-একটা, এই আর-একটা—দেখো আরো একটা, আরো একটা।'—ছুটোছুটি লাগায় গাছ ঘিরে। গুঁড়ি গুঁড়ি কত জালি দেখা দেয় লতায় লতায়।

সেই এত আগ্রহের লাউ আমার বড়ো হল, দেখতে পেলাম না।

'তুমি এখানে? আমি আরো দশ জায়গা খুঁজে মরছি তোমার জন্যে।' বলতে বলতে বড়দি এলেন কাছে। বললেন, 'চলো শিগগির তাঁবুতে। ঝুড়ি-ভরা মটরশুঁটি দিয়ে গেছে, ছাড়াতে হবে। রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের ভোগে লাগবে। সময় বেশি নেই। এসে হাত লাগাও চটপট।'

বসে যাই দল বেঁধে ঝুড়ি ঘিরে। খেত হতে সদ্য তোলা টাটকা মটরশুঁটি, পট্ পট্ হাত দিয়ে টিপি আর ঝরঝরিয়ে দানা ফেলি। ভেবেছিলাম কতক্ষণই বা লাগবে সময়। দেখি, দুপুর গড়িয়ে গেল! বড়দি ঝেড়েঝুড়ে একটি অবধি দানা খুঁটে তুলে, খোসা দানা আলাদা আলাদা ঝুড়িতে সাজিয়ে সকলের শেষে কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন।

'দিন গেল বৃথা কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে'—বড়দির কৃপায় এ হবার উপায় নেই। সৎ কাজ সৎ সঙ্গ—আমাদের জীবনের এখন একমাত্র উপলক্ষ। দিনটা ঠাকুরের কাজে কাটিয়ে বিকেলে বের হলাম সাধুদর্শনে। বড়দি বললেন, 'সেদিন ভাণ্ডারায় মহাদেবানন্দজিকে দেখলাম যেন, ভোলাগিরি-আশ্রমের মণ্ডলেশ্বর তিনি। চলো-না দেখি গিয়ে, যদি দর্শন পাই। শিলচরে এসেছিলেন একবার বহুদিন আগে।'

ছাদের উপরে বেড়াচ্ছিলেন মহাদেবানন্দজি। রোজই এই সময়ে খানিকটা

পায়চারি করেন তিনি। আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

মন্দির পেরিয়ে আঙিনায় গিয়ে দাঁড়াই। আশ্রমের লোক যাওয়া-আসা করে, মুখ তুলে দেখে, কিন্তু কোথায় আমরা বসি কেউ বলে না তা।

দাদা বললেন, 'কী আর হবে, দাঁড়িয়েই থাকো। দর্শনের আশায় লোকে কত কষ্ট করে, আর আমরা কি এটুকুও পারি না?'

উঠোনের মাঝখানে কাঁকরের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি, ঘাস হলে কেমন বসে পড়া যেত! এতখানি পথ হেঁটে এসেছি, পা দুটো ধরে গেছে।

মহাদেবানন্দজি নীচে নেমে এলেন। উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা ইজিচেয়ার পাতা ছিল, পাশে পিঠে কুশন দেওয়া ; রোজ বোধ হয় এখানে এসে তিনি বসেন। মহাদেবানন্দজি নেমে আসতেই একজন ইজিচেয়ার একটু ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে এগিয়ে দিল। তিনি না বসে চার দিকে তাকিয়ে, উঠোনের এক পাশে একটা খাটিয়া পড়ে ছিল, আমাদের নিয়ে কথা বলতে বলতে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। ভক্ত সেবক তখন ইজিচেয়ারখানা তুলে এনে সেখানে দিল। তিনি বসলেন, আমরাও সামনাসামনি খাটিয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে বাঁচলাম।

'ছোটোতে বড়োতে তফাত এইখানেই,' চাপা গলায় বললেন বড়দি। 'দেখলে তো, ইনি এসেই আগে দেখলেন, কোথায় আমাদের বসাবেন ; নিজের আসন ছেড়ে তাই এতদূর এলেন।'

বৃদ্ধ মানুষ, হাসি-ভরা মুখ। সাদাসিধে কথায় গল্প জমে যায় সহজে।

দাদা বললেন, 'আমাদের মতো গৃহী লোকের পক্ষে সাধনার সহজ পথ কী?'

মহাদেবানন্দজি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে মালা জপলেন ; বললেন—

'ভজ হে মন হরে নাম—
গৌরীশংকর সীতারাম,
রাধে কৃষ্ণ রাম রাম,
খালি জিবে কোন্ কাম?'

বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'এই তো আসল কথা। খালি জিবে কোন্ কাম—জিহ্বা খালি রেখে লাভ কী? হাতে পায়ে কাজ করলেও মুখে "শিব শিব শিবো", "শিব শিব শিবো"—এ তো সারাক্ষণ বলা চলে। নামজপ সর্বদা করতে হবে। একবার একটি মেয়ে এসে বলল, আমাকে গায়ত্রীমন্ত্র দিন। বললাম, তুমি মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছ কারো কাছে? সে বললে, হ্যাঁ নিয়েছি ; তবে তা অন্য মন্ত্র। আমি গায়ত্রীমন্ত্র চাই। আমি বললাম : দেখো, সব মন্ত্রই এক। গায়নাৎ ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী—যা পুনঃপুনঃ গান করলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাই গায়ত্রী। মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্র—যা পুনঃপুনঃ স্মরণ করলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাই মন্ত্র। একই কথা। তোমার গায়ত্রীমন্ত্র নিতে হবে না ; ঐ মন্ত্রই স্মরণ করো।

'হ্যাঁ, মন্ত্র সব জায়গায় সব অবস্থাতেই নেওয়া যায়। একবার এই নিয়ে এক সভায় খুব তর্ক উঠল। একদল স্বীকার করল না ; তারা বলল, অশুচি অবস্থায় মন্ত্র-উচ্চারণ চলে না। আমি বললাম, নিশ্চয়ই চলে। শুনে তখনই সভায় গোল উঠল, একদল ছেলে মেঝেতে জুতো ঘষে ঘষে শব্দ তুলল। যে পণ্ডিতের প্রতিবাদ করেছি তারই দল ভারী। সভা প্রায় ভাঙে-ভাঙে অবস্থা। একজন উঠে বলল,

আপনি পারেন প্রমাণ করতে যে সব অবস্থাতেই মন্ত্র-উচ্চারণ চলে? বললাম, হ্যাঁ প্রমাণ করব ; পাঁচ মিনিট সময় মাত্র আমাকে দেওয়া হোক।

'পাঁচ মিনিটের জন্য সবাই একটু শান্ত হল।

'আমি বললাম, অশুচি যদি বল তো সারা দেহই আমাদের অশুচি। নোংরা বস্তুতে ভরা আমাদের শরীর। জন্ম, জন্মগ্রহণ সবই আমাদের নোংরার মধ্যে। পবিত্রতা কোন্‌খানে? কোন্‌টা কেটে বাদ দেবে শরীর হতে?

'মেনে নিল শেষে আমার কথা সবাই সে সভায়।

'তবে কিনা, জপ তপ করবার সময়-সুবিধে থাকলে যতটুকু পরিষ্কার হতে পারা যায়, ভালো। জপতপ দিয়ে মনকে একাগ্র করে নেওয়া তো।'

ব্রজরমণ জিজ্ঞেস করলেন, 'স্নানাদির প্রয়োজন কতখানি?' তিনি বললেন, 'স্নান করে নিলে শরীর-মন অনেকটা পরিষ্কার হয়। সুযোগ-সুবিধে থাকলে তা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু রাস্তায় ঘাটে বা অসুস্থ অবস্থায় তো স্নান চলতে পারে না? তার জন্যও বিধি আছে। শাস্ত্রে আট রকমের স্নানের কথা পাওয়া যায়। তার মধ্যে তিনটি যখন-তখন যেখানে-সেখানে করা যায়। যেমন : গঙ্গাস্নান—গঙ্গাজলের ছিটে দিলেই হয় শরীরে। আগ্নেয় স্নান—যজ্ঞভস্ম কপালে গলায় হাতে বুকে পিঠে, শরীরের পঞ্চ অঙ্গে মাখলেই আগ্নেয় স্নান হয়। এ স্নান সবচেয়ে সুবিধের। যজ্ঞভস্ম রেখে দিলেন কৌটোয় ভরে, যখন-তখন ব্যবহার করতে পারেন। পথ চলবার সময়ে কাগজে মুড়ে পকেটে ফেলে রাখলেন। আর-একটা স্নান হচ্ছে, বায়ব্য স্নান—গোরুর খুরের মাটি। গোরু চলে গেলে মাটিতে তার খুরের যে গর্ত হয় সেই মাটি ; তাকে বলে, "গোপদরজঃ"। এই গোপদরজ শরীরের পাঁচ জায়গায় লাগালেও স্নান হয়।'

হিমে ঠাণ্ডা লাগে পাছে, এক ভক্ত চাদর এনে ঢেকে দিল মহাদেবানন্দজির বুক মাথা। ভোলাগিরি-আশ্রমের শিবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজল আরতির। উচিত নয় আর এঁকে ধরে রাখা। উঠে পড়লাম আমরা।

মন্দিরে পাশাপাশি তিনটি ঘর, শ্বেতপাথরের মাঝখানে শিব প্রতিষ্ঠিত। রুপোর আটটি পদ্মপাপড়ির উপরে রুপোর শিব বসানো—নতুন রকম। দেখি নি আগে আর কোথাও।

ডান দিকের ঘরে শংকরাচার্যের মূর্তি। ছেলেমানুষ মুখখানি। বড়ো ভালো লাগে এ মূর্তি দেখতে। অবাক হয়ে যাই যখন ভাবি, কত অল্প বয়সে তিনি কী অসীম পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

গল্প শুনি, ছ-সাত বছর বয়সেই শংকরাচার্য সংসার ত্যাগ করতে চান। মা বাধা দেন। একদিন নদীতে স্নান করতে নেমেছেন, কুমিরে পা টেনে ধরল। মা ছিলেন ঘাটে দাঁড়িয়ে। শংকরাচার্য বললেন, 'মা, আমাকে তুমি সন্ন্যাস নিতে দিলে না, আর এখন দেখো আমাকে কেমন তোমার সামনে হতে কুমিরে নিয়ে যায়।' মা হক্‌চকিয়ে যান।

কুমির যত টানে শংকরাচার্য তত চেঁচান, 'মা, তুমি আমাকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিলে না, এখন দেখো কী হল?'

টানতে টানতে কুমির যখন শংকরাচার্যকে মাঝ-নদীতে নিয়ে গেল, গলাটুকু মাত্র তলিয়ে যাওয়া বাকি, তখনও তিনি বলছেন, "মাগো, কুমিরে নিল সেটা সইলে, তবু সন্ন্যাস নেব তা সইতে পারলে না?' তখন মার সম্বিত ফিরে আসে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'আমি অনুমতি দিচ্ছি সন্ন্যাসের, তুমি উঠে এসো।'

শুনে শংকরাচার্য উঠে এলেন কুমিরের মুখ ছাড়িয়ে। এসেই বেরিয়ে গেলেন সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে। ষোলো বছর বয়সে তিনি সমস্ত শাস্ত্র শেষ করে বেদান্তের ভাষ্য, গীতার ভাষ্য, বারোখানা উপনিষদের ভাষ্য লেখেন। পায়ে হেঁটে কুমারিকা হতে হিমালয়, এদিকে কামরূপ-কামাখ্যা পর্যন্ত পর্যটন করেন।

বত্রিশ বছর বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন। তার মধ্যে কী না করেছেন! পুরীতে গোবর্ধন-মঠ, বদরীনারায়ণে যোশী-মঠ, দ্বারকায় সারদা-মঠ, কাশীতে শিঙ্গারী মঠ—চার জায়গায় চার মঠ স্থাপন করেছেন। হিন্দুধর্মকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গেঁথে দিয়ে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে দশনামীভুক্ত করে দিয়ে গেছেন। তাঁর এক জীবনের জ্ঞানের যা দান, লক্ষ লক্ষ জ্ঞানী এখনো পর্যন্ত তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়ে চলেছেন।

বড়দি বলেন, 'স্বয়ং মহাদেবই শংকররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গীতায় আছে, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—যখনই ধর্মের বিপ্লব হয় তখনই ধর্মরক্ষার্থ ভগবান এসে আমাদের মাঝে উদিত হন। শংকরাচার্যও সেইরকম বিপ্লবের সময়েই এসেছিলেন। যখন এক দিকে দেশের উপর দিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন বইল, আর-দিকে মুসলিমধর্মের জুলুম চলল, শংকরাচার্য এসে হিন্দুধর্মকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

আর মন্দিরের ঐপাশে শিবের বাঁ দিকের ঘরে ভোলাগিরির শ্বেতপাথরের মূর্তি। চোখে কালো চশমা আল্‌গা বসানো ; যেমনটি নাকি তিনি লাগাতেন। ছেলেবেলায় ভোলাগিরিকে দেখেছি কয়েকবার ঢাকায় থাকতে। লম্বা চওড়া ধবধবে হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। কী ভিড় জমত তাঁকে দেখবার জন্য। যেখানে যেতেন, যেন তিন মেয়ের বিয়ের উৎসব এমনি জাঁক-জমক হত। মার আঁচল ধরে যেতাম আমি। সেই মূর্তি ভুলি নি আজও। পাথরের কাটা এই মূর্তি যেন রোগা মনে হল। বোধ হয় শেষ বয়সের হবে।

ভোলাগিরির মুখেই শুনেছিলাম, সে কত কাল আগের কথা। ঢাকার বিখ্যাত ধনী—বাবুর নাতি মৃত স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশে শহর হতে দূরে তাদেরই একটা বাগানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। অবারিত দ্বার, দিনভর উৎসব, ভোলাগিরি নিজে সেখানে উপস্থিত। তাঁকে দেখতে কত দূর দূর থেকে দলে দলে কত যে লোক আসছে।—মনে আছে, সেই ভদ্রলোক, যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি খালি গায়ে সোনার-বুটি-তোলা বেগুনি রঙের বেনারসি পরে শিবমূর্তি মাথায় নিয়ে মন্দির পরিক্রমা করছেন। কতদিন আগের কথা, এখনো সে ছবি স্পষ্ট চোখে। এক ঘরে ভোলাগিরি বসে আছেন, ভক্তের দল ঘিরে আছে তাঁকে। আমি যে কী করে সেই ঘরে গিয়ে পড়লাম জানি না। এই যেমন আজ মহাদেবানন্দজি বললেন, 'মুখে শিব শিব শিবো বলবে, হাতে কাজ করবে,' সেদিন সেই ঘরেও ঠিক তাই শুনেছিলাম।

ভোলাগিরি তাঁর শিষ্যদের বোঝাচ্ছেন ; এক হাতে চরকার চাকা ঘোরাবার ও আর হাতে সুতো টানবার ভঙ্গি দেখিয়ে বলছেন, 'দেখ্, এইভাবে হাতে সুতো কাটবি আর মুখে বলবি— শিবো শিবো শিবো।'

অন্ধকারে তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে পথের মাঝে জোরে ধাক্কা লাগল যেন কার সঙ্গে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে রে? : দেখে চলতে পারিস না?'

কী মোলায়েম মিহি গলা! রেগেছে, তাতেও যেন সুরে মধু ঢালছে।

টর্চের আলো ফেললাম। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই বুকেই তার মাথাটা এসে ধাক্কা খেয়েছিল। আমার অভিজিতের বয়সী এক কচি কিশোর ; দুটি চোখই অন্ধ।

রাগে দুঃখে ঠোঁট দুখানি কাঁপছিল তার তখনো। সাড়া না পেয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে সে বললে, 'কে? শেঠানী? আহা-হা, আমি কাকে কী বলেছি রাগের মুখে। মাপ করো, আমায় মাপ করো।'

প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদ উঠেছে শালগাছের ফাঁকে। মনের গুহায় সে কোন্ অতল গভীরে কী এক ব্যথার বাঁশি গুমরে বাজে। শুনব না বলেও এড়াতে পারি না সুর। ইচ্ছে হয় এই পিচ-ঢালা সোজা বাঁধানো রাস্তা হতে ছিটকে গিয়ে পড়ি ঐ বনের ভিতরের এবড়ো-খেবড়ো নুড়ি-ছড়ানো পথে, কালো কালো কাঁটাঝোপে।

বাঁ দিকের চালাঘরের দাওয়ায় অর্ধ-উলঙ্গ শিশুর দলকে নিয়ে ঘিরে বসেছে এক বুড়ো। মাঝখানে একটা কেরোসিনের ডিবে। যেন মজার এক খেলা। বুড়ো ফোক্লা মুখে হেসে ফুটো ঢোলে চাঁটি দিয়ে গায়—

'সুখ দুঃখ কিছুই না এ ভবে—
ভোঁ হয়ে যাও নামের নেশায়,
ঐ এক সুধামাখা রামনামই খাঁটি জগতে।
বলো, রাম রাম।'

ছেলের দল উল্লাসে জিগির দিয়ে ওঠে 'রাম রাম।'

শেষ রাত হতে টের পাচ্ছি, শোঁ শোঁ হাওয়া বইছে বাইরে। স্পষ্ট শুনছি বিছানায় শুয়ে। ডবল-ঢাকা তাঁবুতে হাওয়া ঢোকে না ভাগ্যিস ; কী অবস্থা হত তা না হলে। শিয়রের দিকে কাপড়-কাটা জানলা হাল্কা পর্দায় ঢাকা। মাথা তুলে দেখছি বার বার, ভোরের আলো কতটুকু ফুটল সেখানে। সারা রাতের কসরতে কম্বলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তাতিয়েছি গা, একটু আরামের আমেজ লাগছে সবে। আর এখনি কিনা উঠতে হবে বিছানা ছেড়ে!

হৃষীকেশ যাবার কথা আজ ভোরে।

চোখ পিট্ পিট্ করে দেখি, কে উঠল না উঠল ; দেখে আবার মুখ ঢুকিয়ে নিই। আগে উঠুন সবাই। উঠে তৈরি হয়ে আমাকে তাড়া না লাগানো পর্যন্ত ছাড়ছি নে বিছানা। কিন্তু কী কপালের গেরো ; বড়দি যে কখন উঠে বাইরে চলে গিয়েছিলেন টেরও পাই নি। ভিজে গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে এসে ঢুকলেন ভিতরে। ভিজে চুল বেয়ে জল গড়াচ্ছে টস্ টস্ করে। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমায়

শুয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন খাটের কাছে। অন্যদিন হলে বড়দি আমার কপালে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে ডাকতেন, 'এবার উঠে পড়ো, চায়ের ঘণ্টা পড়বার সময় হল যে।' আজ তাঁর অনেক কাজ, সারা দিনের মতো সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে হবে তাঁকে। আজ তাই কপালে হাত রেখেই এক ঠেলা মারলেন—মানে, ওঠো এইবার।

সক্কালবেলা, ব্রাহ্ম মুহূর্ত ; কথা-কাটাকাটির সুবিধে নেই, অগত্যা হাত-পা কুঁক্‌ড়ে উঠে বসতে হয়। বসে থাকলে আবার চলে না, বিছানা ছেড়ে নামি। নেমে তাঁবুর দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়াই—ওরে বাপ্‌ রে! মুহূর্তে খোলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে কচ্ছপ বনে যাই। মনে হল যেন সহস্র হুল-বসানো এক থাপ্পড় মেরে দিল শীত, আমার এগিয়ে দেওয়া মুখখানাতে।

ভিতরে বসে দিন কাটবে না, বেরতেই হবে। বড়দির দিকে তাকাই। লাল-পাড়ে-ঘেরা শান্ত মুখখানায় শীতের আক্রমণের কোনো চিহ্ন নেই। দেখে দেখে মনে সাহস টানি। তিনিও মানুষ, আমিও মানুষ। তিনি পারলে আমি পারব না কেন? তবে? শাঁ করে বেরিয়ে গেলাম দাঁতন ঘটি সাবান তোয়ালে হাতে নিয়ে।

চা খেয়ে, ঝোলাঝুলি কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলাম বাস্‌স্ট্যাণ্ডে। এক মোটর পাওয়া গেল দিনভর চুক্তিতে। চেপে বসলাম।

হু হু করে গাড়ি ছুটল। দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে নির্জন বনের পথে এসে পড়ি। দু পাশে শাল জাম নিম খয়েরের গাছ। আমলকীও দেখা যায় মাঝে মাঝে। রিজার্ভ ফরেস্ট, ছায়াশীতল রাস্তা।

সঙ্গে শশী মহারাজ। তিনি বললেন, 'আগে এখানে হামেশা ময়ূর হরিণ দেখা যেত। এখনো আছে, হয়তো ফিরতি পথে দেখা যেতে পারে।'

দূরে বনে-ঘেরা পাহাড়ের মাথায় সাদা দালানের সারি ঝল্‌মল্‌ করে উঠল।

শশী মহারাজ বললেন, 'ওটা নরেন্দ্রনগর। টিহিরির রাজার রাজধানী এখন।'

সূর্যের আলো কী শোভা ফুটিয়েছে রাজধানীর সারা অঙ্গে। যতই এঁকে-বেঁকে চলেছি, রাজধানী একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে, একবার সামনে একবার পিছনে, মুহুর্মুহু দিক ঘুরে নাচানাচি শুরু করে দিল। যেন লুকোচুরি খেলা জুড়ল। ফিরে ফিরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাই সে দিকে আর তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মনে মনে হাসি খিল্‌খিলিয়ে।

হৃষীকেশের পথে 'সত্‌ নারায়ণ'এর মন্দির। 'নারায়ণজিকে দর্শন করেই যাওয়া যাক,' নির্দেশ দিলেন শশী মহারাজ।

গাড়ি হতে নামলাম আমরা। সামনের সীটে বসেছিলেন শশী মহারাজ ; দরজা খুলে পা-দানিতে পা দিয়েই যেন কেউটে দেখে আঁৎকে উঠে পা গুটিয়ে খটাং করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কী হল তাঁর?

তিনি বললেন, 'আপনারা এগোন, আমি আসছি পরে।' বলে, আঁটসাঁট হয়ে শশী মহারাজ গাড়িতে বসে রইলেন।

ফটকের ভিতর দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে বড়দি খুক্ খুক্ করে হেসে উঠলেন। কী ব্যাপার? বড়দি পিছন ফিরে শশী মহারাজকে একবার দেখে নিয়ে আঙুলের ইশারায় ফটকের কার্নিশটা দেখালেন। চার-পাঁচটা বানর বসে আছে সেখানে। যাত্রী দেখে উস্‌খুস্ লাগিয়েছে খাবার পাবার আশায়। শশী মহারাজের নামতে অনিচ্ছার কারণ বোঝা গেল এতক্ষণে।

সত্যনারায়ণ—কালো পাথরের মূর্তি, সুন্দর নিখুঁত। কিন্তু কালো পাথরের কালো চোখ নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারে না সেবকরা; রুপোর পাতের সাদা চোখ বসিয়ে কালো মণি এঁকে দেয় মাঝখানে। তাই সব মূর্তিতেই দেখি, চোখগুলি যেন জ্বলতে থাকে দেবতাদের মুখে। সাদা চোখে পূর্ণ গোল মণি, দৃষ্টিকে কেমন প্রখর করে তোলে; দেবতার চোখের সে কোমলতা থাকে না এতে করে। শুনেছিলাম রামকৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন কাকে—'তোরা দেবচক্ষু আঁকতে জানিস না। দে আমাকে, আমি এঁকে দিই।' বলে নিজের হাতে দেবচক্ষু এঁকে দিয়েছিলেন তিনি। দেবতার চোখও ভক্তের হাতের স্পর্শ অপেক্ষা করে।

সত্যনারায়ণের পাশেই একটা পানচাক্কি। গম পিষে আটা বের হচ্ছে ঘটাঘট্ শব্দে চাকা ঘুরে। আঙিনায় একটা ছোট্ট কুণ্ড। সেই কুণ্ডের জল এইটুকু জায়গার মধ্যেই উঁচুনিচু করে এনে এই পানচাক্কি বসিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে।

কুণ্ডের মাঝখানে একটা মন্দির। জলের উপরকার বাঁধানো পথ দিয়ে এলাম মন্দিরে। কী দেবতা এখানে? সিঁড়ির কাছে বসেছিলেন এক বাঙালি পরিব্রাজক। রুক্ষ রোগা, কিছুদিন হল ঠাঁই নিয়েছেন এখানে। বাঙালি যাত্রী দেখে তিনি উঠে এলেন কাছে, বললেন, 'এ হল শিবের মূর্তি।'

শিবের কী করে এই মূর্তি হয়? যদিও বেশির ভাগ অঙ্গ লাল শালুতে ঢাকা, বাকিটুকু তেল-সিঁদুরের প্রলেপ-মাখা। কিন্তু-মিন্তু করেন বড়দি। বলেন, 'চিহ্ন দিয়েই আলাদা আলাদা দেবতার প্রকাশ। শিবের চিহ্ন তো কিছু পাই নে খুঁজে।'

পরিব্রাজক বললেন, 'তবে বিষ্ণু।'

বড়দি মাথা নাড়েন—বিষ্ণুও নয়।

'তা হলে রামচন্দ্রই হবেন।'

পাগল নাকি লোকটি!

ব্রজরমণ একমনে দেখছিলেন এতক্ষণ। তিনি বললেন, 'মূর্তিটির পদতলে সর্প প্রতিভাত হইতেছে, দুই পার্শ্বে পক্ষীর দুই ডানা লক্ষ্য করা যাইতেছে; চক্ষুদ্বয় গোলাকৃতি; মুখমধ্যে চঞ্চু বসানো; আমার মনে হইতেছে যে ইহা গরুড়-মূর্তি।'

তাই তো বটে! নারায়ণের বাহন গরুড়। একে নইলে চলবে কেন তাঁর।

আবার গিয়ে গাড়িতে উঠি। আবার দু ধার দিয়ে গাছ ছুটে যায়, বন ছুটে যায়; ছুটে যায় সবুজ খেত, চাষীর গাঁ, মোষের গাড়ি, ভেড়ার পাল—কত কী। এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যায়—দয়া মায়া নেই একটু। কই, আমি তো পারি না যেতে এমনি করে? যেতে যেতে ওরই মধ্যে আঁকড়ে ধরি মোটা পুরাতন গাছের গুঁড়িটাকে, ধরি সরষেখেতের উপর ঝরে-পড়া রোদের ঝলকটুকুকে। দোলা দিয়ে যায় মনের তলে—গোয়ালিনীর ভারী ঘাগরার নীচে বসানো লাল পাড়ের রেখা, ভাঁজে ভাঁজে আছড়ে-

বিছড়ে পড়ে পায়ে চলার তালে তালে। প্রাণ কেঁদে ওঠে, ডালে লতায় জড়াজড়ি ক'রে আবছা আলো-মাখা যে ঝোপ তৈরি করেছে সেই আশ্রয়খানির জন্যে।

বাজারের মোড়ে গাড়ি থামল। এসে গেছি হৃষীকেশে। হৃষীকেশ অনেক নির্জন হরিদ্বারের তুলনায়। সাধুসন্তরা এখানেই থাকেন বেশি, নিরালায় সাধন-ভজনের জন্য। তীর্থযাত্রীর ভিড় হয় অবশ্য। কিন্তু তারা আসে, চলে যায় ; থাকে না বড়ো।

হরিদ্বার দেখে মনে হয়েছিল, হরিদ্বার পাহাড়ের কোলে। হৃষীকেশ দেখি আরো তার কাছাকাছি, একেবারে বুকের কাছটিতে। বাড়ি ঘর রাস্তা ঘাট সবকিছুকে যেন আঁকড়ে রেখেছে বুকে—নীল আঁচল ঘিরে।

ত্রিবেণীঘাট। গঙ্গাস্পর্শ করতে নামলাম নীচে। জল বেশি বলে মনে হল না। ঘাটের সামনে অনেকগুলি কালো পাথরের মতো জড়ো করা ; জল উছলে উছলে ছুটছে তার উপর দিয়ে।

আটার গুলি নিয়ে বিরক্ত করছে ছেলের দল ; কিনতেই হবে। পাণ্ডাও সায় দেয় ; বলে, 'এখানে মছলিকে না খাওয়ালে তীর্থের কোনো ফললাভ হয় না।'

বলি, 'মাছ কোথায় যে খাওয়াব ?'

'ঐ তো মাছ', বলে পাণ্ডা আঙুল বাড়িয়ে দেখায়।

'ওগুলি মাছ!' অবাক হয়ে যাই। আমি যে আরও ভেবেছি, ওগুলি কালো পাথরের স্তূপ। এত মাছ। একটার 'পর একটা ওঠাপড়া করছে অনবরত স্রোতের মুখে। একেবারে নির্ভয়। পায়ের পাতা ডোবে না এমন জলে গড়াগড়ি দিয়ে বেড়ায়। এত বড়ো বড়ো শ্যাওলা-পড়া মাছ—কী জানি বেশিক্ষণ এদের দেখলে কেমন বিরাগ জন্মে মনে কোন্ দিন মাছ খেতে।

ঘাটে স্নান করছে, গীতা পড়ছে, কাপড়ও কাচছে সাবান দিয়ে পাণ্ডা বাসিন্দারা। সাবান মাখা বা কাপড় কাচা কড়াভাবে নিষেধ সকলের—ঘাটের উপরে কালো বোর্ডের গায়ে নোটিশ ঝুলছে বড়ো বড়ো অক্ষরে সাদা রঙ দিয়ে। গঙ্গার জল পবিত্র রাখতে বড়ো সতর্ক পাণ্ডারা যাত্রীদের বেলায়। সেদিন ব্রজরমণ হরিদ্বারে স্নান করতে নেমে মুখে জল ভরে কুলি করছিল। দেখে এক পাণ্ডা হৈ হৈ করে উঠল, বলল 'মুখ ধোবে তো ঘটিতে জল তুলে পাড়ে এসে মুখ ধোও, গঙ্গামাঈকে অপবিত্র করছ কেন ?'

ত্রিবেণীঘাটের উপরে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। সীতা-উদ্ধারের পর রামচন্দ্ররা চার ভাই এখানে এসে তপস্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেন। যুদ্ধে কত কত প্রাণী হত্যা করেছেন, পাপ খণ্ডন না করলে তাঁদেরও রেহাই ছিল না।

পূজারী প্রসাদ হাতে দিল, ছোট্ট ছোট্ট নকুলদানার মতো। যেন গুঁড়ি গুঁড়ি হাল্কা সাদা ফুল একমুঠো। এ ধরনের মিষ্টি এদিককার বাজারেও দেখি হামেশা। রঙবেরঙেরও করে। লাল হলুদ বেগুনি সাদা পর পর রঙ মিলিয়ে মুদির দোকানের আটা-ময়দার মতো ঝুড়ি ভরে সাজিয়ে রেখে দেয় দোকানের সামনে। দূর হতে দেখতে লাগে যেন নানা-রঙের-কাপড়-জোড়া বাহারের খোলা ছাতা এক-একখানা।

মন্দিরের আঙিনায় সিঁড়ি দিয়ে ঘেরা বাঁধানো কুণ্ড একটি। অনেক নীচে জল। কয়েকটা বানর শেষ সিঁড়িটা ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছিল কেবলই কেন জানি। দেখছিলাম

তখন হতে। হঠাৎ একটা বানর তড়াক্ করে জলে নেমে সাঁতার কাটতে লাগল এপার ওপার গা ডুবিয়ে।

বানরে সাঁতার কাটে ; এ তো বড়ো মজা! দেখি নি তো আগে আর। এই ঠাণ্ডায় শীত লাগে না ওর?

বড়দি যথারীতি নীচে নেমেছেন কুণ্ডের জল স্পর্শ করতে। মনে মনে প্রমাদ গণলাম, এখনি হয়তো ডাকবেন আমায়, নয়তো এনে খানিকটা ঠাসবেন মাথায়। ঠাণ্ডা জল, মাথা বেয়ে যখন টপ্ টপ্ গায়ে পড়তে থাকে—শীতের দিনে সে কী বিড়ম্বনা। যেখানেই যান বড়দি, সব-কিছু স্পর্শ করা, মস্তকে ধারণ করা চাইই তাঁর। বলেন, 'নয়তো এলাম কেন তীর্থে?'

জলে হাত দিয়েই বড়দি হেঁকে বললেন, 'আরে, এ যে দিব্যি গরম!'

শুনে তর্ তর্ করে সবাই নামলাম। সত্যিই, গরম জলের কুণ্ডই তো এটা। সেইজন্যই বানরটা এমন আয়েস করে সাঁতার কাটছে। পারলে তো আমিও নামি।

পাড়ের উপরকার গাছ হতে অশথপাতার রাশি জলে পড়ে কতক পচেছে, কতক সিদ্ধ হচ্ছে, কতক সদ্যঝরা টাট্‌কা একেবারে।

পাণ্ডা চোখ উল্টে, হাত ঘুরিয়ে বললে, 'এ গরম জল কোথা হতে আসছে কেউ বলতে পারে না।—সব্‌হি ভগ্‌বান কী লীলা হ্যায়।'

মন্দিরের বাইরে, পথের ধারে, বটগাছের তলায়, এখানে ওখানে ছোটো ছোটো ঘরে সর্বত্র সাধু ; বসে আছেন সবাই সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে, জটাজুট মাথায় নিয়ে। চলতে চলতে দেখি।

রাস্তার পাশে উলঙ্গ এক বৃদ্ধ সাধু খেলা করছিলেন ধুলো-মাখা আর-দুটি উলঙ্গ শিশুর সঙ্গে। বড়োটি হয়েছে ঘোড়া, ছোটোটি চাপবে তার পিঠে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না শিশু, উল্টে পড়ে যায় বার বার। সাধু তাকে তুলে বসিয়ে দেন ঘোড়ার পিঠে, উপুড় হয়ে আগলে থাকেন শিশু-আরোহীকে। ঘোড়া চলে হামাগুড়ি দিয়ে। ঘোড়া হাসে, আরোহী হাসে, সাধুও হাসেন খিল্ খিল্ করে। খানিক খেলে খেলা ছেড়ে চললেন সাধু আপন মনে সামনের রাস্তা ধরে, শিশুর মতোই হেলে দুলে, দু হাত ঝুলিয়ে।

দু-তিনটা মোড় ঘুরে ভরতজির মন্দির। শশী মহারাজ বললেন, 'ভরতজির মস্ত জমিদারি। ইনিই এখানকার রাজা ; আর সবাই প্রজা, স্বয়ং রামচন্দ্রজিও।'

ভরতের রঙও রামের মতো কালো। সাদা ধব্‌ধবে চোখ। নর্তকীরা নাচের আসরে নাচতে নাচতে এক সময় দু হাতে ঘাগরার দু কোনা তুলে মাথা পর্যন্ত দু পাশে ছড়িয়ে যে এক বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, ভরতেরও ঠিক সেই সাজ। ঝল্‌মলে ঘাগরা পায়ের নীচ হতে উঠে গেছে উপর অবধি ; এতখানি জায়গা-জোড়া সোনা-রুপোর জরিচুম্‌কির ঠাসা সাজ রাজকীয় ঐশ্বর্য ঢালে বৈকি দর্শকের মনে।

সামনে একটা চৌকিতে একগাদা রুপোর বাসন—গাড়ু থালা ঘটি বাটি। সোনার মতোও কী একটা চক্ চক্ করছে যেন। ভিতরটা অন্ধকার। লম্বা পিলসুজের মাথায় একটিমাত্র প্রদীপের শিখা কোনায় নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে। রেলিঙ-ঘেরা রাজাকে স্পষ্ট দেখা যায় না দূর হতে।

মন্দির পরিক্রমা করতে গিয়ে নজর পড়ে বাইরের দেয়ালের গায়ে। জায়গায়

জায়গায় উঁকি মারে খোদাই-করা মূর্তি, পদ্মলতার নকশা, ময়ূরের পুচ্ছ। পাথরের মন্দির ছিল এক কালে ; পুরু আস্তরের প্রলেপে ঢেকে কাটা কাটা পল তুলে ঝক্‌ঝকে নতুন মন্দিরে পরিণত করেছে আজ তাকে। দেখি আর ভাবি : আগে যখন যেখানে গেছি, যত মন্দির দেখেছি, বাইরেটাই দেখেছি ভালো করে। যত্নে তুলে নিয়েছি খাতায় ছাপ। পরিমাপ বুঝতে চেষ্টা করেছি মন মাথা দিয়ে। আর এবার মন্দিরে আসছি, ভিতরের বিগ্রহ দেখে মাথা ঠুকে ঠুকে যাচ্ছি একের পর এক। ঝোলার খাতা ঝোলাতে বন্ধ, খুলি নি একবারও। থমকে যাই। ঠিক করছি কি ভুল করছি দ্বন্দ্ব জাগে মনে। পা চালিয়ে যাত্রীর ভিড়ে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দিই নিজেকে।

তিন-চারটে সত্র আছে হৃষীকেশে সাধুসন্তদের জন্য। খোলা থাকে বারো মাস। পাঞ্জাবি সত্র ; নেপালি সত্র ; বাবা কালী কম্‌লেওয়ালার সত্র—বড়ো সত্র এইটাই। প্রকাণ্ড ধর্মশালা, বিরাট ব্যবস্থা। অসংখ্য ঘর ধর্মশালার চার দিক ঘিরে। অনেক সাধু এখানে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

বেলা সাড়ে দশটা। দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী, বাউল বৈরাগী এসে ভরে ফেলছে আঙিনা। একটা ঘরে হাঁড়ি হাঁড়ি পাতলা ডাল আর গামলা গামলা আটার রুটি। তাঁরা একে একে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন—কারো হাতে খর্পর, কারো হাতে কমণ্ডলু, কারো হাতে মালসা, কারো হাতে ঘটি। আটখানা করে রুটি আর দু হাতা করে ডাল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে তাতে।

এমন যে ভিড়, এত যে লোক—ধাক্কাধাক্কি নেই, হৈচৈ নেই, উচ্ছ্বাস উল্লাস নেই ; যে যার নামগান করতে করতে নির্লিপ্তভাবে এসে দাঁড়ান, খাবার নিয়ে তেমনিই চলে যান। একতারা বাজিয়ে এক বৈরাগী নেচে নেচে এসে ঢুকল, খাবার নিয়ে নাচতে নাচতেই বেরিয়ে গেল। যেন খাবারটা একটা উপলক্ষের বস্তুই নয়। 'খিদে পায়, খেতে হয়, নিয়ে গেলাম তাই'—এমনি একটা ভাব সবার।

দু বেলা এইভাবে খাবার দেবার ব্যবস্থা এখানে। এর আর অদল-বদল নেই, রুচি-অরুচি নেই। অনেক সাধু দূরের, বহু দূরের বনে জঙ্গলে গুহায় গহ্বরে থাকেন, দু বেলা আসতে পারেন না। সকালের জপতপের পর একবার বের হন ; হাঁটতে হাঁটতে আসেন গঙ্গায়, স্নান করে রুটি ডাল নিয়ে চলে যান। সারা দিনের মতো নিশ্চিন্ত।

এই সত্র থেকে সাধুদের কালো কম্বল দেওয়া হয় প্রতি শীতকালে।

এক পাশে আপিস-ঘর। ঘরে বারান্দায় খেরো-বাঁধানো মহাজনি খাতা নিয়ে বসে গেছে জন-দশেক কর্মচারী হিসাব কষতে। কত টাকা না জানি খরচ হয় রোজ এখানে। বর্তমান মহান্তও বসে আছেন সামনে। নির্দেশ দিচ্ছেন নানা কাজের। বাবা কালী কম্‌লেওয়ালার এইরকম সত্র আছে কেদারবদরী অবধি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে।

বাবা কালী কম্‌লেওয়ালার গল্প আছে—তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে কলকাতায় এসে গঙ্গার ঘাটে বসে রইলেন। এক শেঠ দেখেন, দিনের পর দিন যায় সাধু সে স্থান হতে নড়েন না, আহারনিদ্রাও করেন না। দেখে শেঠের মনে ভক্তি জাগল। একদিন কিছু ফল মিষ্টি এনে সাধুর সামনে ধরলেন। সাধু মাথা নাড়েন,

খাবেন না। শেঠ অনুনয় বিনয় করেন, 'কৃপা করে খাও একটু।' সাধু বললেন, 'খেতে পারি এক কড়ারে—যদি এক লক্ষ টাকা এনে দাও তুমি আমাকে।'

শেঠজি রাজি হলেন। এক লক্ষ টাকা এনে সাধুর হাতে দিলেন।

কেউ কেউ আবার বলেন, বাবা কালী কম্‌লেওয়ালা বাঙালি ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর কলকাতায় এসে হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় গ্যাস্‌পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন দুজন তিনজন করে ভিড় জমে যায় তাঁকে ঘিরে ; ঘোড়া থেমে থাকে, গাড়ি আটকে যায়, যান-চলাচল বন্ধ হয় পথে। পুলিস এসে তাড়া লাগায়। না নড়াতে পারে সাধুকে, না নড়ে ভিড়। সাধুর ঐ এক কথা, 'যতদিন না আমার পায়ের কাছে এক লক্ষ টাকা জমবে ততদিন এইখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকব, এক পা নড়ব না।'

সে যাক, দুটো গল্পের যেটাই সত্যি হোক, এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বাবা কালী কম্‌লেওয়ালা ফিরে এসে জায়গায় জায়গায় সাধুদের জন্য সত্র খুললেন। তিনি যখন তপস্যা করছিলেন তখন এই অসুবিধাই অনুভব করেছিলেন যে, তপস্যায় মগ্ন থাকলেও দেহরক্ষার জন্য অন্নজল ও শীতে গাত্রবস্ত্রের প্রয়োজন হয় সাধুদের এবং এই দুই বিনা যে দুঃখকষ্টের উদ্ভব হয় তাতে তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে। তাই সাধুরা যাতে নিশ্চিন্তমনে সাধনভজন করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করাই হল তাঁর প্রথম কাজ। বাবা কালী কম্‌লেওয়ালার সংকল্প সফল হল।

এক লক্ষ দিয়ে শুরু হল কাজ। পরে ঝরনার মতো টাকা এসে পড়তে লাগল নানা জায়গা হতে। পড়ছে এখনো। বিরাট বিরাট সত্র সব সচল হয়ে রইল বরাবরের জন্য। নির্ভাবনায় দলে দলে সাধুরা তপস্যায় বসলেন যে যার পছন্দমত স্থান বেছে নিয়ে।

কালো কম্বল গায়ে দিয়ে থাকতেন বলে নাম তাঁর বাবা কালী কম্‌লেওয়ালা। তাই সাধুদের কালো রঙের কম্বল দান করাই এই সত্রের রেওয়াজ।

শশী মহারাজ বললেন, 'আমাদের কুঠিয়া দেখবেন চলুন। আরো অনেকের কুঠিয়া সেখানে। গত বছর আগুন লেগে আটাশটা কুঠিয়া পুড়ে গেছে। আমাদের মিশনেরও দুটো গেছে সেইসঙ্গে।'

শহর পেরিয়ে ঢালু পথে নামলাম। খানিক যেতেই লোকালয় পিছনে ফেলে খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। যতই এগিয়ে যাই, সামনের জমি কেবলই ঢালু মনে হতে থাকে।

শংকরাচার্যের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির এখানে। যেন মাটির ভিতরে গর্ত করে মন্দিরটি বসানো। দূর হতে দেখে মনে হয়, আলগোছে কেউ মন্দিরের সাদা চুড়োটি বসিয়ে রেখে দিয়েছে সবুজ দূর্বাঘাসের উপরে। শশী মহারাজ বললেন, 'চব্বিশ সনের বন্যায় সব ডুবে গেল, বাড়ি ঘর ভাসিয়ে নিল ; কিন্তু মন্দির যেমন-কে তেমন, একটু এদিক-সেদিক হল না।'

জনমানব নেই কোথাও। সিঁড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা নীচে নেমে শিবের কাছে গেলাম। বাইরের আলো থেকে এসে সবই আঁধার দেখি। ঘোর কাটলে দেখি, এই চৌকো স্থানটুকুর এক কোনা ঘেঁষে এক সাধু বসে চোখ বুজে জপ করে যাচ্ছেন

একমনে। কে এল গেল ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো।

শংকরাচার্য দিগ্‌বিদিকে নিজের হাতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনশ্রুতি, সেইসবের এটি একটি।

প্রতি পদে হোঁচট খাই। চার দিকে পাথরের ছোটো বড়ো নুড়ি ছড়ানো। বোধ হয় মরা নদীর চড়া এটা। তাই হবে। মাঝে মাঝে সবুজ চাবড়া গাছগাছড়া। এক দিকে একটা বন ; অনেকটা বাব্‌লা-বনের মতো। হাল্কা হাল্কা পাতা ; যেন শুরু হতে না হতে মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়।

শশী মহারাজ বললেন, 'ওগুলি জংলি গাছ, আপনিই হয়। গরমকালে বেশ ঠাণ্ডা রাখে জায়গাটা।'

এদিকে বন, ওদিকে পাহাড়, মাঝখানে নদী। চমৎকার দৃশ্য।

কালো উঁচু পাহাড়ের সারি দীর্ঘ ছায়া ফেলে ঢেকে রেখেছে ঢালু জমিটুকুকে। পাহাড়ের পা ধুয়ে বয়ে চলেছে একটি ধীর জলধারা। সেই জলধারার তীরে ছায়ায়-ঢাকা স্নিগ্ধ মাটিতে সাধুরা বেঁধেছে যে যার কুঠিয়া নিজের হাতে। কেউ-বা খড়কুটো দিয়ে, কেউ পাথরের নুড়ি সাজিয়ে, কেউ মাটির দেয়াল গেঁথে, কেউ ধানের মরাই বেঁধে।

প্রথমে বুঝতে পারি নি। সরু উঁচু ধানের মরাইয়ের মতো ব্যাপারটা দেখে এগিয়ে গেলাম। এক পাশে কেবল ছোট্ট একটি ঝাঁপ-দেওয়া দরজা ; একজন মাত্র ঢুকতে পারে কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে। চলা শোওয়া চলে না তাতে। শুলেও হাঁটু মুড়ে। শশী মহারাজ বললেন, 'এগুলিতে খরচ কম। তাই অনেকেই এভাবে কুঠিয়া বানিয়ে বাস করেন।'

সাধু ছাড়া অন্য লোকের বসবাস নেই এখানে। তাঁরা প্রায় সবাই সত্রে গেছেন ঘরে ঘরে ঝাঁপ তুলে দিয়ে। ছোট্ট ছোট্ট কুঠিয়াগুলি বড়ো পরিপাটি। অবসর সময়ে গেরিমাটির প্রলেপ দিয়েছেন কেউ সাদা মাটির গায়ে। সীমাবদ্ধ আঙিনাটুকু সাজিয়েছেন নুড়ির সারি বসিয়ে। গাঁদাফুলের গাছ লাগিয়েছেন নিচু দাওয়া ঘেঁষে। করবী, পলাশ দু-চারটি এখানে ওখানে। মানুষ যেখানেই বাস করে, তার মনের সৌন্দর্য না ফুটিয়ে পারে না। ইচ্ছে হল, করবীর ঐ ঝির্‌ঝিরে ছায়া-আঁকা দাওয়ায় বসে নদী হতে এক আঁজলা জল তুলে চোখে মাথায় দিই।

নদীটির নাম চন্দ্রভাগা ; যেন সুশীলা কুমারী মেয়েটি, একমনে সেবা করে চলেছে সাধুদের।

সুন্দর পরিবেশ। অতি মনোরম স্থান। শান্ত, গম্ভীর। চুপি চুপি কথা কয় মা-ধরণী এখানে। ধীরে হাওয়া বয়, নিঃশব্দে নদী ধায়, নীরবে করে যার যা কাজ। স্তব্ধ দিগন্ত। তপস্যার অনুপম স্থান। বিরাট পাহাড়ের বুকপাতা নির্ভয়।

সংসারের হৈ-হল্লা এড়িয়ে এমন জায়গায় এসে একাকী থাকা—মনের এ আর-এক বিলাসিতা। ঈর্ষা জাগে তাঁদের প্রতি যাঁরা এসে পারেন থাকতে। মন জুড়িয়ে নেবার এ যে এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

হৃষীকেশ হতে স্বর্গদ্বার আরো মাইল-কয়েকের পথ। পথে একটা পুলের উপর দিয়ে যেতে যেতে শশী মহারাজ বললেন, 'চন্দ্রভাগাকে শান্ত বলেন—চন্দ্রভাগা নয়, হতভাগা। দুর্দান্ত নদী। হঠাৎ কখন খেপে ওঠে, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই-যে পুলের নীচে শুক্‌নো বালি-নুড়ি-ছড়ানো বিস্তীর্ণ ভূমি দেখছেন, এখানে শহর ছিল আগে। কোথায় গেল সেসব ; চিহ্নও নেই এখন। কেবল ঐ দেখুন, মাঝে মাঝে শহরের কুয়োগুলি তেমনি রয়ে গেছে ; বানের জলে আর সব ধুয়ে নিয়েছে।

'এই এক-একটি কুয়ো ঘিরে একদিন যে দালান কোঠা রাস্তা শহর ছিল সে জায়গা আজ নুড়িবালি-ঠাসা শুক্‌নো খট্‌খটে চড়া। উঁচু উঁচু বাঁধানো কুয়োগুলি এখানে ওখানে, যেন এক মহাশ্মশানের সাক্ষী সব।'

এক জায়গায় নুন-ভরা গাদা গাদা চামড়ার বালিশ স্তূপাকারে রেখে দিয়েছে ত্রিপল-ঢাকা দিয়ে। ছাগলের পিঠে এগুলি চাপিয়ে পাহাড়ে ওঠে পাহাড়ি ব্যবসায়ীরা। নিতে নিতে হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে এখানে নামিয়ে। ঘাসের খোঁজে নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে মুখ ঘসে বেড়াচ্ছে ছাগলের দল।

কতকগুলি কুষ্ঠরোগী ঝাঁক বেঁধে ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ি ঘিরে। মাছি ভন্‌ ভন্‌ করছে হাতে মুখে নাকে। পয়সা চাই, খাবার কিনে খাবে। কাছের একটা পাহাড়ের টিলায় কুষ্ঠাশ্রম। রাস্তায় এসে এমনি করে ভিক্ষে আদায় করার অনুমতি আছে এদের। কষ-বেয়ে-পড়া হাতে দাদা পয়সা তুলে দেন। এই পয়সাই হয়তো আবার টাকা ভাঙাতে গিয়ে নেব আমরা দোকানির কাছ হতে।

দাদা বললেন, 'কুষ্ঠ ছড়ায় না এতে করে ; রক্তে গিয়ে লাগলে তবে ভয়ের কথা—পড়েছি ডাক্তারি বইয়ে।'

গঙ্গার পাড়ে গাড়ি থামল। এপারের নাম রামতীর্থ, ওপার স্বর্গদ্বার। রামসাধু পাঞ্জাবি ছিলেন, অল্প বয়সে সিদ্ধিলাভ করেন। শিষ্যের দল বাড়তে থাকে একের পর এক, ঘিরে থাকে সারাক্ষণ গুরুকে। গুরুর ভালো লাগে না লোকের সঙ্গ। তিনি চান আপনমনে থাকতে। সম্ভব হয় না। শেষে একদিন সেই অল্প বয়সেই এখানকার এই উঁচু পাহাড় হতে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার বহু পরে এখানে কেউ ঘাট বাঁধিয়ে দেয়। রামসাধুর স্মৃতি জড়িয়ে তাই এর নাম রামতীর্থ।

রামতীর্থে একটিমাত্র খেয়ানৌকা, যাত্রী এপার-ওপার করে দিনভর। এও সেই বাবা কালী কম্‌লেওয়ালার ব্যবস্থা।

খেয়া পার হয়ে এলাম স্বর্গদ্বারে। যুধিষ্ঠিররা পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে স্বর্গের পথে রওনা হয়েছিলেন এই স্বর্গদ্বার হতেই।

বড়দি বললেন, 'এমন পবিত্র স্থান, তা ছাড়া পৃথিবীর মাটির সঙ্গে গঙ্গার সর্বপ্রথম যোগ এই পুণ্য ভূমিতে, এখানে একটা ডুব না দিলে চলে?'

সত্যিই, কী রূপ এখানে গঙ্গার! হাসি-উল্লাসের অন্ত নেই তার। সবুজে-নীল জলধারা বেগে ছুটে চলেছে—উদ্দাম গতি, উচ্ছলিত ভঙ্গি। যেন সেই সর্বনাশা প্রেমের ডাক শুনতে পেয়েছে কানে, যে ডাকের তাড়নায় কুলের বধূ বেরিয়ে পড়ে কলঙ্ক-ভয় ভুলে।

জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ফেলে দিয়েছে জলে। রাশি রাশি সেই কাঠ স্রোতের তোড়ে ভেসে চলেছে দল বেঁধে। এই কাঠই তুলে জড়ো করে হরিদ্বারে সেই

শুকনো নালাতে। কোথাও-বা কাঠগুলি একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে জলের ঘূর্ণিপাকে। কোথাও-বা আটকে যাচ্ছে পাথরে ঠেকে পর পর একটার গায়ে আর-একটা। সরকারের লোক এসে মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে দিয়ে যায় লম্বা বৈঠার খোঁচা মেরে। ভাসা কাঠের উপরে কাদাখোঁচার দলও ভেসে চলে। ঠুকরে ঠুকরে কী যেন খায় ভিজে কাঠের গা হতে। সাঁতার কাটে বেলে হাঁস নীল গঙ্গায় সাদা কালো পালক নিয়ে। দূরের পথে যেতে যেতে হয়তো হঠাৎ নেমে পড়েছে মাঝ-পথে।

স্নান করে উঠি স্বর্গদ্বারের বাঁধানো ঘাটে। ঘাটের এক পাশে শিবমন্দির, অন্য পাশে নারায়ণের। শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রসাদী কুম্‌কুম্ কপালে লেপে এলাম নারায়ণের কাছে। শ্বেতপাথরের নারায়ণ বসে আছেন যেন ধ্যানী বুদ্ধদেব ; তেমনি ভঙ্গি। নতুন ধরন। মুখের গড়নখানা সুন্দর।

খালি মন্দির। আশেপাশে কেউ নেই। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া। বড়দি বসে পড়লেন দেয়াল ঘেঁষে, নারায়ণকে সম্মুখে রেখে। বুঝলাম, সময় নেবেন তিনি।

পা টিপে টিপে চলে আসি বাইরে। বসে পড়ি ঘাটের উপরের মোটা থামটার গায়ে পিঠ ঠেস দিয়ে, গঙ্গাকে সামনে নিয়ে।

চারদিকের উঁচু নীল পাহাড়ের সারি মনে হয় কত হাল্কা, এখুনি যেন উড়ে গিয়ে মিশতে পারে নীল আকাশের গায়ে। জলে স্থলে আকাশে নীলের ছড়াছড়ি। যেন নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে এখানে সবটুকু। এত নীলের বাহার— মনকে স্তব্ধ আকুল করে তোলে। গায়ের আঁচলটা টেনে দু হাতে বুকে চেপে ধরি।

'তুমি এখানে বসে? আর আমরা কত খুঁজে মরছি।'

দেখি দাদা সামনে দাঁড়িয়ে। বললেন, 'ওদিকে খানিক এগিয়ে গীতাভবন, দেখবার মতো, দেখে এসো গিয়ে। আমরা এই দেখে এলাম।'

গঙ্গার ওপার হতেই দেখেছিলাম, বিরাট এক লাল প্রাসাদ, প্রশস্ত বাঁধানো ঘাটের উপর। সেই প্রাসাদই গীতাভবন।

কাছে এসে দেখি, গীতাভবনের সারা গা ছাওয়া, খোদাই করে লেখা পুরো গীতাখানা। লাল সিমেন্টের দেয়ালে সাদা রঙে ভরা খোদাই সংস্কৃত শ্লোকগুলি— চমৎকার এক বাহার দিয়েছে। মানানসই ভাগে ভাগ করা লেখাগুলি, উপর-নীচ আগাগোড়া। দূর থেকে অদ্ভুত একটা এফেক্‌ট্ দেয়। মনে হয়, না জানি কত কারুকাজ বাড়ির গায়ে। ভেবেও ছিলাম তাই ওপার হতে।

সামনে লম্বা ঢাকা বারান্দার দেয়ালে পর পর এক সার রঙিন ছবি, গীতার ব্যাখ্যা দেওয়া। টিনের পাতলা পাতের উপর তেলরঙ দিয়ে আঁকা। আঁকার কাজ চলছে এখনো। কলকাতা হতে শিল্পী 'সরকার' এসেছেন এক সাহায্যকারী ছাত্র নিয়ে। তাঁরা কাজ করছেন একটা ঘরে বসে। তেলরঙের কাজ শুকোতে সময় নেয়। একসঙ্গে পাঁচ-ছ'খানা ছবি শুরু করেছেন। কোনোটা শুকিয়েছে, কোনোটা শুকোচ্ছে, কোনোটায়-বা রঙ একেবারেই কাঁচা ; ঠান্ডা জায়গায় অন্তত পাঁচ-ছ দিন লাগবে শুকোতে। তেলরঙের মুশকিল এই, একটা রঙ ভালো করে না শুকোনো পর্যন্ত আর-একটা রঙ চাপানো যায় না তার উপর।

তাড়া দিলেন শশী মহারাজ এসে। 'গরুড় চটি' দেখতে যাবার কথা। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম গল্প, সেখানে নাকি এক ঝরনা আছে— উপর হতে গাছের পাতা

জলে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে 'ফসিল' হয়ে যায়। শুনে জেদ ধরেছিলাম, দেখাতেই হবে। তাই তিনি তাড়া দিয়ে বললেন, 'যেতে হবে অনেক দূর, আবার ফিরে আসতে হবে সন্ধের আগে। এখানে দেরি করলে চলবে কী করে?'

পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর নুড়ি মাড়িয়ে চলতে লাগলাম উঁচুনিচু রাস্তা ধরে।

পাকা গাঁথনির ছোট্ট ছোট্ট বহু কুঠিয়া স্বর্গদ্বারে। হৃষীকেশের চেয়ে স্বর্গদ্বার আরো বেশি নির্জন। লোকজনের বসতি নেই বললেই চলে। একান্তে যাঁরা সাধনা করতে চান তাঁরাই কেবল থাকেন এখানে। বাবা কালী কম্‌লেওয়ালা একশোখানা পাক্কা কুঠিয়া তৈরি করে দিয়েছিলেন এখানে। পাক্কা কুঠিয়া মানে— খুপরি একখানা ঘর, কোনোমতে শোওয়া-বসা যায়। অবশ্য যাঁদের গুহাগহ্বরে বসে তপস্যা করতে হয় তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো ঘরের কীই-বা প্রয়োজন। যেতে যেতে কত ধ্যানমগ্ন সাধু নজরে পড়ল। কেউ অন্ধকার ঘরে বসে, কেউ-বা সামনে ধুনি জ্বালিয়ে। বড়ো বড়ো পুরোনো গাছে ঢাকা কুঠিয়া, আমবাগানের ফাঁকে ফাঁকে সাধুর কুটির— যেন বইয়ে-পড়া তপোবনের মুনিঋষিদের আশ্রম, যেন বনবাসে সীতার ঘরকন্না। সুন্দর পরিচ্ছন্ন আঙিনা, ত্রিশূল ডমরু ঝুলছে ডালে। সাধুরা কেউ ঝরনার নালায় খাবার পাত্রখানা মেজে ধুয়ে রাখছেন, কেউ গঙ্গা হতে জল তুলে আনছেন, কেউ ছোট্ট দাওয়াটুকুতে বসে আপনমনে গুন্‌ গুন্‌ নাম গাইছেন। এ এক আলাদা জগৎ। কোন্‌ সুখের ইশারা পেয়ে সোনার সংসার ঝেড়ে ফেলে এখানে এসে এই ধূলির সংসার পেতে মগ্ন হয়ে আছেন সবাই— ভাবনা জাগে মনে।

বড়দি বললেন, 'যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি— তার কি কিছু ইঙ্গিত পেয়েছে তবে এঁরা? দেখছ না, কেমন সুখী-সুখী ভাব। আর আমরা কিসে কতখানি সুখ, আকুলিব্যাকুলি করেই মরি। বুঝে উঠতে পারি কই?'

মনে মনে আওড়াই—'যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্‌।'

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সংসার ছেড়ে বনে যাচ্ছেন ; পত্নীদের নানা ধন রত্ন গাভী দান করছেন— এই নাও, এই নাও।

মৈত্রেয়ী বললেন, 'এ নিয়ে কি আমি অমৃতা হব?'

'না।'

'এ নিয়ে?'

'না।'

'এ নিয়ে?'

'না।'

'তবে প্রভু, যা নিয়ে আমি অমৃতা না হব, তা নিয়ে আমি কী করব?'

'এই হল কেদারবদরীর পথ' শশী মহারাজ বোঝালেন দাদাকে। বললেন, 'পায়ে হেঁটে যেতে হলে এই পথ দিয়েই যেতে হয়।'

এখান থেকে একশো পঁয়ষট্টি মাইল মাত্র কেদারবদরী। ওপারে মোটর-রোড, দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত। এগিয়ে চললাম আমরা। গোরু ঘোড়া নিয়ে পার হয়ে যায় পাহাড়ির দল আমাদের আগে আগে। পিঠে ছেলে বেঁধে নেপালি স্বামী-স্ত্রী

হন্ হন্ করে পাশ কাটায় বিনা ভ্রূক্ষেপে। তরুণী ঘরণী অদৃশ্য হয় হাসতে হাসতে পাহাড়ের গা বেয়ে। শহর হতে ফেরে হাটবাজার করে গৃহস্থ মোট মাথায় নিয়ে। সকলেই আসে, চলে যায়; বাঁক ঘুরতে না ঘুরতে চোখের আড়াল হয়। আর আমরা কটি প্রাণী চলেছি তো চলেইছি। বলি, 'শেষ কোথায় এর?' সারা দিনের ঘোরাঘুরি, পা আর চলে না যেন। 'ও শশী মহারাজ, আর কত দূর?'

শশী মহারাজ ইতস্তত করেন; বলেন, 'এগারো বছর আগে এসেছি, ঠিক কতটা দূরে "গরুড় চটি" খেয়াল করতে পারছি না তেমন।'

সময়ে, এগারো বছর আগে যা অতি কাছে ছিল, এগারো বছর পরে তা দূরে চলে যায় বৈকি?

বড়দি বললেন, 'থাক্, দরকার নেই "ফসিল" দেখে। ফিরি চলো।'

এতখানি এসে সেই তো আবার এতখানিই ফিরে যাব; অথচ কিছু দেখা হবে না?

ঐ কী একটা শব্দ শোনা যায়—ঝর্ ঝর্, ঝর্ ঝর্। ঝরনার শব্দ না?

শশী মহারাজ ছুটলেন দিক লক্ষ্য করে। পিছনে পিছনে আমরাও ছুটি। হায় রে, পাহাড়ের শব্দ যেন মায়াবিনীর ডাক! কই, কোথায় কে? মাইল ফার্লং দেখা গোনা সব হচ্ছে, কিন্তু যাকে চাই তাকে পাই কোথায়?

আগুপিছু পা ফেলে চলতেই থাকি। চলতে চলতে এক সময়ে সচেতন হয়ে মুখ তুলে দেখি, ডান দিকের পাহাড় হতে ঝরনা নামছে এঁকে বেঁকে নালা বেয়ে।

শশী মহারাজ বললেন, 'যত দূর মনে পড়ে, উপরে উঠতে হবে।'

কিন্তু রাস্তা বাৎলাবে কে?

চটির এক পাণ্ডা বললে, 'চলে যাও সোজা উঠে। সেখানে এক মহাত্মা আছেন, তাঁকে বললেই পথ দেখিয়ে দেবেন।'

নালার পাশ ধরে ধরে উপরে উঠতে লাগলাম। বেশ খানিকটা উঠে পাতার ছাউনি-দেওয়া একটা খোলা কুটিরে এক সাধু পেলাম। সাধু বসে আছেন ধুনি জ্বালিয়ে, পাশে মোটা বৃহৎ শাস্ত্রগ্রন্থ, শুক্নো ডালের উপর মাটি হতে আলগা করে রাখা। কোমরে মোটা লোহার শিকল, তাতে কৌপীন বাঁধা। সাধু কথা বলেন না, স্থান ত্যাগ করেন না; 'আকাশবৃত্তি' সাধনা তাঁর। সামনে যা পড়বে তাই খেতে হবে; খাবার জন্য ঘুরে বেড়াবেন না।

ভাবি, লোকালয় হতে দূরে, কারো নজরে পড়বার সম্ভাবনা নেই—যাত্রীরাই বা জানবে কী করে? রোজ খাবার আসবে কোথা হতে? কী জানি! বেশি ভাবতে পারি না; ভেবে কূল পাই না। এ রহস্য বুঝবার শক্তি হয়তো আলাদা।

কিশোর অবিনাশ; বহু দিন তার খবর মেলে না। ছিল আমাদের কাছাকাছি; স্কুলে পড়ত; 'দিদি' 'দিদি' ডাকত—মায়া পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে নিখোঁজ হয়। সেদিন কত কাল বাদে সেই অবিনাশকে দেখি হরিদ্বারে। কত বড়োটি হয়েছে এখন—যুবক। কিন্তু সেই কচি মুখখানি ঠিক আছে তেমনি। দীক্ষা নিয়েছে। নিরালায় থেকে সে সাধনভজন করে। এবার আর 'দিদি' ডাক ডাকল না। সবাই তার 'মা'। বলে, 'এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা মা। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকার যে কী মাধুর্য, কল্পনা করা যায় না। "মাধুকরী বৃত্তি" নিয়েছিলাম পাহাড়ের গায়ে।

দিনে একবার মাত্র নেমে আসি ; "নমো নারায়ণ" বলে তিন বাড়ির দ্বারে গিয়ে দাঁড়াই ; যে দিন যা মেলে তাই খেয়েই দিন কাটাই। একদিন ধরতে গেলে কিছুই পেলাম না, কেবল খান-দুয়েক মাত্র রুটি। ফিরে এসে রুটি দুখানা সামনে ধরে কেঁদে ফেললাম। বড়ো দুঃখ হল। এমন খিদে পেয়েছে—এখন এইটুকু খাবার খেলে খিদে আরো বেড়ে উঠবে। সারা দিন-রাত্রি থাকব কী করে? তাঁর লীলা! কাঁদছি আর ভাবছি, এমন সময় এক গুজরাটি ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন, ব্রহ্মচারীজি, কৃপা করে এসে আমাদের কাছে ভিক্ষে পেয়ে যান।

'এ দেশে সাধুসন্ন্যাসীদের খেতে ডাকাকে বলে "ভিক্ষে পাওয়া"। গুজরাটি ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন সেই পাহাড়ে পিকনিক করতে।

'সেদিন রাত্রে আবার একবার কাঁদলাম—যে, কত সহজে তোমার উপরে রাগ করি প্রভু, না বুঝে।'

সাধুজি শশী মহারাজকে হাত নেড়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যেতে ইশারা করলেন। কুটিরের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে নীচে জলের নালা। এইই তবে সেই ঝরনা? ঝরনার উদ্দেশ পেয়ে মুহূর্তে শশী মহারাজ অন্তর্ধান হলেন। কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন—খোঁজাখুঁজি করি। বনের ভিতর হতে হাঁক শুনি শশী মহারাজ ডাকছেন, 'এদিকে আসুন, এই দেখে যান—'

ছুটে যাই। সেই আগের নালাই, সামান্য একটু চওড়া এখানটা। সর্ সর্ করে জল ছুটে চলেছে—পরিষ্কার, স্বচ্ছ।

'এই দেখুন, এই-যে পাতা পড়েছে ; কেমন জমে গেছে।' বলে একটা পাতা জল হতে টেনে তুললেন শশী মহারাজ।

জলে কী আছে জানি না। যে পথ দিয়ে জল ছুটেছে সে পথ শক্ত পাথর, যেন সিমেণ্টে বাঁধানো। যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই তা আরও ধব্‌ধবে শক্ত পাথরের নালা মনে হয়। পাহাড়ের শিখরে গহন বনের ভিতর ঝরনা, সেখানে ঢুকে দেখা অসাধ্য, পথ অনিশ্চিত। সেই ঝরনাই নালা হয়ে বয়ে আসছে। কত গাছের কত রকমারি পাতা পড়ছে জলে অবিরত। কতক চলে যাচ্ছে তোড়ের সঙ্গে ; যা আটকে থাকছে এটা-ওটাতে লেগে তা জমে পাথর-পাতা হয়ে থাকছে জলের নীচে, একটার গায়ে আর-একটা লেগে। দু পাশের ফার্ন ঝুলে পড়েছে জলে ; গোড়ায় কালো কাঠির গায়ে সবুজ পাতা, জলের গুলি সাদা পাথরের। উপরে কিসের একটা শক্ত প্রলেপ পড়ে যায় যেন ; কিন্তু মরে না গাছ। বুনো গাঁদার গোড়া ধুয়ে জল গেছে, গোড়া জমে গেছে পাথর হয়ে, ডগায় ফুটে আছে হলুদ দুটি ফুল।

এই জলই যখন নীচে নেমেছে, সমস্ত শক্তি খোয়াতে খোয়াতে নেমেছে। নীচে সে সাদাসিধে জল মাত্র এক কুণ্ড ভরা।

ফসিল তুলে কোঁচড় ভরি। দেখাতে হবে অভিজিৎকে, নয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে আমার কথা বাপ-বেটাতে মিলে।

বড়দি বললেন, 'এই তো গঙ্গোত্রী। কল্পনা করো—এইভাবেই তো গঙ্গা নেমেছেন ধরাতে।' বলে তিনি ঝরনার জলই তুলে খানিকটা মাথায় চাপড়ালেন।

এতক্ষণে শশী মহারাজের মুখে হাসি ফোটে। আমার তীব্র উচ্ছ্বাস তাঁকে খুশি

করে তোলে। বলেন, 'হল তো? এখন বিশ্বাস হল? এবার চলুন ফেরা যাক।'

লাফাতে লাফাতে নীচে নামি। ক্লান্তিবোধ আর নেই। হাসি গল্পে উল্লাসে কখন্ যে লছমন্‌ঝোলার পুল পেরিয়ে এপারে চলে আসি—এসে হুঁশ হয়, ফিরে দাঁড়াই।

লছমন্‌ঝোলার পুল, কত ছবি দেখেছি এর। দড়ির পুলে ছাগল ভেড়া পার হয়, খচ্চর টেনে আনে লোকে মুখের লাগাম ধরে, পিঠে ঝুড়ির বোঝা বয়ে আনে কুলি—কত কী। দু দিকে দুই উঁচু পাহাড়, নীচে খাদে গঙ্গার স্রোত। দেখলে মাথা ঘোরে। আর সেই পুল কিনা বিনা খেয়ালে পেরিয়ে এলাম!

শশী মহারাজ বললেন, 'এই পুল পার হওয়া মারাত্মক ব্যাপারই ছিল আগে। এক মারোয়াড়ি বহু টাকা খরচ করে বাঁধিয়ে দিয়েছে বছর কয়েক আগে। বুড়ি মাকে নিয়ে যাচ্ছিল সে কেদারবদরী। মা বললেন, এই পুল আমি পার হতে পারব না। আমি ততদিন বরং এপারেই থাকি, তুমি পুল বাঁধিয়ে দাও ভালো করে। বুড়ি এই পারে এই লছমন্‌জির মন্দিরের কাছে পুরো এক বছর অপেক্ষা করে রইলেন ; পুল তৈরি হল, তবে তিনি গেলেন কেদারবদরী।'

লছমন্‌জির মন্দির এপারে। দুশো বারো বছর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন লক্ষ্মণ এখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবধের দায়ে।

দাদা বললেন, 'ভাগ্যিস আজকাল কলিযুগে আর তেমন ব্রাহ্মণ জন্মায় না। লক্ষ্মণেরই যদি এই দশা, তবে আমাদের কী হত বুঝে দেখো একবার।'

লক্ষ্মণের মূর্তি শ্বেত পাথরের।

চার ভাইয়ের তিন ভাইকে দেখা হল, বাকি এখন শত্রুঘ্ন।

পাণ্ডা বললে, 'চলো-না, তাও দেখিয়ে দেব। আর-একটু এগিয়েই পথে পড়বে সেই মন্দির।'

দেখলাম। চার ভাইয়ের তিন ভাইই কালো, কেবল লক্ষ্মণ গৌর।

ব্রজরমণ বললেন, 'বর্ণনায় মিল হইল না। শত্রুঘ্নও গৌরবর্ণেরই ছিলেন ; কেবল ভরতজি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের মতো শ্যাম।'

ফিরে এলাম হরিদ্বারে। ট্যাক্সি রাজি হয় না কন্‌খলে যেতে। কী একটা ট্যাক্সের হাঙ্গামায় পড়তে হবে তাকে। মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিয়ে আশ্বাস দিল—'একটুকু হেঁটে গেলেই টাঙ্গা পেয়ে যাবেন।'

নিরঞ্জনী আখড়ার ভিতর দিয়ে ফিরছি। গভীর রাত। গঙ্গার পাড়ের বট-গাছটার তলায় জমাট অন্ধকারে পিছন ফিরে বসে এক নাগা বাঁ হাতে মুখে বাঁশি ধরে ডান হাতে ডমরু বাজাচ্ছে।

ধুনির আলোতে ঝিকমিকিয়ে ওঠে—ওটা কী, হাতে বাঁধা? সেই সেদিনের ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাটের সেই নাগা সন্ন্যাসীর সোনার তাগা।

দু-খাট-জোড়া ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলে উপুড় হয়ে পড়েছি দাদা আমি বড়দি। খুঁজে খুঁজে জায়গার নাম বের করি আর লাল-নীল পেন্সিলে দাগ কাটি। দাদা

'ব্র্যাড্‌শ' খুলে মিনিট ঘণ্টা স্টেশন মাইল টুকে নেন কালো চামড়ার নোটবুকে।

কুম্ভস্নান সারা হল, এবার দেশভ্রমণের পালা।

বড়দি বললেন, 'বেরিয়েছি যখন একবার, ফিরছি না সহজে। দিল্লীতে খোকন, ছোটোখোকা আছে ; তাদের দেখে আগে যাব মথুরা, বৃন্দাবন।

'বৃন্দাবনে কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। কাছাকাছি গিরিগোবর্ধন, বর্ষান, নন্দগ্রাম—সবই দেখব ঘুরে ঘুরে।'

দাদা বললেন, 'আচ্ছা।'

'বৃন্দাবন থেকে জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর—'

'চিতোরে কিন্তু বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।'

দাদা বললেন, 'থাকব।'

'পুষ্কর, দ্বারকা—এও তে মহাতীর্থস্থান।'

'দ্বারকায় দলে দলে লোক যাবে কুম্ভের ঠিক পরেই। আমরা তার আগেই গিয়ে ঘুরে আসি না কেন?'

দাদা বললেন, 'চলো।'

'অযোধ্যায়ও যাবার ইচ্ছে আছে এ যাত্রায়।'

'সে তো ফিরতি-পথে রাস্তায়ই পড়বে। তখনই নেমে দেখা যাবে। হ্যাঁ?'

দাদা বললেন, 'বেশ তো।'

'কী হচ্ছে এই সকালে তাঁবুর ভিতর বসে,' বলতে বলতে শশী মহারাজ ঢোকেন ভিতরে।

হাঁফ ছেড়ে দাদা উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'কতদূর অবধি যাবার ইচ্ছে সেই হিসেবই করে রাখছিলাম কালি-কলমে আগে হতে। জানেন না তো মেয়েদের মন! টানতে টানতে কোথায় নিয়ে ফেলবে শেষে। কথার বাধ্য হয়ে চলার তো মুশকিল ঐ।'

'তার পর? আবার ফিরে আসছেন কবে?'

'ফিরব কেন? স্নান তো হয়েই গেল। এবার দেশ বেড়িয়ে ঘরে ফিরব।'

'সে কী! কুম্ভে এলেন, কুম্ভের স্নান করবেন না?'

'অ্যাঁ!' আঁৎকে ওঠেন বড়দি। বলেন, 'এটা তবে কী করলাম? স্নান নয়?'

'স্নান তো বটেই, তবে কুম্ভের নয়,' বলে মাথা নাড়েন শশী মহারাজ।

স্নান সেরে পুণ্য অর্জন করে পা বাড়াচ্ছি চলতি-পথে ; জায়গায় জায়গায় চিঠি গেছে 'আসছি' 'আসছি' রব নিয়ে ; এখন এ কী শোনালেন আমাদের শশী মহারাজ!

বলি, 'এ দেখি বড়দি, তোমার সেই রূপা মিস্তিরির গল্প হল।'

বৃদ্ধ বয়সে রূপা মিস্তিরির লেখা শেখার বড়ো শখ। কোত্থেকে একটা স্লেট জোগাড় করে খড়িমাটি দিয়ে হিজিবিজি দু পিঠ ভরে লিখে রোজই একবার এনে ধরে, বলে, 'বাবু, দ্যাখেন তো, হইল কি না লেখা!' বাবু ঘাড় নাড়েন—'না।' রূপা মিস্তিরি মুখ কালো করে কেবলই স্লেটটা ওল্টায় পাল্টায়। বলে 'এতগুলি লেখা লিখলাম, একটা লেখাও হইল না এর মধ্যে?'

খালি তাঁবুতে জটলা করি বসে।

দাদা বললেন, 'তা হয় কখনো? এই দেখো-না খবরের কাগজের কাটিং রেখেছি; কাগজে বেরিয়েছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮ই মার্চ আর ১৩ই এপ্রিল এই তিন তারিখে তিন স্নান। যে-কোনো একটা করলেই হয়। ভিড় জমবার আগে স্নান করে ফিরে যাব, এই ভেবেই তো এসেছি গোড়ার দিকে। ঠিকই যদি না হবে, তবে কাগজে দেয় কখনো বিজ্ঞাপন?

জ্ঞান মহারাজকে ডেকে বড়দি শুধোন, 'আচ্ছা, এই-যে যোগটা গেল, এটাতে স্নান করাই তো কুম্ভের স্নান হল—না?'

শুনে হো হো করে হেসে ওঠেন জ্ঞান মহারাজ। বলেন, 'কুম্ভযোগ লাগেই নি এখনো পর্যন্ত। শিবরাত্রি আর কুম্ভ, দুটো আলাদা।'

হতাশ হয়ে ফিরে আসেন বড়দি। মনের সংশয় কাটে না। পূর্ণানন্দ, তত্ত্বানন্দ, রঘুবীরানন্দ, আত্মানন্দ—যত স্বামীজিকে সামনে পাচ্ছেন, কাতরভাবে বড়দি গিয়ে তাঁদের ধরেন, বলেন 'কুম্ভের প্রথম স্নান তো হয়েই গেল, নয়?'

তাঁর ভাবখানা, কেউ একবার ভুলেও বলেন যে, হ্যাঁ কুম্ভের স্নানই বটে।

উল্টে তাঁরা প্রশ্ন শুনে হেসে এগিয়ে যান, যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে আবার হাসেন।

বড়দির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

বলি, 'বাংলাদেশেও কি জানে সবাই এ তত্ত্ব যে কোন্ দিনে কী যোগ? না যদি জানে তো ভাবনা কী ফিরে যেতে? জানলে অবশ্য আলাদা কথা; কলঙ্ক রটবে যে, কুম্ভের নামে এসে কুম্ভস্নান না করেই ফিরে গেছি।'

দাদা বললেন, 'ঠিক কথা। হয়তো জানে না কেউ। নইলে সেই দেশেরই লোক হয়ে আমরা এমন ভুল করি কি করে? কেউ টের পাবে না; চলো, চলেই যাই।' বলে বড়দির মুখের দিকে তাকান দাদা, অনুমতি মেলে কি না সেখানে।

থম্‌থমে মুখে বড়দি ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলান—'উঁহু, তা কি হয়? কুম্ভের স্নান প্রথম কাজ, দেশ বেড়ানো দ্বিতীয়। এবার তো পাকাপাকি ভাবে জেনে নিয়েছি—১৮ই মার্চ কুম্ভযোগ শুরু, ১৩ই এপ্রিলে শেষ। পরেরটার দরকার নেই; ঐ ১৮ই তারিখের কুম্ভস্নান করতেই হবে যে করে হোক।'

'তার পর অত দেশ বেড়াবার সময় থাকবে কি হাতে?' ভাবনায় পড়েন দাদা।

আজ হতে ১৮ই, আরও তিন সপ্তাহের কথা। এক জায়গায় এতদিন বসে থেকে কী লাভ? সাধুসন্তদেরও ভিড় জমে নি তত এখানে এখনো যে তাঁদের দেখে দেখে দিন কাটানো যাবে। তার চেয়ে এই সময়টাতে যা হয় খানিকটা ঘুরে আসা যাক।

দাদা বললেন, 'কাটো তবে, নাম ধাম অর্ধেক কেটে বাদ দাও লিস্ট হতে। মোটামুটি কয়েকটা জায়গা রাখো কেবল, বাকিটা হবে আর-একবার, কপালে থাকলে।' ব'লে দাদা নোটবুক খুলে ফের নতুন করে ট্রেনের হিসাব টুকতে লাগলেন।

আমবাগানের প্রায় সবগুলি তাঁবুই এখন খালি। ভিজে মাটিতে পাতা চাটাইগুলি রোদ দেখিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে; আবার তো লাগবে কদিন পরে। শিবরাত্রি উপলক্ষে যাঁরা এসেছিলেন, চলে গেছেন অন্য তীর্থ ঘুরতে। বন্ধু মণিবাহাদুরও চলে গেছেন বৃন্দাবনে। বলে গেছেন বারে বারে, আমরাও যেন যাই সেখানে পূর্ণিমাতিথিতে।

শশী মহারাজ উৎসাহ দিলেন, 'যান যান, গিয়ে দেখে আসুন। হরিদ্বার হল জ্ঞানের জায়গা, আর বৃন্দাবন হল ভক্তির জায়গা। সেখানে সেই ভাব মনে রেখে সব দেখবেন। বৃন্দাবন তপঃক্ষেত্র। সেই কবে তিনশো বছর আগে মহাপ্রভুর শিষ্যরা সেখানে তপস্যার স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন ; আজও তা তেমনিই বহমান। সনাতন গোস্বামীর স্থানটা দেখে আসবেন। মনে সারক্ষণ তাঁদের সেই ভাবটা জাগিয়ে রাখবেন। ভক্তরা কী তদ্‌গতপ্রাণ হয়ে তপস্যা করেছে যে ভগবান এসে যখন বলেছেন—কী রেঁধেছ, নুন নেই খাব কী করে? ভক্ত বলেছে—খাবে খাও, না খাবে না খাও ; আমার যা আছে তাই দিয়েছি। কত বড়ো ভক্ত হলে সে ভগবানকে এমন কথা বলতে পারে। বৃন্দাবন সেইরকম তপস্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মন্দিরের উপর নয়।'

ঠিক হল তাই যাব। দোলপূর্ণিমায় বৃন্দাবনেই থাকব। কত দোল এল-গেল জীবনে ; কত রঙ খেললাম, মাখলাম—মাখালাম গায়ে ; কিন্তু রঙ নিতে জানল কে? আবির-মাখা শুভ্র কুন্দ হাত হতে খসে প'ড়ে লুটোয় পথের ধুলোয়। এবার দেখি সে রঙ কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় ব্রজের দোলখেলায়।

বড়দি বললেন, 'লেখো তো দেখি খাতায় ভালো করে, জ্ঞান মহারাজের কাছ থেকে শুনে, কেদারবদরী যাওয়া যায় কোন্‌পথে সহজ উপায়ে? এবারে না যেতে পারি, আর-একবার যাবই বদরীনাথ টানলে।'

জ্ঞান মহারাজ একবার নয়, আট-নবার গেছেন কেদারবদরীতে বিভিন্ন ঋতুতে। প্রত্যেক জায়গার নাম, কোথায় কোন্ জিনিসের কত দাম, রাত্রে কোন্‌খানে কী খাওয়া সুবিধের, মুটেরা কী বললে কী বলতে হবে—পাখিপড়ার মতো সমস্ত গুছিয়ে শিখিয়ে দিতে পারেন তিনি।

বড়দি বললেন, 'আচ্ছা, শুনেছি কেদারবদরীর দরজা যখন খোলা হয়, ছ মাস আগের ফুল বাতি নাকি ঠিক তেমনই থাকে? ফুল না হয় বুঝি, বরফে টাটকা থাকে ; কিন্তু বাতি থাকে কী করে?'

জ্ঞান মহারাজ বললেন, 'এ আর অসম্ভব কী? সেবার তিব্বতে গিয়েছিলাম—একটা মন্দিরে দেখি পাঁচ মোন ঘি ধরে এমন একটা প্রদীপ সোনার পিলসুজে বসানো ; উপরে সোনার ঢাকনি ঝোলা। শীতে ঘিটা জমে মোমবাতির মতো হয়ে যায়, প্রদীপ জ্বলতে বাধা থাকে না কোনো। কেদার-বদরীতেও তাই। বরফ পড়া শুরু হতেই প্রদীপে প্রচুর ঘি ঢেলে দরজা বন্ধ করে পান্ডারা চলে আসে ; বাতি ঠিক তেমনিই জ্বলতে থাকে।'

পাশে বসে বুড়িমা গল্প শুনছিলেন ; বললেন, 'হঁ, হঁ, এমনটি হয় আমিও শুনেছি। হবেক নি কেনে? ভগমানের ইচ্ছা তো সবই? কেমন, লয়?'

মানভূম থেকে এসেছেন এই বৃদ্ধা কুম্ভস্নান উপলক্ষে। বালবিধবা, শিবানন্দ মহারাজের শিষ্যা। বাপ দিয়ে গেছেন বিঘা-কয়েক ধানের জমি ; সম্বচ্ছরের ধান বিক্রি করে পাঁচ কুড়ি দু টাকা নিয়ে চলে এসেছেন একা এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। বলেন, 'ঠাকুরের কাছে এসেছি, অসুবিধেটা কী?' বড়ো ভক্তিমতী, সরলা, লজ্জাশীলা। পুরুষ দেখলেই ঘোমটা টানেন, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলেন। কেদারবদরীও ঘুরে এসেছেন এক ফাঁকে। বলেন, 'হেঁটেই গেইছিলাম। কত আর টাকা লাগে? আমার

তো প'চিশটেও লাগেক নি। দুখানা কম্বল নিজেই বগলে চেপে উঠে গেলোম। সঙ্গে আর-একজন বুড়ি ছিল ; হাঁটতে পারে না ; সে "কাণ্ডি"তে উঠল। সে কী কষ্ট মা কাণ্ডিতে! ঝুড়িতে বসিয়ে পিঠে নিয়ে যায় তো? ঝলর্ ঝলর্ ঝাঁকুনিতে গায়ের হাড়গুলোক সব আলগা হয়ে যায়।'

'বুড়িমা' বলেই ডাকি আমরা এ'কে। এখানে মাস-তিনেক থাকবার ইচ্ছে। কেবলই শুধোন, 'তোমরা আর কতদিন আছ? সবাই তো চলে গেল, কেবল তোমরা দুটি বাকি। তোমরা চলে গেলে আমি আর খেতে যাবোক নি রান্নাঘরে। একলা মেইয়ামানুষ, লজ্জা লাগে। ঠাকুরের মন্দিরে যাব, প্রসাদ লিয়ে চলে আসব। সঙ্গে ঘরের চিড়া মুড়ি চাছিগুড় আছে, তাইই খানিক খানিক খেয়ে লিব।'

কাছেই ছোটো একটি তাঁবুতে একলা থাকেন। রাত্তিরে আলো-বাতিরও প্রয়োজন নেই তাঁর। বলেন, 'অন্ধকারে চুপচাপ বেশ থাকি।'

বুড়ি মানুষ, যদি অসুখবিসুখ হয়ে পড়ে হঠাৎ—স্বামীজিদের বড়ো ভাবনা। তাড়াতাড়ি তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হন তাঁরা।

শুনে বুড়িমার মনে আঘাত লাগে। বলেন, 'কত আনন্দে আছি এখানে ; কত আনন্দ পাচ্ছি অহরহ। কিন্তু স্বামীজিরা যখন আমাকে পাঠিয়ে দিবার কথাটা বলে—বড়ো দুঃখ হয়। এতখানি আনন্দ যেন দুঃখে মিশে মিশে যাচ্ছে ; কেবলই "হরিষ বিষাদ" "হরিষ বিষাদ" লাগছে। ভাবছি তবে কি আমার টাকা নেই বলেই এমনটি হচ্ছে?'

বলি, 'টাকা থাকলে কী হত?'

'স্বামীজিদের দিতাম। খাওয়াতেও তো খরচ কম লয় আজকালকার দিনে?'

বলি, 'সে কথা কেন ভাবছেন? কে কাকে খাওয়ায়? সবই ঠাকুর করছেন, ঠাকুর খাওয়াচ্ছেন।'

'তুমি ঠিক বলছ? টাকার জন্য এ'রা তবে যেতে বলছেন না? আমার তবে ভুল ধারণা হয়েছিল—লয়? আচ্ছা, আর তবে অমনটি ভাববোক নি। দেখো-না, কেমন শান্তিতে আছি। ইচ্ছে হল, কোনোদিন ব্রহ্মকুণ্ডে, সতীঘাটে গেলাম ; লইলে যাই না, আখড়ার ঘাটেই গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসি। এসে মন্দিরে ঠাকুরপ্রণাম করে তাঁবুতে ঢুকে বসে থাকি ; নিশ্চিন্তে জপতপ করি। এমন নির্জন কুঠিয়া পায় কজনা বলো? তাঁর দয়াতেই তো পেলাম। এখন তিনি রাখেন থাকব, তিনি পাঠান চলে যাব। সেই তো ঠিক কথা। আর মিছে মন খারাপ করবোক নি।'

সময় যখন হাতে আছে, 'ঋষিকুল' দেখে আসা যাক। গুরুকুল তো দেখলাম, সেদিন। গুরুকুল ব্রহ্মচর্যাশ্রম আর্যসমাজের বিশ্ববিদ্যালয়। পঞ্চাশ বছরের জয়ন্তী হবে, বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসবেন ; মহাসমারোহের ব্যাপার। রাস্তাঘাট মেরামত হচ্ছে, প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে। প্রকাণ্ড কম্পাউন্ড ; এদিক ওদিক সব মিলিয়ে সতেরো শো বিঘা।

খালি গায়ে ল্যাঙট পরে নেড়া মাথা নিয়ে খোলা মাঠে ছুটোছুটি করছে গুড়ি গুড়ি একদল ব্রহ্মচারী। এক-এক লোটা গরম জল পাবে আজ সবাই মাথা সাফ করতে। তাই স্নানের আগে প্রতি অঙ্গে নাড়াচাড়া দিচ্ছে এইভাবে। সুন্দর স্বাস্থ্য

সবার। এ দেশে এইটেই বড়ো ভালো লাগে দেখে।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, ছুটি চলছে। ছুটিতে বাড়ি যেতে পায় না কেউ; একটানা কয়েক বছরের মেয়াদ এখানে। একদল ছেলে বাগানের ঝরা পাতা ঝাঁট দিচ্ছে, একদল জানলা-দরজার কাঠে রঙ লাগাচ্ছে, একদল শোবার ঘরের মেঝে জল দিয়ে ধুচ্ছে। কাঠের তক্তায় সতরঞ্চি-মোড়া গোটানো বিছানা। মাথার দিকে একটা করে দেয়াল-আলমারি, বই খাতা কাপড় জামা রাখবার। খাবার ঘরে সার সার চট পাতা; থালা গ্লাস নিয়ে বসে যাবে ছেলেরা খেতে, ঘণ্টা পড়লে।

বড়োদেরও বিভাগ আছে তিনটে—আয়ুর্বেদ, আর্ট্‌স্‌, আর বেদবিদ্যালয়। বিরাট বিরাট প্রাসাদ—'বিড়লা হল', 'হবন মন্দির', কত কী। কে একজন বাহাত্তর হাজার টাকা দান করেছেন কেবল একটা গোশালারই জন্যে। গোশালার দরজাই বা কী। যেন দুর্গের সিংহদ্বার। ঢালা টাকা চার দিকে, প্রতি ইঁটের গাঁথনিতে গাঁথনিতে।

ফটকের কাছে দোকান সাজিয়ে বিক্রি করছে দাঁতের মাজন, মাথার তেল, হজমি গুলি—নানান জিনিস; আয়ুর্বেদ-বিভাগের তৈরি।

সেবাশ্রমের পূর্বদিকে 'গুরুকুল', পশ্চিমে 'ঋষিকুল'। দুর্গাদত্ত শর্মা আর পণ্ডিত মালব্যজি এই দুজন ঋষিকুলের প্রতিষ্ঠাতা। বিধি ব্যবস্থা শিক্ষা দীক্ষা সবই প্রায় গুরুকুলেরই মতো। কিন্তু প্রাঙ্গণে ঢুকেই কেমন নোংরা নোংরা লাগল চার দিক। বারান্দায় শিশুব্রহ্মচারীর দল স্তবপাঠ করতে দাঁড়িয়েছে—কেউ কম্বল গায়ে দিয়ে, কেউ কোঁচার খুঁট জড়িয়ে। কারো পরনে গেঞ্জি প্যাণ্ট; কারো-বা স্নান হয় নি তখনো; বারান্দার নীচেই কলতলায় দাঁড়িয়ে থাবা থাবা তেল মাখছে গা মোড়া দিতে দিতে। ময়লা কাপড়, ছেঁড়া কম্বল, রঙ-ওঠা সতরঞ্চি এখানে সেখানে, মাছির ভন্‌ভনানি, ঠিক যেন রিফিউজি ক্যাম্প একটি।

ঋষিকুলের কাছেই শ্রীগুরুমণ্ডল-আশ্রম। শুনেছি এখানে পুরাতন পুঁথি 'হরিবংশ' আছে, হাতে লেখা।

বেলা দ্বিপ্রহর। ঘর বন্ধ করে চাবি নিয়ে চলে গেছে ঘর রক্ষক। আমাদের আগ্রহে একজন ছুটল চাবির খোঁজে।

আঙিনায় নারায়ণের মন্দির, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকি।

বারান্দার এক পাশে রঙবেরঙের পুঁথির ঝালর-ঘেরা ছোট্ট একটি পালঙ্ক—গ্রন্থসাহেব। এক শিখ মহিলা এসে গঙ্গাজলের ঘটিটা পাশে রেখে পালঙ্কে উঠে বসলেন। গঙ্গাস্নানের পর বাড়ি ফিরবার পথে দু পাতা গ্রন্থসাহেব উল্টে পাল্টে পড়ে যাবেন। প্রকাণ্ড বই। এই বই পড়াই এদের পুজো আর্চা সব।

টেনে পেটে বেল্ট আঁটা, শার্ট প্যাণ্ট পরা, ছোটো একটি ছেলে বারেবারে এগিয়ে আসছে, আর বিদেশী মুখ দেখে পিছিয়ে যাচ্ছে। বার-কয়েক এমনি করার পর এবার সে পা টিপে টিপে এসে ঝট্‌ করে পালঙ্কের নীচে ঢুকে মেঝেতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়েই দে ছুট এক নিশ্বাসে।

উঁকি মেরে দেখি, মোটা থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধুলো-মাখা ছোট্ট মুঠখানি চট্‌ করে শার্টের ভিতর ঢুকিয়ে বুকে কপালে বুলিয়ে নিল।

যে লোক চাবির খোঁজে গিয়েছিল, ফিরে এসে জানাল, চাবির অধিকারীকে পাওয়া গেল না খুঁজে। হয়তো বাজারে গেছে, কি গঙ্গার ঘাটে। 'হরিবংশ' দেখা ঘটল না।

আর সবই তো দেখা হল। চণ্ডীপাহাড়, মনসাদেবীর মন্দিরে দূর থেকেই প্রণাম জানিয়েছি। ঐ অত উঁচু পাহাড়ে বড়দির ওঠা বারণ। দাদারও হাঁটুতে ব্যথা, উঁচুনিচু জায়গা চলতে কষ্ট পান। আমি মেঘের গায়ে মন্দিরের চুড়োর দিকে একবার মুখ তুলেই দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছি। মা'রা দয়াবতী, ক্ষমা করবেন নিশ্চয় জানি।

কেবল দেখা বাকি বিল্বকেশ্বরকে। তা হয়ে যাক-না আজই। ক্ষতি কী?

ভোলাগিরি-আশ্রমের উল্টোদিকে বিল্বকেশ্বর। বরাবর সোজা রাস্তা। মন্দির পর্যন্ত টাঙগা যায়।

নেমেই আগে পড়েন কালভৈরব। কালভৈরব পথ ছাড়লে তবে বিল্বকেশ্বর।

সাদা ধুলোর পায়ে-চলার পথ এঁকে বেঁকে গেছে ; সেই পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে পেলাম বাঁধানো আঙিনা। তার এক ধারে একটা নিমগাছ, নিমগাছের তলায় বিল্বকেশ্বর।

আঙিনার এক ধারে একজন সাধক—শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফ, যেন সেকালের বর্ণনার মুনিঋষির ছবি। তিনি বসে শাস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছিলেন কয়েকটি ছাত্র সামনে নিয়ে। সেদিনের মতো শিক্ষা শেষ হলে যে-যার গ্রন্থ বেঁধে নিয়ে উঠে যেতে, আমরা গিয়ে তাঁর কাছে বসি। বিল্বকেশ্বরের পরিচয় জিজ্ঞেস করি।

তিনি বললেন, 'এঁকে জান না? এইই স্বয়ম্ভূ শিব ; সতীকে এইখানেই তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। নিমের জায়গায় আগে বেলগাছ ছিল। বিল্ববৃক্ষের নীচে তিনি প্রকটিত হয়েছিলেন বলেই বিল্বকেশ্বর নাম।'

সতীর তা হলে এই—এইখানটিতেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা হয়েছিল শিবকে দেখে। মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন সতী, ছদ্মবেশী শিবের মুখে ব্যঙ্গোক্তি শুনে। যাঁকে স্বামী-ভাবে পাবার জন্য তাঁর এই কঠিন তপস্যা, সেই শিবের নিন্দা শোনা অসহ্য সতীর পক্ষে।

সতীকে চলে যেতে দেখে শিব তখন নিজ রূপ প্রকাশ করে বললেন, 'যেয়ো না, ফিরে দেখো কে আমি।'

শিবকে দেখে সতীর তখন সেই অবস্থা—না পারে যেতে, না পারে থাকতে।

বিল্বকেশ্বর থেকে একটু এগিয়ে সতীকুণ্ড। দু দিকে পাহাড়, তার কোলের আড়ালে এই কুণ্ড ; এখন বাঁধিয়ে কুয়োর মতো করে রাখা হয়েছে।

পাহাড়ের গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ লিক্‌লিকে শুক্‌নো ঘাস ঝুলছে নিচুমুখে। কয়েকটা গাছ কেবল শিকড় ছড়িয়েছে, আঁকড়ে ধরবার অবলম্বন খুঁজতে। উপর দিকে ডাল নেই, পাতা নেই ; আলো-হাওয়ার জন্য আগ্রহ নেই। পাথর থেকে রস সংগ্রহ করতেই সবটুকু শক্তি ঢেলে দিতে হয়েছে তাকে।

এখানে এসে দাঁড়াতেই মনে ভেসে উঠল, পাহাড়ের ঝরনায় সতী আকণ্ঠ জলে জপ করছেন হাতের মালা ঘুরিয়ে—নন্দদার সেই ছবিখানি।

উপযুক্ত স্থান তপস্যাকে হয়তো সহজেই সফল করে।

সতীকুণ্ডের লাগালাগি খানিক উপরে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট গুহা। ভোলাগিরি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এই গুহায় বসে তপস্যা করে। গল্প শুনি, ভোলাগিরি যেদিন প্রথম এই গুহাতে ঢোকেন, বাতি জেবলে দেখেন সর্‌ সর্‌ করে একটা সাপ বেরিয়ে যাচ্ছে আলো দেখে ভয় পেয়ে। 'মত্‌ ভাগো বেটা' বলে ভোলাগিরি

হাতের বাতি নিবিয়ে দিলেন। যতদিন এই গুহায় ছিলেন আর কোনো দিন বাতি জ্বালেন নি। এখনো নাকি প্রকাণ্ড সাপ দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই। পাহাড়ি কাঠুরেরা আসতে-যেতে দেখে তাকে। মাঝে মাঝে সাপ বিল্বকেশ্বরের আঙিনা অবধি চলে আসে।

গুহায় ওঠবার পথ, সিঁড়ি নেই। আঁকড়ে-পাকড়ে উঠতে হয়। এইটুকুতেই আমাদের এত কষ্ট! আর এই ভাবেই তাঁরা ওঠা-নামা করতেন দিনের পর দিন। শখ করেই বেছে নিতেন দুর্গম স্থান।

সতীকুণ্ডের এপারের পাহাড়ের মাথায় ঘন বন। দু পাহাড়ের মাঝে নীচের মাটিতে কতকগুলি চালাঘর, স্ত্রী পুরুষ শিশু ছেলেমেয়েতে ভরা ; যেন হঠাৎ হয়েছে বসতি, হঠাৎই ভেঙে যাবে একদিন সব। কেমন অপল্‌কা ভাব! ফালি উঠোনে লম্বা একটা উনুনে এক সারি হাঁড়ি বসানো।

বললাম, 'বড়দি, দেখো দেখো—কী সুন্দর ব্যবস্থা! সমবায় রান্নার কী অদ্ভুত পদ্ধতি! নতুন জিনিস। আমরাও তো করলে পারি এমনতরো।'

টানতে টানতে বড়দিকে নিয়ে যাই সেখানে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা নয়, এমন পাঁচ-ছটা লম্বা উনুন উঠোনের এ-মাথা ও-মাথা জোড়া ; প্রতি উনুনে তিন তিন সারি হাঁড়ি ষোলো-ষোলোটা করে। এতগুলি হাঁড়ির ভাত এরা খায় কতজনে!

দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। কয়েকজন পশ্চিমা মেয়ে উনুনের দু দিকের দু মুখে ছোটো ছোটো শুক্‌নো কাঠের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভিতরে ফেলছে।

আরো কাছে এগিয়ে যাই। ভাত তো নয় ; হাঁড়ি-ভরা কাঠের টুকরো সিদ্ধ হচ্ছে ফুটন্ত জলে। খয়ের তৈরি হচ্ছে।

পাহাড়ের মাথায় যে বন, সেই বনেই খয়ের-গাছ। ছেলেরা টুকরো টুকরো করে কাঠ কেটে দিচ্ছে, মেয়েরা পিঠে বোঝা চাপিয়ে এনে নীচে ফেলছে। রাশি রাশি খয়ের-কাঠের স্তূপ। জলে ফুটিয়ে কষ বের করে সেই কাঠই রোদে শুকিয়ে আবার জ্বালানির কাজে লাগে। জ্বালে জ্বালে জল মেরে ঐ কাঠ-সিদ্ধ জল শুকিয়ে যে ক্বাথ তৈরি হয় তাই হল খয়ের। খয়ের তৈরি হতেই হাঁড়ি-সমেত তুলে নিয়ে ঢোকায় চালাঘরে। এক ফোঁটা এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কড়া পাহারা।

মনে হল মার কথা। কিছুটা খয়ের যদি নিতে পারতাম তাঁর জন্যে। নয়তো ফিরে গিয়ে যদি বলি তাঁকে যে, খয়ের তৈরি করা দেখে এলাম এবারে—মা কি আমার মুখ দেখবেন কদিন? কথা বলতে গেলে কেবলই এঘর-ওঘর ঘুরবেন, অকারণে ভাঁড়ার-ঘরের শিশি বোতল নাড়াচাড়া করবেন, কলসীর সরষে কুলোতে ঢেলে ফিরে ফটাফট্ ঝাড়বেন। রাগ কমলে শেষে বলবেন, 'একটু ভালো খয়ের পাই নে কতকাল, বালিমাটির ভেজাল, তাও পাঁচ টাকা করে সের। ওখানে খাঁটি জিনিস, শস্তাও তো হত কিছুটা! খানিক আনলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি এমন অশুদ্ধ হত?'

সেবার জামসেদপুর গেলাম। মার কী রাগ! বলেন, 'যুদ্ধের বাজার, পেরেক পাই নে মশারি টাঙাতে। সে জায়গা শুনি লোহার জায়গা, দুটো পেরেকও তো আনতে হয় মেয়ের মনে করে।'

বড়দি তাড়াতাড়ি একটা কুটো কুড়িয়ে, খয়েরের হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছে যে লোকটা তার পিছনে ছুটলেন—'এ বাবা, হামলোক বাংলা মুলুকসে আয়া। থোড়া খয়ের

দেখনে কে লিয়ে দিজিয়ে' বলে হাতের কুটোটা এগিয়ে ধরলেন—যদি একটু খয়ের তাতে চেঁচে দেয়।

লোকটা দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে, 'দেখনা হ্যায় তো দেখ লেও হিয়াঁসে' ব'লে দূর থেকে হাতের পাঞ্জা মেলে ধরল।

বিরসবদনে বড়দি হাতের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'দেখলে, দিল না একটু। চেখে দেখতাম টাটকা খয়ের কেমন খেতে।'

পথে ঘাটে ভিড় বাড়ছে ক্রমেই। খোলা জমি যা ছিল আশপাশে, সবেতেই ডেরা উঠছে এ-বেলা ও-বেলা।

দোকানিরা ঘরের বারান্দা যতটা পারে বাড়িয়ে নিচ্ছে কাঁচা কাঠের তক্তা বেঁধে। নতুন উনুন পাতছে কাঠকয়লা-পাথরকয়লার, আলাদা আলাদা। খানিক অন্তর-অন্তরই অন্নসত্র খোলা হচ্ছে সাধুসন্তদের জন্য। এখন নাকি আসল ভিড় বৃন্দাবনে। দোলপূর্ণিমার পর সবাই চলে আসবে হুড় হুড় করে। ভাবি, এখনই যদি এই, তখন না জানি কী হবে। এক সুবিধে এই, রাস্তা গলি চিনে নিয়েছি আগে হতে। হারাবার ভয় থাকবে না অন্তত।

তামার পুষ্পপাত্র হাতে এক পূজারী হেসে এগিয়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন। সুন্দর সুডৌল মুখ, মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে গেরুয়া গরদ ; বড়ো চেনা-চেনা যেন।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়—আরে! এ যে সেদিনের সেই ভদ্রলোক, যাঁর বাগানে ফুলে-ভরা নাসপাতি গাছ প্রথম দেখি। কিন্তু এ কী? সেদিন ছিল গৃহীর বেশ, আজ সাধুর সাজ!

তিনি আজও সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাগানে। বাগানের ভিতরেই ছোট্ট একটি কুঠরি এঁর বাসস্থান। চিক-ফেলা আধো-অন্ধকার ঘর। নাম প্রয়াগদাস অবধূত। উদাসী-সম্প্রদায়। পিতা বর্মাতে বড়ো ব্যাবসা করতেন, একমাত্র সন্তান ইনি। একুশ বছরে গৃহত্যাগ করে তেইশটি বছর সমানে সাধনা করেন। এখন অনেকটা গৃহীর মতো, পিতৃধনে জমিজমা কিনে বাগান করে সাধু-সেবা করছেন। রাস্তার ওপারে বাড়ির সামনাসামনি যে পতিত জমিটা আছে সেখানে অন্নসত্র খুলবেন ; শুভ কাজের শুরুতে আজ সেখানে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, এমন সময়ে দেখা আমাদের সঙ্গে। বললেন, 'এসো মাঝে মাঝে সময় সুবিধে পেলে।'

মোড়ের পানের দোকানে দোকানি শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে—'জয় হনুমান কি বীর হনুমান, বীর হনুমান কি জয় হনুমান।'

দু-আনার খিলিপান কিনে নিলাম সেখান হতে।

রাত্তিরে খাবার পর রান্নাঘর হতে তাঁবুতে ফিরছি, বুড়িমা বড়দিকে বললেন, 'হাঁ মা, তোমাকে তো দেখছি, রানু-মাকেও দেখছি ; দুজনেই বড়ো ভালো। আচ্ছা, তোমার ভাইটি কেমন মা?'

একমুখ হেসে বড়দি বললেন, 'ভাইটিও আমার বড়ো ভালো।'

বুড়িমা বললেন, 'তা বলছি না। বলছি, ভাইটির ধর্মজ্ঞান আছে তো?'

বড়দি বললেন, 'তা আছে বৈকি?'

'তবে যে সে সঙ্গে এল না?'

বিব্রত বড়দি ঢোঁক গেলেন; বললেন, 'না—তা আসত বৈকি? তবে কাজকর্মের চাপ, অবসর নেই—'

'না না, সে কথা শুধোচ্ছি না', বলে বুড়িমা বার-কয়েক আমার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বড়দিকে বললেন, 'এই বয়েস—বলি, বিচ্ছেদ তো লয়?'

নতুন দিল্লীর কী আকর্ষণ ভেবে পাই নে মনে। রঙিন ফুলের ঝোপে ঝাপে ঘেরা, বড়ো গাছের পাহারায় সবুজ লনের যেন এক-একটি বন্দীশালা। না দেখা যায় জানলা থেকে পাশের বাড়ির উঠানে বাসি বাসন মাজে বুড়ি ঝি; না দেখা যায় ছাদের উপরে প্রতিবেশীর মেয়ে, পিঠ-ভরা ভিজে চুল শুকোয় নখ-আঁচ্ড়া দিয়ে-দিয়ে; না শোনা যায় শাশুড়ি-বউয়ের কলহের কোনো কলরব দেয়ালের ওপাশ হতে; না শুনতে পাই ছ্যাকড়া গাড়ির কান জ্বালানো ঘড়্ঘড়ানি, ট্রাম-বাসের ভক্-ভকানি, ফেরিওয়ালার চিৎকার, কৃষক-মজদুরের উচ্চ ধ্বনি দল বেঁধে মিটিঙে যাবার পথে।

বিছানায় শুয়ে মনে মনে ভাবছি আর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি জানলার দিকে। ভোরের আলো আর ফোটে না তাতে। কী হল আজ? সাড়া যে পাই নে কারও। সেজদির বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলিতে কত তো পাখির বাসা; রাত না পোহাতে ঘুম ভাঙে তাদের ডাকে। তারা জাগে না কেন এখনো? কেবল একটি ঘুঘু ডাকছে থেকে থেকে ঐ প্রান্ত হতে—ঘুঘু-ঘু, ঘুঘু-ঘু।

সেজদির মা বলেন, 'ঘুঘুর ডাক ঘুম পাড়িয়ে দেয়।' চোখ বুজে একমনে শুনতে লাগলাম—ঘুঘু-ঘু, ঘুঘু-ঘু। উঃ, কী কষ্ট! বুকের ভিতর যন্ত্রণা যেন পাক খেয়ে খেয়ে গুমরে ওঠে ঐ ডাকে।

বিছানা ছেড়ে বাইরে উঠে আসি।

যেন কী চাপা দুঃখ চার দিকে।

ভোর হয়েও হয় না, পাখিরা জেগেও গান গায় না। এত যে রাশি রাশি সুগন্ধি ফুল বাগান-ভরা, একটি মৌমাছির গুঞ্জন নেই কোথাও। কেবল কটা ছাতারে পাখি ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে মাঠে; খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে ঘাস থেকে ধরে। এদের যেন সুখদুঃখবোধ নেই কোনো। ফিরেও তাকায় না কেউ ভুলে এদের দিকে। ধুলোর রঙের পাখি, গোল গোল ট্যাপাটোপা গড়ন, দেখলে বরং বিরক্তিই লাগে। না আছে রূপ, না গুণ। বসন্তের নানা রঙের বৈচিত্র্যে, নানা কাকলির জলসায় স্থান কোথায় এ-হেন ছাতারেদের?

সকলের অবহেলা-অনাদরে দূরে সরে গিয়ে তাই বোধ হয় এরা কয়েকটিতে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে নিজেদের মধ্যে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত, ভ্রূক্ষেপ নেই। স্তব্ধ হয় না দুঃখে আতঙ্কে। ছ-সাতটিতে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় আনাচে কানাচে, আঁধারে অলক্ষ্যে। 'সেভেন সিস্টার্স্' আর-এক নাম তাই এদের, ইংরেজী মতে।

সাত বোন। ভাবি, কোন্ অভিমানে এমন নির্বিকার হতে পারল এরা? অভিমান না আঘাত?

হঠাৎ অনুশোচনা জাগে। না জেনে কত দোষ করি মুহুর্মুহুঃ। এই সাত বোনকে কী বিষ নজরেই না দেখেছি এতকাল! রান্নাঘরের পাশে পালংশাকের খেত-টুকুর উপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে দল বেঁধে, 'দূর দূর' করে তেড়ে গেছি মারতে, দু হাতে ঢিল পাটকেল নিয়ে। আজ সাত বোন কী মায়া ছড়াল মনে! যেন এই ক্ষণেরই উপযুক্ত সংগী তারা, অপেক্ষা করে করে পরিচয় দিল এতদিনে।

গুমোট বেঁধে আছে চার দিকে। ঘরে বাইরে স্তব্ধতা। এক ঝলক হাসি নেই কোথাও। জানি, এ থাকবে না বেশিক্ষণ। তবু এই কটি মুহূর্তে বেদনাই যে অপরিসীম।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি বোধ হয় পড়ছিল এতক্ষণ। মাথার চুল বেয়ে জল গড়াচ্ছে, শাড়ি চাদর ভিজে লাগছে। পায়ের নীচের ঘাসে জলের ফোঁটায় মুক্তো ধরে আছে। মন খুশি হয়ে ওঠে।

চোখের জলেই যে চাপা ব্যথা হাল্কা করে নিতে হয়, অন্য উপায় নেই তা ছাড়া। বলি, কাঁদো ধরিত্রী, আরো কাঁদো; চোখের জলে ভাসিয়ে দাও সব আর-একবার। তবেই না হাসি ফোটাতে পারবে মুখে। নয়তো এমন করে গুম্‌রে কান্না—দেখতেও বুক মুচ্‌ড়ে ওঠে।

দেশ থেকে চিঠি এল, মেজদি লিখেছেন, ভৈরবের জলে ভেসে গেছে সানুদিদির স্বামী, ছোটো পিসিমার ভাই; অতসীর বোনঝির উপযুক্ত ছেলে—বিধবার একমাত্র সম্বল; আর রাঙাবোঠানের মেয়ে রাখীর স্বামী পুত্র দুইই। কোলের ছেলেটা মাত্র দেড় বছরের। প্রফেসর জামাই ছুটি নিয়ে এসেছিল স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে যেতে। ভৈরব-পুল পার হতে পেল না; ট্রেন থামিয়ে দস্যুর দল মেরে কেটে ফেলে দিয়েছে জলে, উপর থেকে প্রায় সবাইকে।

আর পারি না পড়তে। কোল থেকে ছিনিয়ে নিল ছেলেটাকে! আহা রে! রাখীটাকেও কেন শেষ করল না সেইসঙ্গে। তাকে কেন বাঁচিয়ে রাখল বুকে শেল গেঁথে?

কী যা-তা হচ্ছে চার দিকে। প্রাণের যেন মূল্য নেই কোনো; নিলেই হল যেমন তেমন করে। খবরের কাগজ পড়তে আতঙ্ক হয়; চিঠি এলে খুলতে ভয় পাই। ইচ্ছে যায় আরো, আরো দূরে পালিয়ে বেড়াই—কিছু না যেন পেঁছয় এসে কানে। ছট্‌ফট্ করি ঘরে বারান্দায়; ঘুরপাক খাই পথে মাঠে। কান বন্ধ করি দু হাতে চেপে, চোখ বুজে থাকি প্রাণপণ শক্তিতে। কিন্তু হায়! সোজা এসে ভিতর-দরজায় যে সে আঘাত হানে। এড়াবার পথ কই?

বলি, 'চলো, বড়দি, ফিরে চলো। আর ভালো লাগছে না তীর্থ ঘুরতে।'

লোকে বলে মন সুস্থির করতেই তীর্থে আসা; তবে কেন উতলা হয় এমনভাবে ঘরের সেই কোণটুকুরই জন্যে?

একই উত্তর শুনি বারে বারে—একেই তো বলে মায়া; এই মায়াটুকু কাটাতে

পারা চাই, তবেই মুক্তি।

কী দরকার আমার তেমন মুক্তিতে? ভীরু মন বিদ্রোহ ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে শাসিয়ে ওঠে— চুপ, যা বোঝ না তা বোলো না মুখ ফুটে।

মন আকুল হয়ে ওঠে আমার বৈষ্ণবী সইয়ের জন্যে। কাছে পেতাম যদি তাকে এখন! মনে হয়, তার কথা আমি যেন বেশ বুঝি। তার পথ যেন দিনের-আলোয়-দেখা পরিষ্কার পথ।

কিছু নয়, কোনো কথা নয়, পাশে বসে সই গান গেয়ে যেত যদি তো শুনতাম চোখ বুজে। তার গানই তার মনের ভাব, মুখের ভাষা।

আসবার আগে তার সঙ্গে আমার দেখা এক নিরালা দুপুরে।

ছবি আঁকতে আঁকতে মন কেমন করে উঠল, হাতের তুলি মাটিতে নামিয়ে দুপুর-রোদ্দুরে বাইরে এসে বসলাম উঠোনের আতা গাছটার নীচে। গোবরজলে নিকোনো বাড়ির পিছনের এই ছোট্ট উঠোনটি আমার অবসর মনের বিলাস-আশ্রয়। ঘুরি ফিরি, দাঁতে কাঠি কাটি, আর এখানে ওখানে বসে মাটিতে হাত বুলোই। গোবর-নিকোনো মাটিটুকু যেন আমার শিশুকালের মার কোলখানি।

কিছুদিন থেকেই দেখছিলাম, ছোট্ট শুক্‌নো ডালের মতো কী যেন একটা গাছ উঠছিল মাটি ফুঁড়ে। পাতা গজাতে পারে না ; মুন্নি তার উপর দিয়েই খর্ খর্ করে খড়কে ঝাঁটা চালিয়ে গোবর-জল টেনে নেয়। মাটি গোবর গায়ে শুকিয়ে শুক্‌নো কাঠি পুরু হয়ে ওঠে। বেখাপ্পা ডালটা— রেগে সেদিন দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম নর্দমায়। আজ দেখি লিক্‌লিকে একটি নরম ডাল গজিয়েছে সেখানে ; গায়ে কয়েকটি লাল লাল পাতা, এখনো স্পষ্ট মেলে ধরে নি নিজেদের। ঝুঁকে পড়ে দেখি, সদ্যোজাত শিশুর খুদে হাতের লাল আঙুলের ডগাগুলি যেন— তিনটি করে পাতা। বেল গাছের চারা। কী প্রাণশক্তি! পা দিয়ে মাড়িয়ে চলেছি, ডাল মট্‌কে ভেঙে দিয়েছি, গোড়া কেটে উপ্‌ড়ে ফেলেছি ; তবু মরে নি। বসন্তের আগমনে সে তার কিশলয় মেলে ধরেছে কখন এক ফাঁকে।

'মরিয়া না মরে সই, এ কি হৈল জ্বালা।
গলেতে তুলিয়া রাখো এ কণ্টকমালা॥'

গানের সুরে চম্‌কে পিছন ফিরি। কখন এসে সই বসেছে পাশে, টেরই পাই নি। সই হাসছে মিটি মিটি। মুখে তার হাসি লেগেই আছে। এ হাসির চির-ধারা সে পায় কোন্ শিখরের চুড়ো হতে জানতে ইচ্ছে যায়। সই হাসে আর গায়—

'আকুল শরীর আজ বে-আকুল মন।
বাঁশির শবদে বুঝি আউলাইলো বান্ধন॥'

ছোট্টখাট্টো মানুষটি আমার সই। নানা কথার নানা ফাঁকে বুঝতে পাই, আদরের ঘরের দুলালী সে ছিল একদিন। কিন্তু আজ কোনো দুঃখ নেই মনে সেজন্যে। যেচে যদি আরো কিছু বেশি জানতে চাই, সই হেসে বলে, 'ও আমার পূর্বাশ্রম, নাম বলতে নেই।'

রমু বলে, 'কী রঙ তোমার সইয়ের মামিমা ; বুড়ো হয়েছে, এখনো যেন ফেটে পড়ে। না জানি কী ছিল বয়েস-কালে।'

সে কথা ভাবি আমিও। খুদি খুদি পাকা চুলে ভরা নেড়া মাথা, যেন বর্ষার ফোটা কদমফুলটি। দাঁত নেই একটিও। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। তবু কী তার নাক-মুখ-থুতির গড়ন! কী বা তার চোখ ভুরু! সেদিনের সে ছবি জ্বল্ জ্বল্ করে সারাক্ষণ চোখের সামনে। বলেছিলাম, 'সই, বাপ-মার সেই সুখের নীড় ছেড়ে কেন বেরিয়ে এলে? কচি বয়সে কী ভুলই না করেছিলে!'

'ভুল! ভুল বল তাকে তুমি?' সইয়ের হাসিমুখ থম্ থম্ করে উঠল, সাদা কপালে কালো ভুরু দুটি টংকার দিল; দু চোখের কালো মণি দুটিতে যেন দপ্ করে দুই প্রদীপশিখা জ্বলে উঠল। সেই শিখার আলো আমার মুখে স্থির ফেলে সই গান ধরল—

'প্রেম নয়, পিরিতি নয়, বাদিয়ারি তন্ত্র।
কেলে সাপে খেলে পরে নাহি মানে মন্ত্র॥'

আজ প'রে এসেছে সই কালো রঙের ডুরে শাড়ি একখানা। দেখে হাসি চাপতে পারি না। বলি, 'মানিয়েছে ভালো!'

সই বলে, 'ঘোষেদের বাড়ির ছোটো ছেলের বিয়ে হল; নতুন বউ শখ করে শাড়িখানা আমায় পরিয়ে দিলে। বউরা আমার সাজ দেখে কৌতুকে হাসাহাসি করে। মনে মনে আমিও হাসি। জান, যেদিন প্রথম তাঁর হাত ধরে পথে বের হই—পরনে ছিল আমার সাদা ডুরে শাড়ি। আর আজ—

'কলঙ্কেরি কালি আমি সর্বাঙ্গে মাখিয়া।
কালিয়া বঁধুরে হিয়ায় রেখেছি ঢাকিয়া॥'

গাইতে গাইতে কালো ডুরের আঁচলখানি টেনে ভালো করে গায়ে সই জড়িয়ে নিল।

বলি, 'রাগ হয় নি কি তোমার কখনো তার উপরে? ফেলে চলে গেল এমনি করে?'

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে সই বললে, 'মিছে বলব না, নিজেকে নিয়ে বড়াই করব না। হয়েছিল বৈকি, প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল; তার বেশি দুঃখ, তারও বেশি অভিমান। আর ওসবের চেয়েও শতগুণে যা মারাত্মক—ধিক্কার জাগল মনে। ধিক্কারের দাহে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল বুকের এপিঠ ওপিঠ।

'দেখো, কাছের যে মানুষ দূরে চলে যায় তাকে ধরতে চাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই।'

সই চুপ হয়ে যায়। হাতের পাতা দিয়ে দু চোখ ঢেকে বসে থাকে।

সই বলে, 'দিন যায়, জ্বলুনি বেড়ে চলে। পারি না আর সইতে। কিসে আগুন ঠাণ্ডা করি, কোন্ কুয়োর জল ঢালি? আছাড়ি বিছাড়ি খাই, শীতল মেঝেতে বুক চেপে শুই। শান্তি নেই, শান্তি নেই। পাগল হয়ে যাব নাকি? পাগল হওয়াও যে ভালো এর চেয়ে। তাই বা হই কই? দু আঁখির জলে শুক্‌নো ধুলোও কাদা হয়ে ওঠে।

'ভাবি, একদিন তো সেই নিষ্ঠুরই আমার চোখে পরম সুন্দর ছিল। সৌভাগ্যবতী মনে হয়েছে নিজেকে সেই সুন্দরের হাতে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে। স্বর্গসুখ তুচ্ছ মেনেছি তার বুকে মাথা রেখে। এক রতি খাদ ছিল না সেদিন আমাদের

ভালোবাসায়, না ছিল এক ফোঁটা মিথ্যা কোথাও। তবে, তবে সেই মুহূর্তটুকুই কেন জিইয়ে রাখি না মনে আমি।

'যেদিন এই সত্য খুঁজে পেলাম, বেঁচে গেলাম আমি। সে কী আনন্দ! তখন, যে সাগরের পাড়ে ফিরে বাসা বাঁধব বলে আশায় বসে ছিলাম, সেই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মান-অভিমান ঘৃণা-রাগ সব ভাসিয়ে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পাড়ে উঠে এলাম। ঘরে এসে মাটির পিদিম জেবলে ঠাকুরের মুখের কাছে ধরলাম, দেখি সেই মুখ আর এই মুখ আজ এক হয়ে মিশে গেছে। তখন হতে আর কাঁদি না। কাঁদিব কেন?—

'চণ্ডীদাস বলে কাঁদো কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥'

সেজদি এসে বললেন, 'চলো, সেদিনের সেই টুম্বটা দেখতে যাবে? মাইল বারো দূর, লম্বা ড্রাইভ, বেশ লাগবে।'

বলি, 'না সেজদি, শখ জাগছে না তেমন।'

'তবে চলো "বিড়লা-টেম্প্ল"-এ? মাও যাবেন বলেছিলেন, দেখিয়ে আনি এইসঙ্গে।'

সেবারও গিয়েছিলাম বিড়লা-মন্দিরে। বিশাল শ্বেতপাথরের মন্দির, দ্বারের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি গোলাপের সুবাস। যে আসছে, ঠোঙা-ভরা কিনে নিয়ে ভিতরে ঢুকছে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠি—এদিকে বাঘ, ওদিকে সিংহ; সারি সারি হাতি রেলিঙের গায়ে শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে। পদ্মকুঁড়ি ঝোলে কার্নিশ বেয়ে। ঘাটের উপর সাজানো অর্ঘ্য প্রতি থামের গায়ে। রঙিন ছবি, খোদাই ছবি সাদা দেয়াল জোড়া। পুরাণগাথা ঠাসা ফাঁকে ফাঁকে। কাটাপাথরের হলুদ কালো নকশার পদ্ম লুটোয় মেঝেতে। বাঁধানো শুকনো ক্যানেল মন্দির ঘিরে। বাঘের মুখের প্রকাণ্ড হাঁ-এর ভিতর নকল গুহা—উট, গণ্ডার, ঝরনা, ঝোপ-ঝাড়ের শখের বন, ঝোলা দোলনা সব পেরিয়ে জারুলতলায় আলু-কাবলি খেয়ে যখন বাইরে বেরিয়ে আসি, হঠাৎ মনে পড়ে, তাই তো, সবই দেখলাম, কিন্তু মন্দিরের ঠাকুরকে দেখলাম না তো?

সেজদি বললেন, 'ভাবছ কী অত? যাবার ইচ্ছে নেই? দেখেছ আগে?'

বলি, 'তা হোক; চলো, যাই আর-একবার, দেখে আসি কোথায় কী।'

ব্রজরজঃ

মজা লাগে দেখে। দক্ষিণী মারোয়াড়ি গুজরাটি পাঞ্জাবি সিন্ধি নেপালি ওড়িয়া বাঙালি, সব দেশের যাত্রীতে ঠাসা ট্রেনের ছোট্ট কামরাটুকু। সবাই চলেছে এক উপলক্ষে, মথুরা-বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি-দর্শনে। যেন একই পরিবার চলেছে নানান সাজে সেজে। সমান দরদ একের প্রতি অন্যের। এ ওর ছেলে কোলে টেনে নেয়, এ ওর বসতে জায়গা খালি করে দেয়; টিনের বাক্স, পিতলের কৌটো খুলে খাবার বেঁটে খায়; মাটির কুঁজো হতে জল ভরে ঠাণ্ডা জলের গেলাস এগিয়ে ধরে ঘাগরা-পরা নতুন বউটির দিকে মালাবারী প্রৌঢ়া; বছর-দেড়েকের শিশুটি হাত বাড়ায় মারাঠি মার কোলে বসে সবার দিকে; বলে, 'ছেক্ অ্যান্দ্।' মা মাসি হেসে লুটোপুটি। নতুন শেখা বুলি, শখ করে শিখিয়েছে হয়তো মামা খুড়ো। উঠে উঠে সকলেই ঐটুকু হাতে হাত দিয়ে 'শেক্‌হ্যান্ড' করে আসে। এমন ডাক না মেনে কি পারে কেউ।

ট্রেন থামল মথুরাতে। এখান থেকে বৃন্দাবন ক্রোশ-তিনেক চলার পথ। বাস মোটর টাঙগা এই তিন যানবাহন সম্বল। আগে হতেই ব্যবস্থা ছিল, বৃন্দাবন দেখে ফিরতি-পথে মথুরায় থাকব কদিন। সেই যখন যেতেই হবে এ পথ দিয়ে তখন দূরেরটা আগে সেরে ফেলা ভালো।

স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্ পেরিয়ে বাইরে এসেছি—যেন চাক-ভাঙা ভীমরুলের ঝাঁক—একদল গাড়োয়ান কুলির মাথার বাক্স বিছানা, আমাদের হাতের থলি ব্যাগ বই বোঁচকা, যা পেল ছোঁ মেরে নিয়ে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল! আচম্‌কা ঘটে গেল ব্যাপার। খালি হাতে ঝাড়া-ঝাপ্‌টা আমরা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকি পথের মাঝে। বড়দি বললেন, 'দেখছ কি এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, খোঁজো শিগ্‌গির। দেখো কোথায় গেল সব। এই কুলি, সামান উমান কাঁহা গয়া?' বেকুব কুলি হাত উল্টায়।

'খোঁজো খোঁজো,' 'দেখো দেখো,' রবে ছুটতে থাকি খ্যাপার মতো।

বড়দি বলেন, 'ঐ তো, ঐ যে ঐখানে— ; উপরে, ভিতরে—'

দেখি সতীদেহের টুকরোর মতো আমাদের জিনিসগুলি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় এক-একটি এক-এক টাঙগায় বিরাজমান। গাড়োয়ান নিশ্চিন্তমনে বাঁ হাতে লাগাম ধরে ডান হাতে চাবুক তুলে তৈরি। চললেই হয় এখন।

সেগুলি সব এক জায়গায় করা সে আর-এক ব্যাপার। কেউ কারো দাবি ছাড়বে না। একজনের গাড়িতে টিফিন-ক্যারিয়ারটা উঠেছে, সুতরাং ঐ গাড়িতেই যেতে হবে আমাদের। কারো গাড়িতে স্টীল-ট্রাঙ্ক্‌টা, সে সেটা আঁকড়ে ধরে থাকে। সেই গাড়িতে উঠলে তবে নিজের ট্রাঙ্ক নিজে ফিরে পাব। এইরকম কেউ লণ্ঠন, কেউ বালতি, কেউ বিছানা, কেউ বেতের ঝুড়ি দু হাতে চেপে বসে রইল। নিরুপায়। বিরক্তিতে ক্লান্তি টেনে আনে। দাঁড়াবার জোর থাকে না পায়ে। ইচ্ছে হয় এই রাস্তার ধুলোতেই বসে পড়ি দু পা ছড়িয়ে।

শেষে যে কে কীভাবে কখন সব জিনিস একত্র করে দুটো টাঙ্গাতে বোঝাই করল সে স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ফুটতেই পারছে না মনে। দেখছি, বাক্সের উপর দু পা তুলে দু হাতে দু পাশের মোটঘাট আগলে, বড়দি আমি পাশাপাশি বসে চলেছি বৃন্দাবনের পথে। স্টেশন ছেড়েছি বহুক্ষণ।

সাদা ধুলোর পথ, দু দিকে রুক্ষ মাঠ, উঁচুনিচু সাদা মাটির টিলা, আর বুনো গাছের কাঁটাঝোপ। ধুলোয় ধূসর সবুজ পাতা। পথ দিয়ে বাস মোটর যায় তো কালবৈশাখীর ঝড় তুলে দিয়ে যায়। সেই ধুলোর ঝড়ে ঢাকা পড়ে পথ গাড়ি মানুষ গাছ, পায়ের পাতা, মাথার আকাশ, সব ; বেশ কিছুক্ষণ চোখ নাক বুজে থাকতে হয়। প্রাণায়ামের জোর যার যত বেশি তারই রক্ষা ততখানি।

বড়দি বলেন, 'এইই ব্রজরজঃ। এই রজে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।'

দলে দলে যাত্রী আসছে, দলে দলে যাত্রী ফিরে চলেছে এই একই পথে। যেন অহোরাত্র উৎসবের নিমন্ত্রণ। বিরাম নেই আসা-যাওয়ার।

কত মাঠ মন্দির ধর্মশালা পেরিয়ে এসে পৌঁছাই বৃন্দাবনে। দাওয়ায় বসে পাণ্ডারা পান চিবোয় আর যাত্রী দেখে—কাকে ধরবে, কাকে পাক্ড়াবে।

কৌপীন-পরা ছোটো ছেলের দল জটলা করে পথের পাশে, তিলক কাটে কাঠের আয়না বাঁ হাতে ধরে।

তড়্বড়িয়ে পথে চলে বাঙাল বৈষ্ণবীরা জপের থলি হাতে নিয়ে, বুড়ী যুবতী একসঙ্গে ভিড় ক'রে।

গলি দিয়ে গাড়ি চলেছে। বাড়ির সামনের ছোট্ট উঠোনে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর পায়রা কাক শালিক টিয়া মিলে মিশে দানা খাচ্ছে ঠুক্রে ঠুক্রে। দাদা নাতি মুঠো মুঠো দানা ছড়াচ্ছে শান-বাঁধানো বারান্দায় বসে।

সন্ধে হয়ে এল রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে পৌঁছোতে। এখানেও কন্খলের মতো হাসপাতালকে ঘিরে এঁদের কাজ ; রোগীদের সেবার জন্য এঁরা। এঁদের কুলগাছ, বেলগাছ, সবজি-বাগান, ইঁদারার জল, রান্নাঘর, শোবার ঘর, ঠাকুরমন্দির—যেন সাজানো গৃহস্থালি।

সামনেই পূর্ণিমা। বড়ো বড়ো কালো গাছের তলায় তলায় সাদা মাটি ঝল্মল্ করছে চাঁদের আলো পড়ে। সে ঝল্মলানিতে ঘুরে বেড়াই আপনমনে এ-গাছ ও-গাছ নিশানা রেখে।

অপূর্ব এক সৌগন্ধ এল হাওয়ায় ভেসে। মন মাতিয়ে দিল। প্রাণ ভরে টেনে টেনে নিশ্বাস নিই। কী সৌরভ! চোখ বুজে আসে আবেশে। কী ফুল? চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ চিনতে পারছি নে। আবার নিশ্বাস টানি—এ যে একান্ত আপনার, অতি কাছের—কিন্তু কোথায় সে? যেন নিজের ঘরের বউটি, তবু আটপৌরে নয়। যেন বিশেষ একটা ব্যক্তিত্বের আবরণে ঢাকা। এ-গাছ ও-গাছ খুঁজি, এ-তলায় ও-তলায় যাই, কালো গাছ তার আঁধার-ঘন কোলে আমায় নিবিড় করে টেনে নেয়, কিন্তু খোঁজ দেয় না কিছুর।

কানে এল কিসের একটা প্রবল গুঞ্জন ; যেন জলভরা মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি, যেন দুকূলপ্লাবী বেগে ধাওয়া নদীর কলোচ্ছ্বাস, যেন ঝরনার গর্জন, বজ্রের নিনাদ।

ভীরু পদক্ষেপে এগিয়ে যাই। এ কী দৃশ্য চাঁদের আলোয়। দিগ্‌দিগন্ত মিলিয়ে জ্যোৎস্না-শুভ্র যমুনার বিরাট বালুতট ; তাতে বসেছে সাধুদের মেলা।

বিস্তীর্ণ বালুকারাশি যেন পদ্মানদীর ঘোলা জলের সমুদ্র, কূলকিনারা নেই সামনে। তারই বুকে অসংখ্য সাধু নির্ভয়ে ভেসে চলেছে নিশ্চিত ভরসায়, ধুনির ক্ষীণ আলোকরশ্মিটুকু আশ্রয় করে। স্তব্ধ হয় মন। কিসের এই যাত্রা? কোথায় গিয়ে ঠেকবে তারা? ঝড় বাদল খরা তুফানে গ্রাহ্য নেই কোনো। পরম বিশ্বাসে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে স্রোতের মুখে। যেন মার কোলে শুয়ে শিশু পরম নির্ভয়ে দুধ পান করছে মার মুখখানির দিকে তাকিয়ে।

সাধুদের ধুনি ছাউনি ছোটো হতে হতে সেই কোথায়—ঐ ওদিকে দৃষ্টির আড়ালে বিলীন হয়ে গেছে। ইচ্ছে হয় চলে যাই, কাছে গিয়ে দেখি—এই রাত্তিরে, এই সময়ে, এক্ষুনি একবার।

বড়দি বাধা দেন, বলেন, 'এত রাত্রে কোথায় যাবে? কাল দেখো।'

কাল দেখব দিনের আলোয়—সে আলাদা জিনিস। আজকের এই দেখা-না-দেখার রহস্যটুকু থাকবে না ততক্ষণ। কত-কিছু না জানি মিলিয়ে যাবে সেই স্পষ্ট আলোয়, খুঁজে কি আর পাব তা আবার।

বলি, 'বড়দি, সে যে একটা মহা ক্ষতি।'

'আচ্ছা, তবে দেখি ভেবে।'

রাত্তিরের মতো আশ্রমের কাজ চুকে গেলে পর, এই আশ্রমের ভার নিয়ে যিনি আছেন তিনি বললেন, 'একান্তই যদি যান তবে এই ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিন। পথঘাট জানা কেউ সঙ্গে থাকা ভালো। আর ওদিকটায় নাগাদের ভিড়। জানেন তো, ওরা বড়ো রাগী। কথায় কথায় মারামারি কাটাকাটি শুরু করে ; নানারকম তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে থাকে ওদের। তাই এইসব মেলা উপলক্ষে এদের এক পাশে স্থান দেওয়া হয়। ওদিকটায় যাবেন না, ওদের সম্বন্ধে সাবধান।'

তর সয় না। নাগা সাধুর ভয়ে ছাই রঙের চাদরে মাথা মুখ গা আচ্ছা করে জড়িয়ে নিয়েছি ; কে যে কী, আর বোঝবার উপায় রইল না।

বালির উপর খালি পায়েই চলতে সুবিধে, তাই জুতো ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা এঁটে বেরিয়ে পড়লাম। স্বামীজি 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এলেন ; বললেন, 'করেন কী, পায়ে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে। জানেন না তো বালি কী দারুণ ঠাণ্ডা এখন, দস্তুরমতো শীতে ঠক্ ঠক্ করবেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালি যেমন তাতে, বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি ঠাণ্ডা হতে থাকে।'

অগত্যা ঘরে ফিরে দু পায়ে জুতো গলিয়ে নিই।

সেবাশ্রমের সীমানার ঠিক পরেই যমুনার বালির চড়া। এখান দিয়েই যমুনা বইত আগে, এখন সরতে সরতে দূরে কোথায় গিয়ে বালির বুকে মুখ লুকিয়েছে, নজরে আসে না সহজে চাঁদের আলোতে।

পাড় থেকে নীচে নেমে চলতে লাগলাম চড়ার উপর দিয়ে এক পা তুলে আর পা

বালিতে গেঁথে। সত্যিই, কী ঠান্ডা! যেটুকু বালি জুতোর উপর দিয়ে উঠে চামড়ায় লাগছে, শীতের রাতে শিউরে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমেই নাগা-সম্প্রদায়। ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে তফাত রেখে চলি, আর আড়ে আড়ে দেখি।

বিরাট দল। ব্যস্ত যে যার কাজে। কেউ ধুনির উপর রুটি সেঁকছে; কেউ পিতলের থালায় আটা মাখছে; কেউ এই ঠান্ডা বালির উপরেই খালি গায়ে কনুইয়ে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে; কেউ কেউ গোল হয়ে বসে গল্প করছে—শাস্ত্রের ব্যাখ্যা চলেছে; কেউ কেউ আবার জপের মালা হাতে নিয়ে পাশেই ধ্যানে বসেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা শুকনো ছোটো ডাল বালিতে পোঁতা। সাধুরাই কেউ এনে থাকবেন। ডালের গায়ে ঝুলছে তাঁদের কাঠের কমন্ডলু, রুদ্রাক্ষের মালা, লাল কানিতে বাঁধা ছোট্ট গীতাখানা; 'বুক্-শেল্ফ্', 'ওয়ার্ডরোব', 'স্টীক স্ট্যান্ড'—সবই ঐ একটি শুকনো ডাল। এক দিন নয়, দু দিন নয়; বছরের পর বছর চলে এমনি। বাড়ি-ঘরের ভাবনা নেই, সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত নেই, পাথেয়র অভাব নেই। বেশ আছে।

বড়দি বলেন, 'কী বুঝি আমরা! কতটুকু জ্ঞান আমাদের? নয়তো, বলতে কি পারি কী শক্তিবলে, কী মহান উদ্দেশ্যে এঁদের এই কৃচ্ছ্রসাধন! মহা মহা পন্ডিতও তো এঁদের মধ্যে ছাই মেখে বসে আছেন—চিনতে পারি কি? সেটুকু ক্ষমতা আছে আমাদের?'

কত অগুন্তি সাধু সন্ত জড়ো হয়েছেন এখানে। একই জায়গায় এঁদের এভাবে দেখা কল্পনায়ও ছিল না কোনোদিন। এইই তো একটা বিশেষ দেখবার জিনিস, যা নাকি নিজের চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। হরিদ্বারে কিন্তু এরকম দেখি নি। শহরে, পাহাড়ে, গঙ্গার পাড়ে ছড়িয়ে আছেন সবাই।

সঙ্গের ব্রহ্মচারী বললেন, 'এখন তো তবু কমে গেছে ভিড়। আর যদি পাঁচ-ছদিন আগে আসতেন তা হলে দেখতে পেতেন ভিড় কাকে বলে। এই একাদশীর পরিক্রমা শেষ করে শয়ে শয়ে সাধুরা রোজ চলে যাচ্ছেন হরিদ্বারে।'

নাগা-সম্প্রদায় পেরিয়ে এসে পড়ি অন্য দলে। এঁরাও বস্ত্র বেশি ব্যবহার করেন না; তবে নাগাদের মতো উলঙ্গ নন। এখানে অবশ্য নাগারা ছোট্ট এক টুকরা কৌপীন পরে থাকেন বৃন্দাবনের নিয়ম অনুসারে। জানি না, কোত্থেকে কী করে কবে এ নিয়ম হল।

চড়ার উপরে একটু দূরে দূরেই টিউবওয়েল, বিজলিবাতির সারি, রেডিও, লাউডস্পীকার। সরকারের ব্যবস্থা—অহরহ পরিষ্কার করা হচ্ছে জায়গা; ব্লিচিং পাউডার ছড়ায় লোক; শালপাতা, ছেঁড়া কাগজ, বাদামের ঠোঙা ঝেঁটিয়ে ঝুড়িতে তোলে মেথর। লাউডস্পীকারে নামগান, গীতাপাঠ চলতে থাকে সেই সঙ্গে।

অনেক সম্প্রদায়ের মহান্তরা বড়ো বড়ো তাঁবু, ছাউনি ফেলেছেন চড়ায় নিজেদের মনোমত সীমানা ঘিরে বিগ্রহ-ঠাকুরের আসন বসিয়ে। সামিয়ানা-টাঙানো প্যান্ডেল মাঝখানে।

এরই একটা প্যান্ডেলে রাসলীলা হচ্ছে। দেখি, অডিয়েন্স সব ভস্মমাখা সাধুর দল, প্রকান্ড প্রকান্ড জটার বিড়ে মাথায় পাকিয়ে।

রাধাকৃষ্ণ অষ্টসখী সাজে সেজেছে ছোটো ছেলের দল। জরিজরা, রাংতা-

চুম্‌কির ঘাগরা ওড়না, কালো পাটের লম্বা বেণী মাথায়, নাকে নোলক, কপালে মুকুট, চেয়ারে-বসা রাধাকে ঘিরে অষ্টসখী কৃষ্ণবিরহে আকুল। সকলেই এ-ওর গায়ে এলিয়ে ব'সে কেবল 'হা কৃষ্ণচন্দ্র', 'হা ব্রজমাধব', 'হা গোপীরমণ', 'হা প্রাণবল্লভ' বলে বুকফাটা নিশ্বাস ফেলছে, আর থেকে থেকে বিলাপ গাইছে।

কতক্ষণ কাঁদতে পারে দেখবার আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকি। বিলাপ আর শেষ হয় না। একঘেয়ে দুঃখ হতে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখি। দূর থেকেও যে-যার স্থানেস্থিতে শুয়ে বসে রাসলীলা দেখছে। সে পথে যাওয়া-আসা করতে গিয়ে কেউ রাসলীলা দেখায় বাধা সৃষ্টি করলে সেই অবস্থাতেই হেঁকে বকে সরিয়ে দিচ্ছে।

প্যাণ্ডেলের ডান দিকে একটু দূরে আরো একটা জটলা। সেখানে বুকে মেডেল ঠাসা, কালো ওয়েস্টকোট গায়ে, এক ম্যাজিসিয়ান তীরের খেলা দেখাচ্ছেন সাধুদের। অডিয়েন্স থেকেই দুজন হাসিমুখে উঠে মাঝখানে এলেন। ম্যাজিসিয়ানের কথামতো তাঁরা দু টুকরো পাথরে সুতো বেঁধে দুজনে দু দিকে দাঁড়িয়ে, পথে ঘাটে যেমন ছোটো ছেলেরা সুতো-কাটাকাটি খেলে তেমনিভাবে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বাঁধা পাথরটা দোলাতে লাগলেন। ম্যাজিসিয়ান দূর থেকে তীর ছুঁড়ে দুটো সুতো একবারে একই লক্ষ্যে কেটে ফেললেন।

হর্ষধ্বনি করে সাধুরা হাততালি দিয়ে উঠলেন। 'বাহবা' 'বাহবা' রব পড়ে গেল সেখানে।

এবারে একটা ছাতার চার দিকে চারটে সুতোয় চার পাথর বেঁধে ঝোলানো হল। ছাতার ডাঁট ধরে একজন মাথার উপর ছাতা ঘোরাবেন, তাঁকে ঘিরে সুতোয় বাঁধা পাথর ঘুরবে, ম্যাজিসিয়ান এক তীরে সেই চার সুতোই কেটে ফেলবেন।

গোপীদের বিলাপ শেষ হয়েছে। সকলে গলা-জড়াজড়ি করে ঝুলতে ঝুলতে বেরিয়ে গেল। বিরহ-যাতনায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে কি কেউ! গোপীরা যেতেই বাঁশি হাতে কৃষ্ণ এসে ঢোকেন আসরে।

মথুরাতে রাজা হয়ে কৃষ্ণ সুখে নেই। কী এক দুঃখ তাঁকে উতলা করে তুলেছে। সিংহাসনে বসে সেই-যে কৃষ্ণ মুখ হেঁট করলেন আর কিছুতেই তোলেন না। সভা-পারিষদের শত অনুনয় বিনয় বৃথায় যায়। বহুক্ষণ এইভাবে থাকার পর কৃষ্ণ আদেশ করলেন উদ্ধবকে ডাকতে।

বড়দি বললেন, 'চলো চলো। আর কী দেখবে?'

বলি, 'উদ্ধবকে কী জরুরি কাজে ডাকল একবার দেখে যাই। আর একটুক্ষণ থাকো।'

হৈ হৈ করে সভা থেকেই অনুচররা উদ্ধবকে ডাকাডাকি করতে লাগল। শীতের রাতে পা মুড়ে বসেছে তারা, বারে বারে ওঠা কি সম্ভব?

উদ্ধব কোঁচার খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে এসে হাজির। অধোবদনে কৃষ্ণকে দেখে তার থুতি নেড়ে উদ্ধব শুধোয়, 'কেন ডেকেছ, কী হয়েছে?'

কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমার গোকুলের কথা মনে পড়েছে।'

উদ্ধব বলে, 'হরি কো গোকুলকি ইয়াদ আওয়ে হে; আউর কিসি কি ইয়াদ

আওয়ে হে ?'

কান্না থামে না। কৃষ্ণ বলেন, 'ব্রজের কথা মনে পড়েছে।'

উদ্ধব বলে, 'ব্রজকি ইয়াদ আওয়ে হে, আউর কিসি কি ইয়াদ আওয়ে হে ?'

কৃষ্ণের মুখ দুঃখে নিচু হতে হতে বুকের কাছে ঠেকে। তিনি যতই বলেন 'আমার মাখনের কথা মনে পড়েছে, দধির কথা মনে পড়েছে, মা যশোদার কথা মনে পড়েছে, বাপ নন্দ ঘোষের কথা মনে পড়েছে,' উদ্ধব ততই বলে 'আউর কিসি কি ইয়াদ আওয়ে হে ?'

এত খোঁচানিতে কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। দু হাতে উদ্ধবের গলা জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠেন। আসলে তাঁর গোপীদের কথা মনে পড়েছে। সে কী কান্না! চোখের জল আর বাঁধ মানে না। দর্শকদের ভিতর হতেই একজন একটা লাল গামছা ছুঁড়ে দিল। উদ্ধব তাই দিয়ে কৃষ্ণের চোখের জল মোছায় আর বুকে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়। কৃষ্ণ ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদেন আর ডাক ছেড়ে গান—

'উদোব ভেঁইয়ারে, তুম্‌ ব্রজকু গমন করোঁ।
মেরে বিনা রাধিকা গোপীকা, তেনেকি দুখ্‌ হরো।
উদোব ভেঁইয়ারে—'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হি হি করে হাসতে গিয়ে থম্‌কে গেলাম। অলক্ষ্য হতে যেন চাবুকের ঘা পড়ল মুখে।

খানিক তফাতে আবছা আলোয় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে অতিজীর্ণ বৃদ্ধ এক যাত্রী ছেঁড়া কম্বলে গা ঢেকে দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে এক দৃষ্টে রাসলীলা দেখছে, আর তার শীর্ণ গাল বেয়ে অঝোরে দু নয়নের ধারা ঝরছে।

বলি, 'চলো বড়দি, এবার বাড়ি ফিরি।'

'ওদিকে যে আরো অনেক দেখা বাকি রয়ে গেল।'

বলি, 'থাক্‌, কাল হবে।'

আবার বালির চড়া ভেঙে আঁচ্‌ড়ে-পাঁচ্‌ড়ে পাড়ের উঁচু পথে উঠি। সেবাশ্রমের দরজা খোলাই ছিল। ঘাড় হেঁট করে চলেছি। কুয়োর পাশে ইঁট-বাঁধানো পথ-টুকুতে পা দিতেই আগ-রাতের সেই সৌরভ আচ্ছন্ন করে দিল সব ভাবনা। মুখ তুলে দেখি, ছোট্ট বাতাবিলেবুর গাছটি ফুলে ফুলে যেন সাদা মোতির ফোয়ারা সেজে আছে।

ক্যাঁও, ক্যাঁও, ক্যাঁও। রাতের শেষ প্রহর থেকে ডাক শুরু হল, ঠিক যেন কানের কাছে। ঘুমোই সাধ্য কী! ঘোর অন্ধকার, তবু উঠে পড়লাম। শিয়রের দিকের জানলার কপাট খুলে দিলাম। ঝাপড়া গাছে ঠাসা বন সেদিকটায়; তারই ডালে ডালে একদল ময়ূর-ময়ূরী ঝাঁপাঝাঁপি করছে আর ডাকছে—ক্যাঁও, ক্যাঁও, ক্যাঁও। কী কর্কশ ডাক! এমন সুন্দর পাখির এ কী কণ্ঠস্বর! বড়ো কষ্ট দেয় এ অসামঞ্জস্য। মন মানতে চায় না। ভালো গায়কের গলায় কটুভাষণ শুনে কত ব্যথা পেয়েছি কতবার। ভেবে পাই নি, এমন সুকণ্ঠের যে অধিকারী, যার স্বরে এমন মধু ঝরে, তাতে এত বিষ থাকতে পায় কী করে? এও কি সম্ভব! সম্ভব নিশ্চয়ই। তা নইলে

এই চোখেই তা দেখতে পাই কী করে? শুনি তো, যে, দুই বিপরীত ধর্ম চলে পাশাপাশি বিশ্বপ্রকৃতিতে। এ নাকি তাঁর নিয়মের আর-এক রহস্য।

বড়দি উঠেছিলেন আগেই। ওঠা আর বলি কেন, শুলেন কখন যে উঠবেন! রাত্তিরে যতবার পাশ ফিরতে গিয়ে চোখ মেলেছি, দেখি, বড়দি স্থির হয়ে বসে আছেন খাটে-লাগা জানলার গরাদ ধরে। এমনিতরো আরো কত রাতে দেখেছি তাঁকে একলা জেগে থাকতে। নির্মল নিশুতি রাতে আকাশভরা তারাগুলি হাতড়ে হাতড়ে কোন্ হারাধন খুঁজে বেড়ান তিনি! যারা একবার ফাঁকি দিয়ে লুকিয়েছে আর কি ধরা দেবে সহজে?

বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি বড়দির চোখে মুখে। জানি, তবু বলি, 'কী হয়েছিল তোমার বড়দি? নতুন জায়গায় অসুবিধে হয়েছিল ঘুমোতে?'

'না না, তা নয়। সুন্দর জ্যোৎস্না রাত; চাঁদের আলো কি দিনের আলো, ভুল হয়। তাই দেখছিলাম বসে।'

'এই দেখতেই সারা রাত বসে কাটিয়ে দিলে?'

বড়দির হাসিমুখ বিষণ্ণ হয়ে আসে। বলেন, 'কত তো চেষ্টা করি রানী, ঘুম আসে কই? রাতগুলি আমার এমনি কাটে; বিছানা আগুন মনে হয়।'

বড়দিকে টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সোজা চলে আসি যমুনার পাড়ে। দিক ঠিক করতে পারি নি কাল রাতে। আজ আর ভুল নেই; পুবের আকাশে কালো আবরণ ভেদ করে আলোর ছোঁয়া ফুটছে ধীরে ধীরে। প্রশস্ত বালির চড়া সে আলোয় ফুটে উঠছে একটু একটু করে। ঝাপ্সা দূরের গাছগুলির মাথা স্তরে স্তরে হালকা কালিতে আঁকা হতে থাকে সারে সারে। সাদা কুয়াশার ভিতর সাদা বালির উপর ঘোরাঘুরি করে কালো সাধুর দল; যেন ডেঁয়ো পিঁপড়ে কিল্‌বিল্‌ করে ডিম মুখে নিয়ে ঘরের দেয়ালের গায়ে। সাধুরা কেউ হাত-মুখ ধোয়, লোটা-ত্রিশূল মাজে, টিউবওয়েলের জলে স্নান করে, বুকে পিঠে ভস্ম মাখে। সবাই ব্যস্ত। আগত দিনের অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয় তাড়াতাড়ি।

রঙ লাগে এবার পুব-আকাশের আলোর গায়ে। সে রঙ ঠিকরে পড়ল যমুনার জলে, বালির উপরে, সাধুদের গায়ে, এপারের লম্বা গাছগুলির মাথায়, মন্দিরের চুড়োয়-বসানো সোনার কলসীতে। দেখতে দেখতে সে রঙের ছটায় হোলির মাতা-মাতি শুরু হয়ে গেল চোখের সামনে। বিহ্বল হয়ে পড়ি। এত রঙ লুকিয়ে ছিল কোথায় এতক্ষণ?

বড়দি বললেন, 'ঐ দেখো সেই আবিরের থালা।' দেখি, পুবের আকাশে রঙের আলোর মাঝে টক্‌টকে নিটোল সূর্য মাথা তুলেছে এই ফাঁকে।

প্রাতঃস্নানের সময় হল। বড়দি লক্ষ্মীবিলাসের শিশি হাতে নিয়ে বাইরে গেলেন একটা সরু কাঠির সন্ধানে। শীতে জমা তেল খুঁচিয়ে বের করতে হবে, নয়তো এত সাত-সকালে তেমন রোদ কোথায় যে গলিয়ে নেবেন।

ঘরে ঢুকে চৌকির উপর হাত পা তুলে বসে আছি সেই থেকে। বড়দি নাছোড়-বান্দা, যমুনায় স্নান করতেই হবে। অথচ কালই রাতে ঘুমোবার আগে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনেছি—বলছিলেন ব্রজরমণ ঘরের আর-এক কোনা হতে: বিরাট বিরাট কাছিমে ভরা নাকি যমুনা; কিল্‌বিল্‌ করে সারাক্ষণ। হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে

স্নান করতে হয়। কাছিমের কামড়—ওরে বাপ! ছেলেবেলায় শুনেছি দিদিমার কাছে, কাছিম একবার কাম্‌ড়ে ধরলে আর খোলে না সে কামড়, আকাশে বাজ না ডাকা পর্যন্ত। কাছিমের গলা কেটে ফেললেও দাঁতে দাঁত আটকে থাকে ; 'হাঁ' হয় না শেষ সময়েও। এখানেও যে কাউকে কাছিম কামড়ায় নি তা নয়। তবে, পাপী-দেরই কামড়ায় বুঝে বুঝে। তা ছাড়া কাছিম নাকি মড়া খায়। শোনা যায়, যমুনার তীরে চিতা জ্বললেই কাছিমরা মুখে বুড়্‌বুড়ি তুলে চিতা নিবিয়ে দেয়। মড়া খাবার এমন লোভ! এতসব শুনেও সাহস থাকে কার? তবু বড়দি মানেন না ; শাড়ি গামছা হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'ওঠো।'

ভাবি, সেকালে হয়তো কাছিম ছিলই না একেবারে যমুনায়। তা হলে তো জটিলা-কুটিলা খুশি মনেই ফিরে ফিরে পাঠাত রাধাকে। যমুনায় রাধার যাওয়া-আসা নিয়ে কোঁদল করত না এত।

বড়দি বলেন, 'হুঁ, কত শত লোক স্নান করে কিছু হয় না ; আর তোমার বেলায়—'

বলি, 'তাও তো আর-এক বিপদ। কিছু হয় না, হয় না ; হলেই তো বলবে, পাপী ছিল তাই।'

ব্রজরমণ সাহস দেন ; বলেন, 'ভীত হইবেন না। জলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই উহারা আসিয়া কামড়াইয়া ধরে ; নতুবা কিছু করে না। এইরূপ শুনিতে পাই।' কী করি, অগত্যা গামছার পুঁটলি হাতে নিয়ে বড়দির পিছু পিছু চলি।

যমুনার যে রূপ মনের চোখে ছিল এতকাল, কিছু মেলে না তার সঙ্গে আজ। না আছে শ্রীরাধার মন-গলানো সেই নীল রঙের বাহার, না আছে গঙ্গার সেই উদ্দাম গতির বেপরোয়া ভাব—যে দিতে দিতে চলে, চলতে চলতে সাপটে নিয়ে যায় সামনের সব-কিছুকে। এ যেন রিক্তা বঞ্চিতা ভীতা প্রেয়সী। মলিন মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে কানে কানে শোনায় গেয়ে তার বিগত দিনের রূপযৌবন-গাথা। কল্পনায় কেউ সন্তুষ্ট থাকে, কেউ সহানুভূতিতে মরে। নয়তো আজকের যমুনার এ কী চেহারা! রাধার কলসী ভেসে যায় অগাধ জলে—তাই বা কই? মাঝ-যমুনায় হাঁটু-জলে ডুব দিয়ে লোক উঠে আসে পাড়ে।

শুক্‌নো বালিতে কাপড়ের বোঝা নামিয়ে বড়দির আদেশমতো যমুনা স্পর্শ করে মাথায় ছুঁইয়ে পা বাড়াই জলে। সর্বনাশ! এ কি একটা দুটো? গঙ্গায় দেখেছিলুম মাছের পাথর-স্তূপ, এখানে দেখি কাছিমের কালো পর্বত। মোটা মোটা গলা বাড়িয়ে তারা এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে। দেখে তিন লাফে পিছু হটে আসি।

এখন করি কী? ডুব একটা দিতেই হবে, অথচ ওদের মাঝে যাই কোন্‌ প্রাণে! ব্রজরমণ বলেছেন, দাঁড়িয়ে থাকলেই বিপদ। মনে পড়ল শিলচরের আলেক-বাবার কথা। 'অলখ নিরঞ্জন' ছিলেন, ঐ নামেই ডাকত সবাই তাঁকে। তিনি ঝুমুর ঝামুর সর্বাঙ্গের ঘণ্টা ঘুঙুর বাজিয়ে ভিক্ষেয় বের হতেন, থামতেন না কোথাও।

দেরি করে লাভ নেই। 'দোহাই আলেক-বাবা' বলে ঝপাঝপ্‌ জল ছিটকে হাঁটু নাচিয়ে 'লেফ্‌ট রাইট্‌' করতে করতে এক-হাত জলে কোনোমতে একটা ডুব দিয়েই উঠে এলাম পাড়ে। আজ আর কারো নামে ডুব নয় ; মনেই জাগল না তাদের কথা।

স্নানের পর ঠাকুরদর্শনে বের হই। পথে এক পাণ্ডা সঙ্গ নেয়; বলে, 'হাতের কাছের মন্দির ফেলে দূরে যেতে নেই। চলো, আমি এক-এক করে দেখাই সবাইকে।'

প্রথমে যাই রঙ্গনাথের মন্দিরে। দক্ষিণদেশের সুপ্রাচীন প্রধান মন্দির শ্রী-রঙ্গম-এর অনুকরণে এই মন্দির। প্রকাণ্ড ফটক। মন্দিরের সামনেই খুব উঁচু এক স্বর্ণস্তম্ভ। পাণ্ডা বলে, সাড়ে বারো মোন সোনা লেগেছে এটি তৈরি করতে। তামার উপর সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মোড়া 'গরুড়-স্তম্ভ'। কিন্তু লোকে বলে সোনার তালগাছ। এই তালগাছ দেখতেই ভিড় করে যাত্রীরা এখানে। আজই সকালে দিল্লি থেকে এলেন একদল যাত্রী ঝক্‌ঝকে নতুন মোটরে চেপে। মাত্র এক-দিন থাকবেন। বলি, 'বৃন্দাবনে একদিন থেকে কী দেখবেন আপনারা? যা দেখছি, ছুটে ছুটে দেখেও কদিনে দেখা শেষ করে উঠতে পারব বুঝছি না।'

তাঁরা বললেন, 'সব আর কী দেখব; এই মানসিংহের মন্দির, শাহ্‌জির মন্দির, আর ঐ-যে কোন্‌ মন্দিরে সোনার তালগাছ আছে, সেইটে দেখে ফিরে যাব।'

সূর্যের আলো সোনার তালগাছে ঠিক্‌রে পড়ছে। তাকাতে চোখ ঝলসায়। উপরে তিন থাক্‌ সোনার পাতে ঘণ্টা ঝুলছে—এক দুই তিন চার... আট দশ—আর গুনতে পারি নে, চেপে চোখ বুজি। বড়দি বললেন, 'ষোলোটা হবে বোধ হয়।' দাদা বললেন, 'বারোটা।'

হৈ হৈ করে ছুটল সবাই মন্দিরের দিকে। দ্বার খোলা হচ্ছে, ঠাকুর দর্শন দেবেন এবার। চুরাশিটা ঘণ্টা-ঝোলানো প্রকাণ্ড দুয়ার টেনে টেনে খুলতে বন্ধ করতে জোরে বেজে ওঠে—ঢঙ ঢঙ ঢঙ, ঠন্‌ ঠন্‌ ঠন্‌। এখনই আবার বন্ধ হয়ে যাবে ভোগারতির জন্য। নাটমন্দির ভরে গেল দর্শনাকাঙ্ক্ষীর দলে—ঠেলাঠেলি, ঠাসাঠাসি। এর মধ্যে রঙ্গনাথকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়াই মহা ভাগ্যের কথা।

রঙ্গনাথকে দেখে খোলা আকাশের নীচে চলে আসি মন্দির পরিক্রমা করতে। বাইরে থেকে মন্দিরের আর্কিটেক্‌চার দেখে মনে হয়, সামনে পিছনে কেমন যেন উল্টোপাল্টা। যেটা উচিত ছিল প্রবেশদ্বার হওয়া সেটা দিয়ে বের হয় লোকে; আর ঢোকে তার তুলনায় ছোটো দ্বার দিয়ে। এ আবার কী উদ্ভট!

দাদা বললেন, 'গল্প শোনো তবে চলতে চলতে। ভক্ত নামদেব রোজ এসে গান শোনান তাঁর ইষ্টদেব রঙ্গনাথজিকে। একদিন মন্দিরে অত্যন্ত ভিড়। এই ভিড়ে জুতো বাইরে রেখে গেলে হারাবার সম্ভাবনা। অথচ মন্দিরে জুতো নিয়ে ঢোকা নিষেধ। নামদেব কী করেন; ছেঁড়া জুতোজোড়ার মায়া কি কম! এদিকে গান শোনাবার সময় বয়ে যায়। অনেক ভেবেচিন্তে জুতোজোড়া কোমরে বেঁধে নিয়ে মন্দিরে ঢুকে তিনি গান শুরু করে দিলেন। নামদেবের তো আর তোমাদের মতো এত কাপড়জামার বালাই ছিল না; ভিক্ষে ক'রে, গান গেয়ে দিন চলত তাঁর। এখন ছেঁড়া কাপড়ের কোন্‌ ফাঁক দিয়ে জুতোর একটু আধটু বেরিয়ে পড়েছিল; একজনের তো নজর গিয়ে পড়ল সেখানে। আর যাবে কোথায়! সবাই তেড়েমেরে এসে নামদেবকে গলাধাক্কা দিয়ে মন্দির থেকে বের করে দেয়। ভাবে বিহ্বল নাম-দেব বুঝতে পারেন না কেন এমন হয়; ভগবানকে গান শোনাতে কেন বাধা পড়ে। পাণ্ডাপুরোহিতদের অনুনয় করেন, আমার গান তো শেষ হয় নি, বাকিটুকু শোনাতে

দাও। কে শোনে তাঁর আবেদন। ঢুকতে গেলেই গলাধাক্কা খান। সামনের দিক দিয়ে ঢুকতেই পান না। অথচ প্রভুকে গান শোনানো হবে না, সে কি হয়? একতারা হাতে নিয়ে নামদেব চলে গেলেন মন্দিরের পিছন দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি তন্ময় হয়ে গান গাইতে লাগলেন, আর দু চোখের জলে বুক ভাসতে লাগল—প্রভু আজ কেন এমন অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! সবাই দেখে, বিগ্রহ ঘুরে গেছে। রঙ্গনাথজি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নামদেবের গান শুনছেন। সেই অবধি রঙ্গনাথের মন্দিরের সামনের দিকটা হয়েছে পিছন দিক, আর পিছন দিক হয়েছে মন্দিরের প্রবেশপথ।'

রঙ্গনাথের আঙিনার বাঁ দিক ঘিরে ছোটো ছোটো মন্দির, ভক্ত স্বামীদের স্মৃতি-উদ্দেশে। প্রত্যেক ঘরের সামনে এক-এক পাণ্ডা। পয়সা ফেলে ফেলে দর্শন না করলেই মুশকিল যাত্রীদের। ছোটো ছোটো সাদা কালো পাথরের মূর্তি, দরজার মাথায় পরিচয় লেখা হিন্দি অক্ষরে। পাণ্ডা নিজে খুশিমতো যা মনে আসে নাম বলে দিয়ে পয়সাটা তুলে ট্যাঁকে গোঁজে। একটা মন্দিরে আছেন শ্রীভট্টনাথ স্বামী, বিষ্বেকসেন স্বামী, আর বর্বর স্বামী। পাণ্ডা হাত নেড়ে বোঝালে, 'এই তিন মূর্তি হচ্ছে—রাম লক্ষ্মণ সীতা। তিনজনকে তিন পয়সা দাও।'

এমনিতরো, ভক্তিসার মহাযোগী ভূতযোগী সরযোগী স্বামীরা, এ'রা হয়ে যান দশরথ কৌশল্যা ভরত শত্রুঘ্ন; আর রামসীতা হন কুরেশ, লোকাচার স্বামী!

বড়দি ধমক লাগান, 'দেখতেই তো পাচ্ছ লেখা। মিছে কেন বার বার জিজ্ঞেস করে মর—এটা কার, ওটা কার? নাও, প্রণাম করো; চরণামৃত হাতে নিয়ে বুকে মাথায় ছোঁয়াও।'

সামনের আঙিনায় একটা বাঁধানো কুণ্ড। ব্রজরমণ বললেন, 'ইহাতেই গজ-গ্রাহের লড়াই হয়!' 'কই, কই' বলে ছুটে দেখতে যাই। সবুজ থক্থকে জল, তলা দেখা ভার; গজ গ্রাহ কোথায় এখানে? পাণ্ডা বললে, 'এখন কী? প্রতি বছর সেই বিশেষ দিনে তৈরি হবে কাগজের গজ, গ্রাহ। তার পর দুই নৌকোয় তাদের নিয়ে এই জলের উপরে লড়াই করবে দুই দল লোক। লড়াই হতে হতে যখন কেউ হার মানবে না তখন শেষ মুহূর্তে রঙ্গনাথজি গরুড়ে চেপে আসবেন। এসে তীক্ষ্ণধার চক্র দিয়ে গ্রাহের শিরশ্ছেদ করবেন। অনেক লোক আসে, মেলা বসে, জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়।'

মন্দিরের পিছন দিকের বড়ো তোরণের পাশে তেতলাবাড়ি-সমান উঁচু একটা গ্যারেজ; সামনের দিকটা মাটির দেয়াল দিয়ে আগাগোড়া গাঁথা।

কী এটা? এভাবে বন্ধই বা কেন?

পাণ্ডা বলল, 'ওর ভিতর রথ আছে। সারা বছর এমনিভাবে বন্ধ করে রাখে; রথের সময় দেয়াল ভেঙে রথ বের করে আনে। না হলে 'তীর্থযাত্রী'রা সবাই দেখে ফেলবে, রথের সময়ে আর ভিড় হবে না; বলবে, ও তো দেখেই নিয়েছি আগে।'

মানসিংহের মন্দির। নীচে থেকে দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন লালপাথরের প্রাচীন প্রাসাদ একটি। অলিন্দ বারান্দা থাম প্রকোষ্ঠ কত সেখানে। মাটি হতে চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে উপরে নাটমন্দিরে। সব মিলিয়ে কী মানানসই নকশা পাথরের

গাঁথনির।

এই সেই পুরাতন মন্দির রূপ গোস্বামীর গোবিন্দের। মানসিংহ তৈরি করে দিয়েছিলেন রূপের আকাঙক্ষা অনুযায়ী। কী সুন্দর, আর কী উঁচু!

পাণ্ডা বললে, 'এ আরো উঁচু ছিল। আগে এই মন্দিরের মাথায় রোজ সন্ধ্যায় বাতি জ্বলত। একদিন অমাবস্যা রাত্রে দিল্লিতে নিজ ঘরে বসে বাদশা ঔরঙ্গজেব এই আলো দেখতে পান। বলেন, ও কার রোশনাই? আমার প্রাসাদ ডিঙিয়ে বাতি জ্বলবে এত সাহস? তক্ষুনি সৈন্যসামন্ত ডেকে হুকুম করলেন—যাও, ভাঙো, লুট করো। এদিকে জয়পুরের রাজাও সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখেন কি, গোবিন্দজি এসে বলছেন—আমাকে নিয়ে এসো শিগগিরই, ওরা আসছে মন্দির ভাঙতে। রাজা পর-দিনই লোক পাঠিয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন তিনজনকেই নিয়ে গেলেন। বাদশার সৈন্যরা এসে দেখে মন্দির খালি। তারা মন্দিরের মাথাটা ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে ফিরে চলে গেল।'

ভাঙা অবস্থাতেই এ মন্দির কত বিরাট লাগছে, না জানি তবে কী ছিল আগে।

দাদা বললেন, 'আগে তো শুনি, এর উপর আরো চারতলা-সমান উঁচু মন্দিরের চুড়ো ছিল।'

নাটমন্দিরে ঢুকে উপর দিকে তাকাই, গম্বুজের মতো গোল ছাদজোড়া পাথরের পদ্ম; তারই গায়ে ঝুলছে ঝাঁকে ঝাঁক—। বড়দিকে বলি, 'দেখো দেখো, মৌমাছির চাক।' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দেখে তিনি বলেন, 'তাই তো, কতগুলি চাক, বাসা বেঁধেছে নিরাপদ স্থান দেখে।'

মৌমাছি নয়, আসলে চামচিকার দল। দিনের আলোতে জড়ো হয়ে ঝুলছে অমনি করে। এত উঁচুতে চামচিকাগুলিকে মৌমাছির মতোই মনে হচ্ছিল। চট্‌ করে সবারই তাই মনে হয় কি না দেখলাম পরীক্ষা করে বড়দিকে দিয়ে।

মন্দিরের ভিতরে গোবিন্দের বিগ্রহ। ইনি নকল। খালি মন্দির রাখতে নেই, তাই পরে প্রতিনিধি স্থাপিত হয়েছে। আসল গোবিন্দ তো জয়পুরে। গোবিন্দের দর্শন সেরে বাইরের দিকে মন্দিরের গা ঘেঁষে সরু সিঁড়ি বেয়ে ছোট্ট একটি দরজার কাছে নিয়ে গেলেন ব্রজরমণ আমাদের। কী যেন বিশেষ কী দেখাবেন এখানে। ঢুকেই বুঝলাম, এ জায়গায় যাত্রীরা আসে না বড়ো কেউ। ভালোভাবে জানা না থাকলে নজরেই পড়ে না এ স্থান। জনদুয়েক বৈষ্ণব বসে সেখানে আটার নেচি কাটছে, একজন উনুনে কড়াই চাপিয়ে তরকারি রাঁধছে, বোধ হয় ভোগের জন্য। আমরা ঢুকতে যেন একটু বিরক্তই হয় তারা। ব্রজরমণের কাতর ইঙ্গিতে একজন আটা-সমেত কাঠের বড়ো বারকোশটা সরিয়ে পথ খালি করে দেয়। দেখি, সরু সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার সিঁড়ি সেখানে। মাটির পিদিম হাতে নিয়ে সেই আলোতে ধাপে ধাপে পা ফেলে নামতে নামতে শেষেরটায় এসে থামি। ছোট্ট একটা চৌবাচ্চার মতো চৌকোনা একটুখানি জায়গা। কাঁচা মাটি, স্যাঁৎসেঁতে ভাব; একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে ধিকি ধিকি; দু-চারটি সাদা ফুল ছড়ানো পড়ে আছে কালো মাটির বুকে, কেউ হয়তো পুজো দিয়ে গেছে এক সময়ে।

ব্রজরমণ বললেন, 'ইহাই গোমাটিলা। এইস্থানেই গোবিন্দজি আত্মপ্রকট করেন।'

বড়দি বললেন, 'জান, কী আশ্চর্য মহিমা! কেউ জানত না এখানে কী। এক কামধেনু রোজ সকালে এখানে নেমে এসে ঠিক গোবিন্দের মাথার উপর দাঁড়াত, আর আপনা হতে বাঁট হতে দুধ ঝরত। স্বপ্ন পেয়ে রূপ যখন জিজ্ঞেস করলেন গোবিন্দজিকে, তুমি যে আছ সেখানে, তা কী খাও তুমি? গোবিন্দ বললেন, কামধেনুর দুধ খাই রোজ। সেই কামধেনুর দুধে ভেজা আর্দ্রভূমিরই তো নিশানা দিলেন রূপকে তিনি।' বলে বড়দি ভিজে মাটিটুকুতে হাত বুলোতে লাগলেন।

গোমাটিলা হতে উঠে বেরিয়ে আসছি, গোবিন্দমন্দিরের দক্ষিণ দিকে সরু দরজাটা খুলে এক বৈষ্ণব হাসিমুখে হাত নেড়ে বলে উঠলেন—

'কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ॥

'শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁর নাম লীলা ও লীলাস্থলীও নিত্য।

'এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥

'কখনো আবির্ভাব, কখনো তিরোভাব ; নাশ নেই। লোকলোচনের গোচরীভূত হওয়া-না-হওয়া এইমাত্র প্রভেদ।'

বলতে বলতে—দরজার চৌকাঠে থুতি রেখে শুয়ে ছিল দিন-দুয়েকের ধবলী বাছুর একটি, তাকে কোলে তুলে পাশে সরিয়ে নেমে এলেন আমাদের কাছে। বললেন, 'তিন শিলামূর্তি গড়েছিলেন ব্রজনাভ। উষা—ব্রজনাভের মা—বললেন, বাবা, আমাকে কৃষ্ণমূর্তি গড়ে দাও। ব্রজনাভ কৃষ্ণমূর্তি গড়ে নিয়ে এলেন ; মা দেখে বললেন, এ'র মুখখানি ঠিক হয়েছে, আর কিছু ঠিক হয় নি। সেই মূর্তি হল—গোবিন্দ। ব্রজনাভ আবার এক মূর্তি গড়ে আনলেন ; বললেন, দেখো তো মা, এবার ঠিক হয়েছে কি না। মা বললেন, বাবা, এ'র চরণযুগল ঠিক হয়েছে, অন্যান্য অঙ্গ ঠিক হয় নি। সেই মূর্তি হল—মদনমোহন। ব্রজনাভ আবার আর-এক মূর্তি গড়ে আনলেন ; বললেন, এবারে দেখো তো মা, তোমার মনের মতো হয়েছে কি না। মা বললেন, হ্যাঁ বাবা, এ'র বক্ষঃস্থল ঠিক হয়েছে। ইনি হলেন—গোপীনাথ। সেই গোবিন্দেরই এই মন্দির। হা রাই, হা কৃষ্ণ, রূপ কাঁদেন। স্বপ্নে কৃষ্ণ রূপকে দেখা দেন, বলেন, রূপ, ব্রজনাভ কর্তৃক আমি গোবিন্দ বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম, তোমারই অদূরে গোমাটিলায় মৃত্তিকামধ্যে অবস্থান করছি, তুমি আমাকে উত্তোলন করো। তোমার হাতের সেবা পাবার জন্য আমি বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছি। তখন রূপ গোবিন্দজিকে তুলে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মানসিংহ জয়পুর হতে লাল পাথর এনে এই বিরাট মন্দির তুলে দিয়েছিলেন।'

দাদা বললেন, 'চলুন, কোথাও বসে আপনার কাছে কিছু কথা শুনি।'

বৈষ্ণব আমাদের নিয়ে এলেন মন্দিরের ভিতরে, একেবারে বিগ্রহের সামনে। একখানা কম্বল বিছিয়ে দিলেন, বসলাম আমরা।

বৈষ্ণবের নাম ভগবান দাস। তিনি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণের বিহারের পর কালের করাল দংষ্ট্রায় সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ; কেবল শাস্ত্রাদিতেই বৃন্দাবনের মহিমার

উল্লেখ থাকে। তখন ব্রজেন্দ্রনন্দনই নদিয়াতে শচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হয়ে বৃন্দাবন প্রকাশ করেন। তিনি একে একে ভক্ত গোঁসাইদের পাঠান এখানে, লীলা-স্থলীর অন্বেষণে। নিজেও আসেন ; কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারেন নি। রূপ-সনাতনের উপর ভার দিয়ে নীলাচলে চলে যান।

'তখন লোকালয়হীন অরণ্যসঙ্কুল বৃন্দাবন। রূপ-সনাতন বৃক্ষপল্লীর নীচে বসে ভজন করেন আর বৃন্দাজির নিকট প্রার্থনা জানান, যে বৃন্দাবনকে তুমি নিজের হাতে সাজিয়েছিলে, তাকে আবার ফিরিয়ে দাও।

'সত্যবতী রাজকন্যা—ইনিই বৃন্দা। বৃন্দা তপস্যা করেন কৃষ্ণকৃপা লাভের আশায়। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলেন। বৃন্দা বললেন : তোমার সেবার জন্য আমি এক বন প্রস্তুত করব ; তাতে এক কালে ছয় ঋতুর সমাবেশ হবে, নানা ফুলফলাদির সম্ভাব, পক্ষীসমূহের সুমধুর কাকলি, কল্পবৃক্ষ, কল্পলতা, কামধেনু, মণিমাণিক্য-খচিত প্রাসাদাদিতে বন পরিপূর্ণ থাকবে। এই বর তুমি দাও প্রভু যে, তুমি নিত্য তোমার পরম কান্তার সঙ্গে সেই বনে বিহার করবে।

'ভক্তবশ্য কৃষ্ণ বললেন, তথাস্তু, তথাস্তু, তথাস্তু। কিন্তু রে বৃন্দা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি নিত্য আমার কান্তার সহিত বিহার করব তাতে তোমার কী লাভ হবে?

'বৃন্দা বলে, প্রভু নিত্য আমি যুগল-রূপ দর্শন করব।

'নিজদেহসুখ নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণসুখ লাগি করে সর্ব কার্য সার॥

'তোমরা একত্রে বিহার করে যত আনন্দ পাবে তার শতগুণ আনন্দ পাব আমি তোমাদের যুগলমূর্তি দর্শন করে। আরো একটা বর চাই প্রভু ; বলো, তুমি এই বন ছেড়ে কোথাও যাবে না।

'কৃষ্ণ বললেন, আচ্ছা, তথাস্তু। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

'ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার। কৃষ্ণ এলেন বৃন্দার জন্য পরম মধুর লীলা প্রকট করতে। সেই হতে নিত্যলীলা হয় বৃন্দার এই বৃন্দাবনে। চৈতন্যভাগবত বলেন,

'অদ্যাপিও নিত্য লীলা করে গোরা রায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

'আমি হতভাগ্য, এগারো বছর বয়সে বৃন্দাবনে আসি ; আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর করুণার দিকে তাকিয়ে আছি। কবে করুণা হবে, কবে দর্শন পাব।' বলতে বলতে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললেন ভগবান দাস। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলেন—

'বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন॥

'ব্রহ্মসংহিতা বলছেন, স্বয়ং লক্ষ্মী যে বৃন্দাবনে কান্তা, কান্ত যেখানে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষবল্লী যেখানে কল্পতরু, যে স্থানের ভূমি চিন্তামণিময়, জল যেখানের অমৃত, কথাই যেখানে গান, সাধারণ গমনই যেখানে নৃত্য, বংশী—কৃষ্ণের মোহন মুরলীই—যেখানে প্রিয়সখী—সেই বৃন্দাবন কি প্রেমচক্ষু ছাড়া দেখা যায়।

'প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।'

'হায়, আমার তো সেই প্রেমচক্ষু আজও হল না।'

ভগবান দাস চোখের জল মুছে দৃষ্টি নামিয়ে নিজেকে শান্ত করেন।

দাদা সহজে কাউকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন না। বড়দিকে কতবার তিরস্কার করেছেন, 'রাস্তায় ঘাটে যাকে পাও, পা ছুঁতে যাও কেন? পা না ছুঁলে কি আর ভক্তি দেখানো যায় না?' সেই দাদা দু হাতে ভগবান দাসের পদধূলি নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালেন; বললেন, 'আজ আসি। আবার একদিন আপনার কাছে এসে বসবার বাসনা রইল।'

পথে নেমে বলি, 'সবই ভালো; কিন্তু অমন ভেউ ভেউ করে কাঁদেন কেন?'

দাদা বললেন, 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, ভগবানের নাম শুনে যখন কারো চোখের জল পড়ে, তা বহু পুণ্যের ফল তার। নইলে এমন হয় না।'

ব্রজরমণ বললেন, 'শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনপরায়ণ ভাগবতের মুখে শ্রীরাধাগোবিন্দের মহিমা শ্রবণ বড়োই ভাগ্যের কথা। প্রভুর অশেষ অনুকম্পা ব্যতীত মোটেই সম্ভব নহে।'

বড়দি বললেন, 'পড় নি তুলসীদাসের রামচরিত-মানস? তুলসীদাস লিখেছেন, বিভীষণ হনুমানকে বলছে—

'অবমোহি ভরোস ভা হনুমন্ত।
বিনু হরি কৃপা মিলহিঁ নহি সন্তা॥

'হে হনুমান, এখন আমার ভরসা হয়েছে, আমার উদ্ধারে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, তোমার মতো ভাগবতের সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে।'

'হরির কৃপা ছাড়া হরিভক্তির মিলন—অসম্ভব। এই তুলসীদাসই আর-এক জায়গায় সাধন সম্পর্কে লিখেছেন—

'বিন সত্‌সঙ্গ ন হরি কথা।
তেহি বিন মোহ ন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥

'সৎসঙ্গ না হলে হরিকথা হবে না, আর হরিকথা না শুনলে মোহও দূর হবে না, এবং মোহ দূর না হলে শ্রীরামপদারবিন্দে মন-মধুকরও প্রমত্ত হবে না।'

রূপ সনাতন দু ভাই। গৌড়ের নবাব হোশেন শাহের দরবারে সনাতন প্রধানমন্ত্রী, রূপ অর্থসচিব।

একই সময়ে দু ভাইয়ের মনে প্রবল উৎকণ্ঠা জাগে। সুযোগ বুঝে রূপ সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এলেন; সনাতন পড়লেন আটকা।

রাজকার্য আর ভালো লাগে না সনাতনের। নবাবও ছাড়েন না তাঁকে। অসুস্থতার ভান করে সনাতন বাড়িতে বসে থাকেন, পণ্ডিতদের নিয়ে ভাগবত-তত্ত্বরস আস্বাদন করেন। নবাব বৈদ্য পাঠান, বৈদ্য অসুখ খুঁজে পায় না সনাতনের শরীরে।

নবাবের মনে সন্দেহ জাগে; একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। বলেন, 'তুমি আমার ডান হাত। তোমাকে ছাড়া রাজকার্য পরিচালনা অসম্ভব। অসুখের ছল করে সরে পড়তে চাও—তোমার অভিলাষ কী?'

সনাতন মনের কথা সব খুলে বলেন। নবাব রাজি হন না। বলেন, 'তোমাকে

আমার চাই-ই।'

সনাতন কাতর হয়ে অনুনয় বিনয় করেন, বলেন, 'আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না ও কাজ।'

নবাবের জেদ বেড়ে যায়। সনাতনকে বন্দী করে কারাগারে রাখেন ; দ্বারে কড়া পাহারা নিযুক্ত করেন।

এমন সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বাধে। নবাব চলে যান উড়িষ্যায় যুদ্ধ করতে। সনাতন এই ফাঁকে বহু অর্থ ঘুষ দিয়ে পালিয়ে যান কারাগার হতে। পার্বত্য পথে হেঁটে কাশী যাত্রা করলেন বিনা সম্বলে, একটি মাত্র ভৃত্য সঙ্গে। দিনমানে হাঁটার পর রাত্রিবেলা পথে এক ভৌমিকের গৃহে আশ্রয় নিলেন। ভৌমিক তাঁকে এত বেশি আদর-যত্নে আপ্যায়িত করল যে, সনাতনের মনে সন্দেহ জাগল। তিনি ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'তোমার কাছে কি কিছু অর্থ আছে?'

ভৃত্য বললে, 'আজ্ঞে, পথে যদি লাগে কোনো কাজে, তাই এই সাতটি মোহর লুকিয়ে সঙ্গে এনেছি।'

শুনে সনাতন রুষ্ট হলেন ; বললেন, 'তোমাকে আমি বার বার নিষেধ করেছি—সঙ্গে কিছু নিয়ো না। কেন তুমি আবার এই কাল যম সঙ্গে আনতে গেলে? দাও সব আমার হাতে।'

সনাতন সেই সাতটি মোহর নিয়ে ভৌমিককে বললেন, 'এই কটিই মাত্র আমার আছে, তুমি নাও ; নিয়ে আমাকে এই পর্বত পার করিয়ে দাও। তোমার পুণ্য ও অর্থ লাভ দুই-ই হবে।'

ভৌমিক তখন হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার কাছে এক জ্যোতির্বিদ আছেন ; তাঁর দ্বারা আমি আগে হতেই জানতে পারি যে, তোমার কাছে সাতটি মোহর আছে। ভেবেছিলাম, আজ রাত্রে তোমাদের হত্যা করে সেই মোহর আমি আত্মসাৎ করব। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান, আগে হতেই দিয়ে দিলে। এ মোহর আমি আর নেব না। অর্থ বাদ দিয়ে পুণ্যটুকুই নিয়ে তোমায় পর্বত পার করে দেব।'

সনাতন বললেন, 'তুমি যদি এ মোহর না নাও তবে অন্য কেউ আমাকে মেরে মোহর নিয়ে নেবে। কাজেই এগুলি তুমি গ্রহণ করে আমার প্রাণ রক্ষা করো।'

সনাতন পর্বত পার হয়ে হাজিপুরে এসে একমাত্র সঙ্গী ভৃত্যটিকেও বিদায় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসলেন। সেখানে হঠাৎ তাঁর ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা হল। সনাতনকে দেখে ভগ্নীপতি বড়ো খুশি। বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন। সনাতন বললেন, 'না, আর কোথাও যাব না। আমাকে তুমি গঙ্গা পার করে দাও, কাশী যাব।'

তখন ভগ্নীপতি একখানা ভোটকম্বল সনাতনকে দিয়ে গঙ্গা পার করে দিলেন। ভোটকম্বল গায়ে দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সনাতন কাশী এলেন।

মহাপ্রভু তখন কাশীতে ছিলেন। সনাতনকে দেখে দৌড়ে এসে আলিঙ্গন করলেন, কুশলপ্রশ্ন করলেন। সনাতন তাঁর পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রভুর চরণ দর্শন করলাম, আর আমার কুশলের বাকি কী?'

সনাতন আছেন প্রভুর কাছে, পরমানন্দে। একদিন সনাতনের মনে হল, প্রভু যেন তাঁর ভোটকম্বলখানার দিকে একবার তাকালেন। সেইদিনই সনাতন গঙ্গার

ঘাটে ভোটকম্বলখানা এক ভিখিরিকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে দিয়ে ফিরে এলেন। দেখে, মহাপ্রভু হেসে বললেন,

'যে কৃষ্ণ খণ্ডিল তোমার সব বিষয়-রোগ।
সে কোন্ রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়ে মাধুকরী গ্রাস।
কার্য সিদ্ধ নহে লোকে করে উপহাস'

সনাতন ইঙ্গিত বুঝলেন, তিনি তখন তপন মিশ্রের একখানি পুরাতন ধুতি চেয়ে নিলেন। মস্তক আগেই মুণ্ডন করেছিলেন। এবারে সেই ধুতিখানা ছিঁড়ে কৌপীন ও বহির্বাস বানিয়ে গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী সনাতন পুরোপুরি বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করলেন।

এক ব্রাহ্মণের দয়া হল, আহা, কোথায় ঘুরে ঘুরে সনাতন ভিক্ষা নেবে! সনাতনকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন ; বললেন,

'সনাতন যাবৎ তুমি কাশীতে রহিবে
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥'

তা কী হয়! সনাতন রাজি হন না।

'সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্রে ভিক্ষা লব॥'

মাধুকরী হল মধুকরের বৃত্তি। মধুকর যেমন একই ফুল হতে প্রয়োজনীয় মধু সংগ্রহ করে না, প্রতি ফুল হতে সামান্য সামান্য মধু সংগ্রহ করে, তেমনি এই মাধুকরী-বৃত্তিমান বৈরাগী ব্যক্তি একজনের গৃহ থেকেই উদরপূর্তির উপযুক্ত আহার্য গ্রহণ করেন না। প্রতি গৃহ থেকেই সামান্য সামান্য আহার্য গ্রহণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। তাই সনাতন বললেন—'ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্রে ভিক্ষা লব।' সনাতন জীবনের শেষ পর্যন্ত এইরকম কঠোর বৈরাগ্য পালন করে গেছেন।

কাশীতে কিছুকাল থাকার পর মহাপ্রভুর নির্দেশে সনাতন বৃন্দাবনে চলে আসেন। সেই অবধি তিনি বৃন্দাবনেই ছিলেন। এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে মায়া বসে যায় পাছে, তাই এক-এক রাত্তিরে এক-এক গাছের তলায় আশ্রয় নিতেন। দিনরাত ভজন করতেন।

'ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণগানে
স্মরণেতে সকলি গোঁয়ায়।
চারি দণ্ড শুয়ে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়।'

সনাতনের গল্পে মাততে মাততে চলে এলাম এক টিলার উপরে। সনাতনের ভজন-স্থলী এটি। এই নির্জনে সনাতন সারাক্ষণ সাধন-ভজন করতেন, দিনে একবার মাত্র ভিক্ষেয় বের হতেন—সেই মথুরায়। খুদকুঁড়ো যেদিন যা পেতেন দিনান্তে তাই আহার করতেন। এই সেই বৈষ্ণব যাঁর কাছে মদনমোহন একটু নুন চাইতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলেন।

একদিন সনাতন ভিক্ষে করে ফিরে এসেছেন ; সেদিন মাত্র কিছুটা আটা

পেয়েছেন। তাই জলে মেখে মুঠি মুঠি কয়েকটা আটার গুলি ক'রে—এখানে এরা একে বলে 'আঙ্গাকড়ি'—সেই আঙ্গাকড়ি ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে মদনমোহনকে খেতে দিলেন। মদনমোহনের খাবার পরে তিনি প্রসাদ পাবেন। মদনমোহন আঙ্গাকড়ি মুখে দিয়ে বললেন, 'একটু নুন ছাড়া এ জিনিস খাই কী করে? একটু নুন দাও-না।'

সনাতন বললেন, 'নুন কোথায় পাব আমি? যা পেয়েছি তাই দিয়েছি; খেতে হয় এই-ই খাও। আজ তুমি নুন চাইছ, কাল শাক চাইবে, পরশু বলবে ডাল দাও; আমি বৈরাগী মানুষ, মাধুকরী করে দিন চালাই, তোমার ইচ্ছেমতো জিনিস কোথায় পাব? তোমার দরকার হয় তুমি নিজে সংগ্রহ করো।'

এক দিন, দু দিন, তিন দিন যায়—টিলার গা ঘেঁষে, আজ যেখানে বালি, যমুনা তখন বইত এখান দিয়ে, সদাগরেরা নৌকো নিয়ে ব্যাবসা-বাণিজ্যে যেত-আসত এই পথে—এখন একদিন এক লবণ-ব্যবসায়ীর নৌকো আটকে যায় এই টিলার ঠিক নীচে এসে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি—নৌকো আর চলে না কিছুতেই। লোকেরা তখন নিরুপায় হয়ে টিলার উপরের সাধুকে দেখিয়ে সদাগরকে বলে, 'আমরা তো কিছু করতে পারলাম না, তাঁর কাছে গিয়ে দেখো, তিনি যদি কৃপা করে উপায় বাৎলে দেন।'

সদাগর গিয়ে সনাতনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। বলে, 'ঠাকুর, তুমি কী চাও বলো, আমি তাই দেব; আমার নৌকো ছাড়িয়ে দাও।'

সনাতন বললেন, 'আমার তো কিছুরই দরকার নেই, তবে ঐ কুটিরে একটি বালক আছে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, যদি তার কিছু দরকার থাকে।'

কুটিরে গিয়ে সদাগর দেখে, বালক কোথায়! বালকের বদলে এক বংশীধারী মূর্তি সেখানে। বণিক হেসে বললে, 'ও, বুঝেছি। ছিলে বালক, হলে বংশীধারী। এই প্রতিষ্ঠাই চাও তুমি তবে? তাই হোক। এই যাত্রায় যা লাভ হবে সব দিয়ে তোমার মন্দির গড়ে দেব—বলে সদাগর নৌকোয় উঠে এল। নৌকো চড়া ছেড়ে তর্ তর্ করে স্রোতের মুখে এগিয়ে চলল।

সে যাত্রায় সদাগরের ষোলো গুণ লাভ হল নুনের ব্যবসায়ে। ফিরতি পথে সব দিয়ে সে মদনমোহনের মন্দির গড়ে সেবার ব্যবস্থা করে দিল। সদাগরের নাম রামদাস কাপুর, বাড়ি পাঞ্জাব প্রদেশের মুলতান জেলায়।

এই সেই ব্রজনাভর মদনমোহন, ধরা দিলেন সনাতনের হাতে।

পুরোনো মন্দিরের ভাঙা চূড়োর উপরে ঘাসের গুচ্ছ, বটের শিকড় জড়াজড়ি করে ঝুলছে এখন। পাশে মানসিংহের তোলা আলাদা মন্দিরে মদনমোহনকে নিয়ে রাখেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন—তিনজনেরই মন্দির তুলে দিয়েছিলেন মানসিংহ। তার মধ্যে রূপের ঠাকুর গোবিন্দের মন্দিরই সব চেয়ে বড়ো। মানসিংহ ছিলেন রূপের ভক্ত।

ইঁটের গাঁথনি দিয়ে ছোট্ট একটি চুড়োর মতো মাথায় বসিয়ে সনাতনের ভজন-স্থলী বাঁধিয়ে রেখেছে ভক্তেরা পরে। ভিতরে কাঁচা মাটির বেদী। কোনায় লাল মাটির প্রদীপের স্থির ক্ষীণ শিখার আশেপাশে শুভ্র জুঁই মালতী কটি মেঝেতে লুটিয়ে সনাতনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানায়।

বারে বারে ইচ্ছে হচ্ছিল, প্রদীপের গা ছুঁয়ে ঐ-যে মালতীটা পড়ে আছে, হাত বাড়িয়ে তুলে এনে সেটিকে খোঁপায় গুঁজে রাখি।

এই টিলার পাশেই আর-একটি টিলা। একে বলে দ্বাদশাদিত্য-টিলা। এর নীচেই ছিল কালীদ' এককালে। বনে-জঙ্গলে ঢাকা এ স্থান সনাতন উদ্ধার করেন। এখনও এখানে জনবসতি বিরল। চার দিকে ঝাপ্ড়া-ঝোপ্ড়া জঙ্গল, জীর্ণশীর্ণ গাছে ভরা বন।

ব্রজরমণ বললেন, 'কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন করিয়া শ্রীযমুনাজির জলে অত্যন্ত শৈত্য বোধ করায় শীত-নিবারণ-উদ্দেশ্যে এই টিলার উপরে উঠিয়া আসেন। তখন দ্বাদশ আদিত্য এককালে প্রকটিত হইয়া তাঁহার শীত নিবারণ করেন। সেই হেতু ইহার নাম দ্বাদশাদিত্য-টিলা।'

এই টিলার আরো একটি বিশেষত্ব আছে। মহাপ্রভু সনাতনকে খবর পাঠিয়েছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফত ; বলেছিলেন, 'সনাতন, তুমি বৃন্দাবনে আমার জন্য একটু জায়গা বেছে রেখো।'

খবর পেয়ে নির্জনে যমুনার তীরে এই টিলার উপরে সনাতন মহাপ্রভুর জন্য জায়গা ঠিক করে রাখলেন।

মহাপ্রভু এর পরে বৃন্দাবনে এসেছিলেন কি না, তিনি এখানে বসেছিলেন কি না, ভক্তরা তা নিয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ খোঁজেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মহাপ্রভু যখন বলেছেন তিনি আসছেন, সনাতন যখন জায়গা নির্বাচন করে রেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি এসেছেন এবং অবস্থান করছেন। তাই মহাপ্রভুর জন্য আসন পাতা আছে আজও এখানে।

দ্বাদশাদিত্য-টিলার নীচে সনাতনের সমাধিস্থান। গুরুপূর্ণিমায় তিনি তিরোধান করেন। ঐ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বড়ো উৎসব হয় এখানে তাঁর তিরোধান উপলক্ষে।

পাশে একটি গ্রন্থসমাধি। গোস্বামীপাদগণ যেসব গ্রন্থ লিখে যান, সবই তালপাতার উপরে। তখনকার দিনে তাঁদের নিজেদেরই থাকবার স্থান ছিল না, তা গ্রন্থাদি আর কোথায় রাখবেন। কখনও রাখতেন বৃক্ষকোটরে, কখনও পাথর চাপা দিয়ে, কখনও-বা গুহায় গহ্বরে। ফলে অনেক গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায় জলে, রোদে, কীটের উৎপাতে। যেগুলির লেখা আর পড়া যায় না, বৈষ্ণবের ভাষায় 'পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া পড়িল', তখন সেইসব গ্রন্থগুলিকে একসঙ্গে করে এইভাবে সমাধি দেওয়া হল। শাস্ত্রগ্রন্থ নিজের হাতে নষ্ট করা প্রাণীহত্যাতুল্য।

বড়দি সমাধির গায়ে হাত বুলিয়ে প্রদক্ষিণ করেন আর বলেন, 'আহা-হা রে! কত না জানি মূল্যবান ছিল এগুলি। জানতেও পারল না কেউ।'

যমুনার পাড় ধরেই চলেছি। লীলা তো পাড়ে পাড়েই। কতকাল আগের কথা ; তবু চলতে চলতে যখন এঁদের মুখে বর্ণনা শুনি, মনে হয় যেন পূর্বরাত্রে ঘটে-যাওয়া ঘটনা সব। এমনি স্পষ্ট অনুভব আসে স্থান কাহিনী মিলিয়ে।

এই সেই কেলিকদম্ব গাছ, যে গাছে উঠে কৃষ্ণ কালীদ'য়ে ঝাঁপ দেন। গাছের ডালগুলি সব যমুনার উপর ঝুঁকে পড়েছে। এই কেলিকদম্বের ডালে ডালে কৃষ্ণ-রাধা নাম আপনা হতে ফুটে আছে ; জ্ঞানচক্ষু যাঁদের উন্মীলন হয়েছে তাঁরাই দেখতে

পান। তবে, এবড়োখেবড়ো ডালে রাধাকৃষ্ণ অক্ষর কল্পনায় আমরাও যে না দেখতে পাই তা মুখ ফুটে বলার সাহস কী! দেখেছিলেন রামকৃষ্ণদেব, দেখেছিলেন বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী।

বড়দি বললেন, 'হয়, নাম ফুটে বের হয়। গাছের ডাল তো সামান্য কথা, শুনেছি, বিজয়কৃষ্ণের গা ফুটে রাধাকৃষ্ণ নাম বের হয়েছিল।'

কেলিকদম্বের ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা ফল সংগ্রহ করে ঝোলাতে পুরলাম, অভিজিৎকে দেখাব বাড়ি গিয়ে।

ব্রজরমণ উপর দিকে মুখ তুলে কেবলই এ-ডাল ও-ডাল খুঁজছিলেন। বললেন, 'স্থানটি সাধন-ভজনের বড়োই অনুকূল। বড়ো বড়ো বৃক্ষসমূহ চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থানটিকে যেন সংসারের ভীষণ তপন-তাপ হইতে রক্ষা করিয়া সুশীতল ছায়ার দ্বারা ভগবন্নিষ্ঠ জনগণকে আবাহন করিতেছে।'

এলাম সূর্যঘাটে। এই সেই প্রাচীন সূর্যঘাট। এই ঘাটেই রাজকুমারী রাধা আসতেন রোজ সকালে সূর্যপূজার ছল করে; আর আসতেন কৃষ্ণ পুরোহিত-বেশে সেজে, ধেনুবেণু মাঠে ফেলে।

সেই চিরসনাতন ছলচাতুরী! আজও চলে আসছে তা মানবলীলার ভিতর দিয়ে। তাই এঁদের লীলা অনুভব করতে পারি মনে বড়ো সহজে।

লীলায় ছাওয়া বৃন্দাবন। এই সেই যমুনা-পুলিন। শহরের ভিতরে বালির উঠোন। উঠোন ঘিরে দোতলা সব বাড়ি। যে বছর বর্ষাতে জল ওঠে এখানে, মহা সোরগোল হয়। সমগ্র ব্রজবাসী এসে স্নান করে যমুনা-পুলিনে। বলে, ঠিক এই সময়েই কৃষ্ণ পুলিনবিহার করেছিলেন। অনেক ক্ষণ, কাল পেরিয়ে তবে আসে এই শুভযোগ।

একদল গোরু চরছে বালিতে, বোধ হয় গোয়াল থেকে বেরিয়েছে সবে, যাবে যমুনার তীরে কচি ঘাসের লোভে।

একে যমুনা-পুলিন, তায় গোপদরজ, বড়দি খাবলে একমুঠো বালি তুলে নিলেন; বললেন, 'ঠাট্টা নয়—

'ধূলি নয় রে, ধূলি নয় রে, গোপীর পদরেণু।
এই ধূলি গায়ে মেখেছে নন্দের নন্দন কানু॥'

জ্ঞানগুধ্‌রীতে এলাম। এই সেই জ্ঞানগুধ্‌রী, যেখানে উদ্ধব এসেছিল কৃষ্ণ-বিরহে আকুল গোপীদের সান্ত্বনা দিতে। এসে সান্ত্বনা দূরের কথা, গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম দেখে উদ্ধব তাদের পদধূলি মাথায় নিয়ে ফিরে যায়।

এই সেই চীর-ঘাট। কৃষ্ণ এখানে বস্ত্রহরণ করেছিলেন। নিরাবরণ গোপীরা যমুনায় নাইতে নামলে তাদের সব শাড়ি জামা নিয়ে কৃষ্ণ গিয়ে গাছে উঠে লুকিয়ে রইলেন। সেই এই গাছেই তিনি উঠেছিলেন। নানা রঙের কাপড়ের টুকরো হাওয়ায় উড়ছে ডালে ডালে—যাত্রীরা বেঁধে দিয়ে যায় ফালি কাপড় ইচ্ছেমতো; দেখে সেদিনের সেই লীলা উদ্দীপন হয় তাদের মনে।

বড়দি বললেন, 'লীলা আর আলাদা আলাদা করে কত দেখব। এর প্রতি ধূলি-কণা তাঁর লীলাস্মৃতিতে মাখা। চলো বরং মন্দিরগুলো আগে শেষ করি। এই দিনে

কত রত্নালংকারে সেজেছেন ব্রজের রাখাল। এই রূপ তো আর রোজ দেখতে পাওয়া যায় না।'

বৃন্দাবনের অলিতে-গলিতে ঠাকুর—সাড়ে পাঁচ হাজার মন্দির। এঁদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েক জনকে খুঁজে বের করতে হলেও একজন অভিজ্ঞ লোক সঙ্গে চাই, যে নাকি রাস্তাঘাটের এই গোলকধাঁধা পার করিয়ে নিয়ে চলবে আমাদের। পাণ্ডার হাতে ভরসা পাই না।

ব্রজরমণ বললেন, 'আপনারা যদি কৃপাপূর্বক কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করেন তবে আমার গুরুদেব স্বর্গীয় মনোমোহনদাস বৈষ্ণবের কুঞ্জে গিয়া বর্তমান মহান্ত নিত্যগোপাল দাসজিকে সঙ্গে লইতে পারি।'

'সে তো উত্তম প্রস্তাব।'

ব্রজরমণ বললেন, 'তবে পথ কিছু দুর্গম ; অনেকগুলি গলি অতিক্রম করিতে হয়।'

বলি, 'ক্ষতি কী! বৃন্দাবনের আর-একটা দিকও দেখা হয়ে যাবে।'

চললাম শহরের বুকের উপর দিয়ে। দু পাশে পিতল, কাঁসা, লোহা, কাঠ, বই, খাবার, কাপড়, হাঁড়ির দোকানে দোকানে ঠাসা রাস্তা। একেবারে গায়ে গায়ে চাপা ; একরত্তি ফাঁক নেই কোনো দুটোর মাঝে। সরু বাঁধানো পথ মাঝখানে, লোকের স্রোতে উজান-ভাটা বইছে তাতে। পথ ছেয়ে পুরু আবিরে যেন লাল কার্পেট বিছিয়েছে পর পর গলিতে। তার উপর দিয়ে লোক চলেছে পায়ে পায়ে লাল আবির উড়িয়ে ; যেন গোধূলি-লগ্ন হাসছে মুখ তুলে। মাথার উপরে আবিরের মেঘে আকাশের নীল ঢেকেছে আজ। উপরে নীচে লালের খেলা ; তারই ভিতর দিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে মনের আনন্দে নেচে গেয়ে চলেছে রঙে রাঙা ব্রজবাসীর দল। যেদিকে তাকাই, রাঙা হাসি যেন লুটোপুটি খায় ; দু পাশের নর্দমায় রাঙা জল বয়ে যায়।

সরু থেকে সরুতর নানা গলি ঘুরে মনোমোহন দাসের কুঞ্জে আসি। ভেজানো দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে ছোট্ট উঠোনটুকুতে এসে দাঁড়াই। খুপ্‌রি খুপ্‌রি খান-কয়েক ঘর ; তারই একটা ঘরের বারান্দায় কম্বল পেতে বসতে দিলেন ব্রজরমণ আমাদের। কেমন যেন অন্ধকার-অন্ধকার চার দিক। শহরতলির বাসাবাড়ির বর্ণনা পড়ি—তেমনি এদিককার এইসব বাড়িগুলি বোধ হয়। আলো ঢোকে না কোনোখানে। শহরেও হয়তো আছে গলি-ঘুপ্‌চিতে এমনিতরো কত বাসা। এর চেয়ে কত ভালো আমাদের গ্রামের দরমার বেড়ার চালা-ঘর। কত আলো-হাওয়া সেখানে। মনে পড়ে ছেলেবেলাকার মামাবাড়ির সেই প্রকাণ্ড উঠোন, উঠোন-জোড়া আলপনা লক্ষ্মীপূর্ণিমা রাতে, সে কী আশ্চর্য শোভা তার! ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় বউঝিদের নিয়ে এ-পাড়ার গিন্নিরা ও-পাড়ায় যেতেন, ও-পাড়ার গিন্নিরা এ-পাড়ায় আসতেন আলপনা দেখতে। তারিফ করতেন একে অন্যকে, কল্‌মিলতা শঙ্খলতা পদ্মলতার বাহাদুরি দেখে। কোথায় গেল আমার সেই সেদিনের আলপনা-ভরা উঠোন!

সামনেই অন্ধকার কুয়োতলায় স্নান করছিলেন লম্বা চওড়া বিশাল গঠনের এক বৈষ্ণব। স্নান সেরে ভিজে লম্বা চুল গামছায় মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন সামনে। ইনিই গৃহস্বামী নিত্যগোপাল দাস, কুঞ্জের গোবর্ধন বিগ্রহের সেবায়েত। পুজো-আর্চা ছাড়া অবসর সময়ে কী স্কুলে যেন শিক্ষকতার কাজ করেন। তিনি জামা গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন ; আমাদের সঙ্গে যাবেন। আমরা উঠে পড়ি ; উঠোন পেরিয়ে দরজার দিকে এগোই।

মোটা ওড়না সামলাতে সামলাতে একটি কালো মেয়ে ছুটে এসে ঢোকে ভিতরে, কণ্ঠে যেন এক ঝাঁক পাখির কাকলি। কী উচ্ছ্বাস! বলে, 'বিহারীজি তো বিহারীজিই আজ। বড়ি বড়িয়া দর্শন ; সব সোনেকে সোনে।' দু হাত তুলে তুলে মূর্তির ঢলঢল সৌন্দর্যের বাখানি দেয় সে।

নিত্যগোপাল দাস শুধোলেন, 'দর্শন খোলা?'

মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ, আমি এই তো দেখে এলাম, দেখেই ছুটে আসছি খবর দিতে। এখনি যাও, জোরে পা চালিয়ে গেলে এখনও খোলা পাবে। শিগ্‌গির করো।' বলে সে যেন ঠেলে ঠেলে দরজা পার করে দিল আমাদের। আনন্দে আর স্থির থাকতে পারছে না কিছুতে।

কী ভিড়! আকুল আগ্রহে ছুটেছে সবাই, যেন এখনি কী জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায় ভয়। ভিড়ের মাঝে চলার একটা নেশা আছে বৈকি। তাদের মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে আমি চলি, আমায় ঠেলে অন্যে চলে। রেষারেষি নেই। এ-ই যেন নিয়ম।

ভিড়ের মধ্যে একই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকা দায় ; তাও ঢুকলাম, যেমন ঢুকছে অন্যেরা। বিহারীজিকে যে দর্শন করতে হবে। মন্দিরের সামনে বেশ বড়ো একটি আঙিনা, ঠেলা খেতে খেতে যতটা পারলাম এগিয়ে গিয়ে জায়গা নিলাম। নিত্যগোপাল বললেন, 'এখানে এবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। দর্শন বন্ধ।'

সামনে বুক অবধি উঁচু বারান্দা, রঙিন দামি ভারি পর্দায় ঢাকা, তার ভিতরে বিহারীজি। হঠাৎ এক সময়ে পর্দা খোলা হবে কয়েক মুহূর্তের জন্য, আবার ঢেকে দেবে, স্টেজের মতো। একে বলে 'ঝাঁকি দর্শন'। পলকের দেখার জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার যে উৎকণ্ঠা— ভক্তিভাব আপনিই আসে বা। দর্শনের এই লুকো-চুরি-খেলার কী তাৎপর্য, ভক্ত ভগবানই বোঝেন। বৃথা ভেবে মরি। নয়তো হাজার হাজার লোক এত কষ্ট করে থাকে কখনো এমনি অপেক্ষায়? আজ দোল-উৎসব, সব ব্রজবাসী আজ বিহারীজিকে দেখবেই, জানা কথা ; তবু কী নিশ্চিন্ত তিনি।

আর পারা যায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুমড়ে আসে। একজন যাত্রী করুণ-ভাবে শুধোয় পাশের চিমটাধারী এক সাধুকে, 'দর্শনের আর বিলম্ব কত?'

সাধু উদাসনয়নে হেসে বলেন, 'আরে, কুছ্ তপস্যা তো করো জি। দর্শন করনেকা উৎকণ্ঠা জিত্‌নী হি বঢ়েগী উত্‌নী হি দর্শনকা আনন্দ লুট সাকোগে।'

বড়দি বললেন, 'ঐ শোনো। সংসারের জীব আমরা, নানা আবর্তে ডুব খাই অবিরত। কিন্তু তিনি ছাড়েন না, সুযোগ বুঝে আমাদের দিয়েও খানিক তপস্যা করিয়ে নেন। আজ যে এইভাবে ভিড়ের চাপে তাঁকে দেখব-দেখব করছি, তাঁর কথাই ভাবছি— এও তো তপস্যা করাই হল বলতে হয়।'

ভিড়ের চাপে আরো খানিক এগিয়ে যাই, পা শক্ত করে দাঁড়াই। কিন্তু মন বাগ মানে না। মনকে ভোলাতে কাঁধের ঝোলা থেকে খাতা পেন্সিল বের করে বুকে ধরি। ভাবি, সময় কেটে যাবে এখন হু হু করে। কিন্তু কী আঁকি? কিছুই দেখি মনে ধরে না। এদিক ওদিক তাকাই; হঠাৎ চোখ দুটো বাঁ দিকের ভিড়ের ঐ পাশে এলো-চুলে-ঘেরা শ্যাম্‌লা একখানি মুখে গিয়ে আটকা পড়ে। ভিজে চুলে চলে এসেছে কালো পাড়ের শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে। করুণ মুখখানি, একমনে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো কিছুতে।

খাতা খুলে আঁচড় কাটতে যাব—ফের মুখ তুলি, দেখি; চোখ বুজি, চোখ খুলি, আবার দেখি। বড়ো চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখেছি কবে! খাতা বন্ধ করি—আবার খুলি। যাক গে যাক; চেনা মুখ খুঁজে কী কাজ। এই শ্যামল স্নিগ্ধ মুখ-খানাই মনে থাক্‌। কালো পেন্সিলে কালো চোখের টান দিতে গিয়ে চকিতে মনে পড়ে যায়—আরে, এ যে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের পাড়ে দেখা সেদিনের সেই মেয়েটি যার কাছে ধরা পড়েছিলাম যে আমরা নব্যসাধিকা।

দৃষ্টির কী আকর্ষণ জানি না। কে যেন তার মুখখানি ঘুরিয়ে দিল আমার দিকে। নজরে নজর পড়তেই একমুখ হেসে ঠাসা লোকের ভিড় ঠেলে চলে এল সে আমার কাছে। বললে, 'থাকতে পারলাম না হরিদ্বারে বেশি দিন, স্বামী এসে নিয়ে গেলেন। আবার চলে এলাম এখানে, এবারেও না ব'লে। বললেই তো বাধা দেন। অথচ মন টানে, কী করি আমি?'

বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে মুখ তুলে; বড়ো আপনার মনে হল তাকে। বললাম, 'আছ কোথায়?'

'আছি একটা ধর্মশালায়। প্রথমে কিন্তু এসে উঠেছিলাম আনন্দময়ী-মার আশ্রমেই। তিনি তো বলেনই, থাকো আমার কাছে; কিন্তু আমি পারলাম না থাকতে। তাঁদের সাধনা—ওরে বাবা! আশ্চর্য কী জানেন, কত জনেই আমাকে দীক্ষা দিতে চান; যিনি দেখেন তিনি বলেন, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। আমি নিজে মন ঠিক করতে পারি না। এই আনন্দময়ী-মা'ই তো আমাকে বলেছিলেন—দিব্যি ছিলাম ঘরের বউ—কী ক্ষণে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, তোমার মধ্যে সাধনা আছে, তুমি এসে থাকো আমার কাছে। সেই অবধি মন আমার কেমন হয়ে আছে—টেঁকাতে পারি না ঘরে। কিন্তু কী জানি, এঁদের সাধনার পদ্ধতি আমার মনের সঙ্গে খাপ খায় না। এই তো গিয়েছিলাম, একদিনের বেশি থাকতে পারলাম?'

কী এমন সাধনার পদ্ধতি? জানতে মনে কৌতূহল জাগে। কিন্তু আমরা 'নব্যসাধিকা'; আমাদের যে কিছু অজানা থাকতে পারে না। নিজের মানে নিজে ঠেকি; মান বজায় রাখতে মনের ঔৎসুক্য চেপে থাকি। তবু বড়দি উস্‌খুস্‌ করতে করতে এক সময়ে স্পষ্ট শুধিয়ে বসেন, 'আচ্ছা, আনন্দময়ী-মাদের সাধনাটা কী রকমের?'

'তাঁদের সাধনা—!' কেউ যেন মেয়েটিকে ধরতে যাচ্ছে—দু হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করে সে বললে, 'সাংঘাতিক। সইতে পারলাম না বলেই তো চলে এলাম।'

বড়দি বললেন, 'ভক্তেরা মা'কে পুজো করে কী ভাবে?'

'না না, সে আমি বলতে পারব না। ভয়ে বুক কাঁপে। এলো চুলে, দু হাত

তুলে, ঘুরে ঘুরে তাণ্ডব নৃত্য—যেন নন্দীভৃঙ্গীর দল। উগ্র সাধনা—যেন বিশ্বগ্রাসী ভাব—। এই, এই, ঠিক এই যে চোখ করলেন আপনি—এইরকম চোখ সব ; বাবা রে বাবা!'

ভড়কে মেয়েটি পিছু হটে দাঁড়াল।

আমার এক মহা দোষ। গল্প শুনতে শুনতে আমি গল্পের মানুষ ব'নে যাই। তাদেরই ভাব ফুটে ওঠে আমার চোখে মুখে। মেয়েটির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাই 'তাণ্ডব নৃত্য' 'উগ্রসাধনা' 'বিশ্বগ্রাসী' কথার ঝোঁকে আমার দু চোখ গোল গোল হয়ে উঠেছিল একটুক্ষণের জন্য।

বিশ্বাসভরে যার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তার চোখেও এই দৃষ্টি! যে দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে সে চলে এসেছে স্থির আস্তানা ছেড়ে অজানা ধর্মশালায় অনাহারে অনিদ্রায়!

মাত্র মুহূর্তের বিহ্বলতা ; পরমুহূর্তেই দৃষ্টিকে কোমলতর করি, মুখে হাসি ফোটাই ; কিন্তু মেয়েটির ভয় কাটে না। শুক্‌নো মুখে দু হাত বুকে মুঠো ক'রে কেবলই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখে। শেষে না পেরে লোকের ঠেলাঠেলির অজুহাত তুলে কুণ্ঠিত আমাকে এড়িয়ে দূরে সরে গিয়ে ভিড়ে মিলিয়ে রইল।

ঠুন্ ঠুন্ ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠতেই লোকের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। 'জয় জয়'-নাদে চার দিক কেঁপে উঠল। সামনের পর্দা খুলে গেল।

'সব সোনেকে সোনে।' মণিমাণিক্যখচিত বস্ত্রাভরণ ধারণ করে রাজোচিত সাজে রত্নসিংহাসনে ফুলের হিন্দোলায় দোল খাচ্ছেন বিহারীজি চোখের সামনে।

চোখ ঝল্‌সে যায় রত্নের ঝলকে। সেবায়েতরাও আজ সেজেছেন বিশেষভাবে—পরিধানে রঙিন পট্টবস্ত্র, গলায় রঙিন উত্তরীয়, গায়ে তসরের মিরজাই, কপালে চন্দন তিলক—গৌরবর্ণ মুখে তা অতি শোভা ধরেছে।

বিহারীজিকে দেখতে না দেখতে পর্দা পড়ে যায়। খানিক পরে আবার ওঠে, আবার পড়ে। মুহুর্মুহু ঢাকা, খোলা চলে এইভাবে। খুলে রাখা হয় না বেশিক্ষণ বিহারীজিকে, যদি পালিয়ে চলে যান মথুরায়, যেমন গিয়েছিলেন একবার। তা ছাড়া ভক্তদের দিক থেকেও সার্থকতা আছে একটা ; দর্শনে এই ব্যাঘাত উপস্থিত হয়ে তাদের মনে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বাড়তেই থাকে। বাধাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তীব্রতা ধারণ করে। আনন্দ তৃপ্তিতে নেই, আছে প্রবল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই। তাই তো বৈষ্ণবগণ আকাঙ্ক্ষা বাড়াবার দিকেই জোর দেন বিশেষ করে।

দু চোখ মেলে সেই শ্যামল মুখখানি খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়ে আসি। বেদনার খোঁচা বুকে টন্ টন্ করে। ভালো লেগেছিল মেয়েটিকে ; পলকে কী ঘটে গেল—অতি কাছের জিনিস দূরে ছিট্‌কে পড়ল। জানাতে পারলাম না—সে আমি যে আমি নই। তার অকারণ ভীতিবিহ্বল মুখখানি জেগে রইল মনে পীড়া দিতে—চিরকালের জন্যে।

বাঁকেবিহারী, রাধারমণ, শ্যামসুন্দর, রাধামাধবশ্যাম, রাধাবল্লভ, সবাই একা ; রাধা

নেই পাশে। বৈষ্ণবরা আগে এক ভগবানের পূজো করতেন। এক ভগবান ছাড়া আর কিছু জানতেন না ; রাধাকে পর্যন্ত তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।

শশী মহারাজ বলেছিলেন, 'সনাতন রান্না করতে করতে সাধনায় মগ্ন হয়ে যেতেন ; আগুন নিভে যেত। বালিকাবেশে রাধা এসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন ধরাতেন ; ধোঁয়ায় চোখ দিয়ে জল পড়ত। সনাতন বিরক্ত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেন। বলতেন, রান্না পুড়ে যায়, অসিদ্ধ থাকে, থাকুক। তাই খাবে ঠাকুর। তুমি যাও। তাই বলি, রাধার চোখের জল ফেলিয়েছেন এমন সব ভক্ত তাঁরা।'

নিত্যানন্দ-ঘরণী মাতা জাহ্নবা-ই প্রথম রাধাকে স্থান দেন শ্রীকৃষ্ণের পাশে। প্রথমে তুমুল আপত্তি ওঠে ; কিন্তু জাহ্নবার কাছে শাস্ত্র ও যুক্তিতে পরাজিত হয়ে আপত্তির কারণ তুলে নেন সবাই। তিনি যেমন ছিলেন পণ্ডিত তেমনি ছিলেন শক্তিশালিনী। সে সময়কার বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান পণ্ডিত জীব গোস্বামী সমগ্র বৈষ্ণবদের নিয়ে জাহ্নবার কাছে ভাগবত শুনেছিলেন।

পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু— 'চৈতন্য-ভক্তি-মণ্ডলে যিঁহো মূল স্তম্ভ'— তিনি যখন দীক্ষা নিতে অদ্বৈত প্রভুর কাছে যাচ্ছিলেন, মা খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'বাবা, তুমি দীক্ষাগ্রহণের জন্য আচার্য প্রভুর কাছে যাচ্ছ কেন? আমিই তোমাকে দীক্ষা দেব, প্রস্তুত হয়ে এসো।'

গল্প আছে বা গাথা আছে যে, জাহ্নবার ডাকে পুত্র যখন মায়ের কাছে এলেন মা তখন জপ করছিলেন ; যুবক পুত্রকে সামনে দেখে মাথায় কাপড় তুলে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে বীরচন্দ্র দেখেন, দুই হাতে মা জপমালা ধরে যেমন ছিলেন তেমনি আছেন। তখন যোগৈশ্বর্যসম্পন্না মায়ের পায়ে বীরচন্দ্র লুটিয়ে পড়লেন।

সেই মা-জাহ্নবার দয়ায় কৃষ্ণ আজ রাধাকে পাশে নিয়ে সিংহাসনে ব'সে—

শ্যাম নবজলধর, রাই ইন্দুবর,
বিনোদিনী বিজুরী, বিনোদ জলধর॥

বৃন্দাবনে আজ যেখানে তিনি যে নামে, যে রূপে আছেন, রাজ-ঐশ্বর্য ছড়িয়েছেন। কোথাও হীরের চোখ, কোথাও হীরের মুকুট, কোথাও হীরের বালা কণ্ঠী কুণ্ডল বাঁশি কত কী। মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি।

দেখতে দেখতে চলেছি।

ছাদের উপর গামলাভরা গোলা রঙ পিচকারি ভরে বসে আছে ছেলে বুড়ো যুবক প্রৌঢ়। চেনা-অচেনা নেই— পথ দিয়ে যে চলেছে, আচমকা অদৃশ্য হতে রঙিন ঝরনা ঝরে পড়ছে গায়ে।

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুঠোভরা আবির কায়দা করে ছুঁড়ে মারছে ঘোমটায় ঢাকা বউয়ের মুখে বুকে ব্রজবাসীরা মহাকৌতুকে।

পথে দেখি, ভগবান দাস আপন মনে খুশির হাসি হাসতে হাসতে হন্ হন্ করে আসছেন। বললেন, 'যাও এগিয়ে, ব্রজমায়ীদের খেলা শুরু হয়েছে : দেখে এসো।'

আজ দুপুরে 'ভাণ্ডারা' ছিল গোবিন্দজির মন্দিরে। এত লোকের খাওয়া-দাওয়ার বিরাট ব্যাপারের ভার ভগবান দাসের উপর। দেখেছিলাম দুপুর বেলা ওপথ দিয়ে আসবার সময়ে ছুটোছুটি তদারকের বিরাম নেই তাঁর। এরই মধ্যে এক

ফাঁকে বেরিয়ে ব্রজমায়ীদের খেলা দেখে গেলেন।

এই খেলার কথা শুনেছিলাম আগে মণিবাহাদুরের কাছে। বলেছিলেন, 'অমন জিনিসই যদি না দেখলেন তো দেখলেন কী? হোলির দিনে বর্ষান থেকে মেয়েরা আসে লাঠি হাতে নন্দগ্রামে, ছেলেদের পিটতে। ছেলেরা কিন্তু উলটে মারে না, মার খায়। কেবল তাই নয় ; মার খেয়ে আবার যে মারে তাকে মিষ্টি খাওয়ায়।'

বড়দিকে ইশারা করি, 'এত বছরের ঘরকন্না তোমাদের, যদি কোনো দিনের কোনো কিছু কাঁটা বিঁধে থেকে থাকে মনে তো শোধ তুলবার এই সুবর্ণ সুযোগ। আজকের এই খেলার রীতিতে দু কাজই হবে একসঙ্গে।'

'ওঠো ওঠো, শিগগির এই বারান্দায় উঠে পড়ো,' বলে দাদা হাতের ধাক্কায় আমাদের মাঝপথ থেকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিলেন। সাঁই সাঁই করে একটা দু হাত লম্বা লাঠি এসে পড়ল সেখানে— ব্রজমায়ীদের হাতের লাঠি।

দাদা বললেন, 'মাঝপথে দাঁড়িয়ে সলা-পরামর্শ হয়— বীরাঙ্গনা সব! এই লাঠি আজ তোমাদেরই পিঠে পড়ত আর-একটু হলে।'

রাস্তায় দু কাতারে লোক— বউ ঝি ছেলেপিলে মিলে। যেন ঢাকার মিছিল দেখতে জমা হয়েছে সব। এই ভিড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গাটুকুতে রাস্তার এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্ত অবধি ব্রজমায়ীরা ছুটোছুটি করছে লাঠি হাতে নিয়ে। ঝলমলে ভারী ঘাগরা ভারী তালে ঢেউ তোলে বোঝা মল খাড়ুর উপর ; ছোটার তালে ওঠে পড়ে মোটা চন্দ্রহার কোমর ঘিরে, রুনুঝুনু বাজু বাজে চুড় বালার সঙ্গে সুর মিলিয়ে। আংটি হাতপদ্মে ঢাকা হাতে লাঠি নিয়ে তেড়ে চলেছে মায়ীরা রঙিন ওড়নার লম্বা ঘোমটা বাঁ হাতে ঈষৎ ফাঁক করে। জরি কাঁচের ঝলকানিতে তড়িৎ খেলছে পথ জুড়ে। যেন হালকা ওড়নায় ঢাকা চাপা আনন্দের তুফান সব মিলিয়ে।

ছেলেরাও সেজেছে আজ যে-যার মন-ভোলানো সাজে— মিরজাই প'রে, পাগড়ি বেঁধে। তারা নিয়েছে হাতে ছ হাত লম্বা লাঠি এক-একটা, মার ঠেকাতে। মনে মনে কিন্তু দু হাতের কাছে হার মানবে আজ, এই আনন্দেই বিভোর। হাসিমুখে লাঠি বাগিয়ে মার ঠেকাতে ঠেকাতে পিছু হটে তারা— কেউ-বা বেগে, কেউ ধীরে। তাতেও খুশি হয় না ব্রজমায়ীরা ; হাতের লাঠি ছুঁড়ে মারে নাগালের বাইরে যে আছে তার গায়ে। দিগ্‌বিদিক মানে না মনে। দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে দর্শকরা ; হাসে নন্দগ্রামের ছেলেরা।

বর্ষানের রাজকুমারী রাধাকে কাঁদায় নন্দগ্রামের রাখাল কৃষ্ণ ; সইতে পারে না গোপিনীরা। রাগে ছুটে আসে নন্দগ্রামে ছেলেদের মারতে। সেই রেওয়াজই চলে আসছে এতকাল ধরে এইভাবে। আনন্দের ফোয়ারা ছোটে সকলের উল্লাসে ; সেই লীলা তারা দেখে চোখে।

•

যমুনার তীর কাছেই। খেলা দেখে খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়াই খানিক। সাধুদের ভস্মমাখা কপাল আজ আবিরে রাঙা। শত শত উষার অরুণ যেন ছুটোছুটি খেলছে সাদা বালিশ বুকে।

চার বট এখানে। পঞ্চকোশী পরিক্রমায় পথে পড়ে।

বংশী-বট। যার নীচে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে ডাকতেন রাধাকে। পরে

রাসলীলা হয়েছিল এখানে গোপীদের নিয়ে। অন্য কারো আসবার হুকুম ছিল না। রাস দেখতে। শিব থাকতে পারেন নি, গোপীবেশে এসেছিলেন লুকিয়ে। সেই অবধি তিনি গোপীশ্বর শিব নামে রয়ে গেলেন পাশে।

বিশ্রাম-বট। এখানে কৃষ্ণ মাঠে ধেনু ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতেন রাধাকে নিয়ে।

শিঙ্গার-বট। এর তলায় কৃষ্ণ রাধাকে সাজিয়ে দিতেন নিজের হাতে চন্দন-কুম্‌কুমে। শিঙ্গার-বটের আঙিনায় দুটি বকুল গাছ ; একটি সোজা, আর-একটি তার গায়ে হেলে-পড়া। ফুল হয় দুটিতেই ; কিন্তু ফল হয় একটিতে। গাছের ডালে বিগ্রহের মন্দির ঢাকা পড়ে দেখে গাছ দুটি কেটে ফেলার সংকল্প করেন সেবায়েতরা। সেই রাত্রে তাদের উপর স্বপ্নাদেশ হয় 'আমাদের কেটো না, আমরা দুই স্বামী-স্ত্রী, বৃক্ষরূপে এখানে তপস্যা করছি।'

আর হল অদ্বৈত-বট। অদ্বৈত মহাপ্রভুর ভজনস্থলী। পূজারী বললেন—

'হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা,
ভালো মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, নীরবে আঁকিয়া
বিশাখা দেখালো আনি।'

ঐ-যে বিশাখা দিলেন চিত্রপট—প্রথম মিলন, তা এইখানেই।

এখনো জায়গাটি বড়ো নির্জন, মনোরম। মাটির দাওয়া, সাদা মাটির আঙিনা, জীর্ণ নিমের হাল্‌কা ছায়া—সব মিলিয়ে একটা শান্ত শীতল আবহাওয়া।

মাটির ছোট্ট দাওয়াটুকুতে বসে পড়লাম। বললাম, 'জল খাব।' জল যে খাব একটু আগেও মনে জাগে নি এ কথা। হঠাৎই মনে হল, পিপাসা পেয়েছে, জল খাব, ঠাণ্ডা হব। এমন জায়গাতেই তো পিপাসার জল খেতে হয়।

পিতলের ঘটি ভরা ঠাণ্ডা জল দিলেন পূজারী। ঢক্ ঢক্ করে সবটা খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

অতিবৃদ্ধ গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণ এক, ভাঙা দু হাত সামনে বাড়িয়ে ফোক্‌লা মুখে হাসতে হাসতে পথ দিয়ে গেয়ে গেল—

'ব্রজের ধূলায় না হল রতি হায় রে হায়।'

রাধাদাসী, মনোমোহন দাসের কুঞ্জে দেখা কালো মেয়েটি, সে এসে সঙ্গ নিল আমাদের। বললে, 'নিধুবন, নিকুঞ্জবন, রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থল। সেই নিকুঞ্জ-বনে যাচ্ছি। যাবে? এই এইখানে, কাছে।'

বেলা পড়ো-পড়ো। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। ঢুকলাম নিকুঞ্জবনে। বন তো বনই। কেবল ঝোপ আর ঝোপ ; তারই পাশ দিয়ে নীচ দিয়ে পায়ে-চলার সাদা মাটির সরু পথ চিক্ চিক্ করতে করতে এঁকেবেঁকে গেছে—কোথাও গা বাঁচিয়ে কোথাও ঘাড় নিচু করে ঝোপে-ঢাকা ছোট্ট একটা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই। সামনে একটুখানি ঢাকা বারান্দা। ঐটুকু জায়গায় যে কত লোক ঠাসাঠাসি বসেছে—বেশির ভাগই নানা দেশের মেয়ে। তাদেরই যেন আধিপত্য এখানে, ছেলেরা আছে পিছনে দাঁড়িয়ে। এখানেও 'ঝাঁকি দর্শন'। পূজারী সবাইকে উৎকণ্ঠায় রেখে বেশ ধীরে সুস্থে কাঠিতে ঘিয়ে-ভেজানো তুলো জড়িয়ে ছোট ছোট মশাল বানাচ্ছে পর্দার

সামনে বসে। মুখ বুজে মেয়েরা কত আর বসে থাকতে পারে? হাতে তালি বাজিয়ে গান ধরল বিচিত্র সুরে,

'জয় জয় রাধেজিকো শরণ তোহারী
ঐ ছন আরতি যাও বলিহারী—'

সামনের মারোয়াড়ি বউটির হাতের আঙুলে কী বাহারের মেহেদি রঙের নকশা। এরা কি বাটা মেহেদি দিয়ে অমন নকশা কাটে, না রঙ লাগায় কোনো রকমের। মনে পড়ল, হানিফের মা এসেছিল একদিন ইদের আগে মেহেদি পাতা নিতে। বলে, 'এই সময়ে ছেলে বুড়ো আমাদের সবাইকে পরতে হবে মেহেদি, আমাদের ধর্মের নিয়ম।'

বললাম, 'কী করে লাগাও তোমরা?'

কী জানি, ছেলেবেলায় একবার শখ গিয়েছিল মেহেদি পরতে। দু বোনে মেহেদি পাতা তুলে পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে বারান্দায় মাখামাখি করে হাতে পায়ে ডললাম, কিছুতেই রঙ ধরল না। লাভের মধ্যে মার হাতে চড়চাপড় খেয়ে মরি; কাঁদতে কাঁদতে জল ঢেলে ঢেলে বারান্দা ধুয়ে পরিষ্কার করি। তাই বললাম হানিফের মাকে, 'আমায় শিখিয়ে দিয়ো তো, আমিও লাগাব হাতে পায়ে।'

সে বলল, 'তুমি পারবে না, ও তোমাদের দিয়ে হবে না। আমি নিজে এসে একদিন বেটে লাগিয়ে দিয়ে যাব তোমার হাতে। আমাদের উপর বর আছে কিনা বিবি ফতেমার। তোমরা করলে রঙই খুলবে না। তা এই এখনই তো মেহেদি লাগাবার সময়। পরে বিবি ফতেমা বাপের বাড়ি চলে যাবেন, তখন আর মেহেদিতে রঙ ধরবে না। সেই তিনি শ্বশুরঘরে ফিরে এলে তবে আবার রঙও ফিরে আসবে। আমাদের ধর্ম কি সোজা? বড়ো কড়া নিয়মকানুন তার।'

নিকুঞ্জবনে গান চলছে এখনো—

'রতনে জড়িত মণিমাণিকমোতি
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি।
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে
প্রিয় নর্ম সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে।'

গানের চীৎকারে কুঞ্জের নীরবতা কোথায় উবে গেল। দারুণ কোলাহলের মধ্যে ঝাঁকি দর্শন শেষ হল।

কুঞ্জ-ঘেরা পথ ঘুরে ঘুরে বেরিয়ে আসছি—রাধাদাসী বলতে বলতে চলেছে, 'এই হল ললিতাকুণ্ড; নাচতে নাচতে ললিতার পিয়াস লেগেছে তো কৃষ্ণকে বললে, জল এনে দাও শিগ্‌গির। কৃষ্ণ জল তখন কোথায় পাবেন? তাড়াতাড়ি হাতের বাঁশি দিয়ে খুঁড়ে কুণ্ড করে দেন, ললিতা জল খেয়ে পিয়াস মিটায়।

'এই হল মুক্তালতা। কৃষ্ণ পুঁতে দিয়েছিলেন মাটিতে মা-যশোদার কানের মুক্তা। তাই হতে এই লতা হল। ব্রজে কেবল লতা দেখবে; গাছ দেখবে না বেশি। সবই সখী-ভাব। বৃন্দাবনের লতাপাতা বড়ি আচ্ছা লাগে দেখতে।

'আর এই হল তমালবৃক্ষ। কৃষ্ণ ননী খেয়ে এই গাছে হাত মুছেছিলেন। এই দেখো কেমন গর্ত হয়ে আছে গাছের গায়ে। আর এই-যে ডিমা ডিমা গাছের গায়ে

গায়ে বেরিয়ে আছে দেখছ, এগুলি শালগ্রাম-শিলা।

'জান, সন্ধ্যার পর কেউ থাকতে পারে না এখানে। সেবাকুঞ্জ তো। রোজ রাত্রে কৃষ্ণ আসেন লীলা করতে। রাধা তখন কাউকে থাকতে দেন না ; নিজের হাতে ভিতর হতে কুঞ্জের দরজা বন্ধ করে দেন। এই-যে কত বানর দেখলে আসবার সময়ে, ওরা কেউ থাকবে না ; একটা টিয়া পর্যন্ত না। যদি কেউ লুকিয়ে থাকে তবে প্রাণে বাঁচে না। একবার এক সাধুর শখ হল লীলা দেখতে। লুকিয়ে থেকে গেল এখানে। তার পর যেই একটু রাত হয়েছে—কে যে ঠেলে ওকে দেয়ালের উপরে তুলে বাইরে ফেলে দিল বলতে পারে না। কেবলই বলে, আমার গায়ে কিসের আঁচ লাগল, সব জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। ব'লে পাগলের মতো ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মরে গেল।

'আর-একবার এক ভক্ত এমনি করে লুকিয়ে থেকে গেল—লীলা দেখতে। রাধা বললেন, বেশ, তুমি ভক্ত মানুষ, দেখতে চাও দেখো ; কিন্তু বোলো না কাউকে কিছু। পরদিন ভোরে সবাই এসে তাকে ধরল, হ্যাঁ রে, কী দেখলি বল্‌ না? ভক্ত বলতে যায়, দেখে তার মুখ বোবা হয়ে গেছে ; লিখে জানাতে যায়, হাত নুলো হয়ে গেল ; চোখ দিয়ে বোঝাতে যায়, চোখ অন্ধ হয়ে গেল। এক এক করে সব যেতে যেতে শেষে লোকটা মরেই গেল।'

লীলাগোবিন্দ, রাধাদামোদর, নীলমাধব, বংশীবদন দেখে এলাম শ্যামসুন্দরের কাছে। প্রত্যেক মন্দিরেই সচল ও অচল বিগ্রহ। অচল থাকেন মন্দিরের ভিতরে অটল হয়ে। প্রতিনিধি সচল দেখা দেন সবাইকে বাইরে এসে এইসব উৎসবাদি উপলক্ষে। খোলা বারান্দায় সচল বিগ্রহকে প্রাণ ভরে দর্শন করে আশ মেটায় যাত্রীরা যে যতক্ষণ পারে। এখানেও তাই, মন্দিরের সামনের রেলিঙঘেরা বারান্দায় সচল শ্যামসুন্দর। ছুঁড়ে ছুঁড়ে আবির দিয়েছে তাঁকে আজ সবাই। আবিরের লালে ছেয়ে গেছে বারান্দা। প্রণাম করে ফিরে আসছি, রেলিঙের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়া বিধবা। বাঁ হাতের তেলোতে রাখা এক টুকরো কাগজের মোড়ক হতে এক টিপ আবির নিয়ে সে শ্যামসুন্দরকে বললে, 'তোমার দুটি পায়ে একটু আবির দিই?'

গোবিন্দজির পাশেই রাধাগোবিন্দের মন্দির। সদর ছেড়ে গলি-পথে ঢুকছি—তাড়াতাড়ি পেঁছনো যাবে। দৌড়ে দৌড়ে ছুটছে মেয়েরা, ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল লাল-পাড়ের শাড়িপরা বউ সঙ্গিনীকে বলতে বলতে, 'আর ভাই, শ্রীরাধার যেমন জটিলা-কুটিলা, আমারও তাই। পারি কি সহজে বের হতে?'

মন্দিরের দু দিকে সিঁড়ি, এক দিক ঢোকবার, এক দিক বের হবার। তা ছাড়া ভিড় সামলাবার উপায় নেই। পথে আসতে শুনেছিলাম, এক বৈষ্ণবী যেতে যেতে বলছে আর-একজনকে, 'শ্রীরাধার কী লীলা! আজ তিনি সুবল-বেশে সেজেছেন ; আজ চরণদর্শন, দেখে বুক ঠান্ডা হয়।'

কিন্তু সুবল-বেশ কই? এ তো দিব্যি শাড়িপরা রাধা। অন্যদিন বোধ হয় ঘাগরা থাকে পা অবধি লুটিয়ে। এক পা এগিয়ে আর-একটু সামনে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। পিঠখোলা কালো মেয়েটি মুখঝামটা দিতে দিতে পিছু হটে আসে—'আট-

কপালি, আমারে কয় রাঢ়ি ; জিগাই, তর সোয়ামি কয়টা লো?'

কী জানি কী ব্যাপার এদের। যে বিধবার উদ্দেশে এই বিধবার খোঁটা, সে তখন হাতজোড় করে রাধাগোবিন্দের সামনে দাঁড়িয়ে। শুনে, হেসে ডাকল তাকে, 'আয় এদিকে, দেখে যা কয়টা।'

মানসিংহের মন্দির ঘুরে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নীচে বড়ো রাস্তায় নামছি ; স্বচ্ছ আকাশে পূর্ণিমার গোল চাঁদ একেবারে ঠিক মুখোমুখি। যেন নীল শাড়ির আঁচলে ঢাকা শ্রীরাধার মুখখানি।

চাঁদের-আলো-ঢালা এ-পথ সে-পথ মাড়িয়ে ফিরছি বাড়িতে। পরনের খদ্দরের শাড়ি ধব্‌ ধব্‌ করছে সে আলোয়। উল্টেপাল্টে হাত দেখি, পা দেখি, মুখে আঁচল ঘষে দেখি, রঙ লাগে নি কোথাও একটু। পরিষ্কার বাইরেটা।

বাড়ি ফিরে লালরঙের ছোপ-ধরা তসরের জহর-কোটটা গা থেকে খুলতে খুলতে দাদা বললেন, 'যা ভ্রূকুটি করে পথ চলেছ, সবাই ভেবেছে, তুমি ব্রাহ্ম বুঝি-বা।'

স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে গুঁড়ো আবির ঝরে পড়ল বুক থেকে। কে কখন ছুঁড়ে দিয়েছে কিছু জানি নে।

কুম্ভ জানি চার জায়গায় হয় ; কিন্তু বৃন্দাবনেও যে কুম্ভ হয় এ তো জানতাম না। এবারেই শুনলাম।

রূপ গোস্বামীই নাকি এর প্রবর্তন করেন। তিনি কুম্ভমেলার প্রধানগণের কাছে প্রার্থনা জানান : শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যবিহারস্থলী ; পদ্মপুরাণ ভাগবতাদিতে এর মহিমা বর্ণিত আছে। বিশেষ করে মহাপ্রভুর এ পরম আদরের স্থান। অতএব বৃন্দাবনেও কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হোক।

প্রথমে তাঁরা আপত্তি তোলেন। বলেন, স্মরণাতীত কাল হতে যা হয়ে আসছে তার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অসম্ভব।

রূপ তখন শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেন। আচার্যগণ আর অস্বীকার করতে পারলেন না। ঠিক হল, কুম্ভ যেমন প্রতি তিন বছর অন্তর চার জায়গায় হচ্ছে, হোক। এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। তবে যে বছর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হবে সে বছর বৃন্দাবনেও কুম্ভস্নান যোগ হবে। এক মাস আগে বৃন্দাবনে সাধু-সম্মেলন হবে এবং তাঁরা সম্মিলিতভাবে ব্রজপঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করবে ; আর শ্রীপঞ্চমী, একাদশী ও দোলপূর্ণিমার বিশেষ যোগে যমুনায় স্নান করবে। সেই ব্যবস্থাই চলে আসছে আজ পর্যন্ত। সব সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাগণ প্রতি দ্বাদশ বছর পর এখানে একত্র মিলিত হন এবং দোলপূর্ণিমার দিনে শেষ স্নান করে হরিদ্বারে চলে যান।

কেবল রূপের জন্য এই অসম্ভব সম্ভব হল। অথচ বিনয়ের অবতার ছিলেন তিনি। মহাপণ্ডিত রূপ নিজের নামের পরে 'গোঁসাই' কথাটুকুও ব্যবহার করতেন না কখনও। শুনি, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-নামক গ্রন্থে তিনি নিজ নাম লিখেছেন 'বরাক রূপ'—মানে 'ক্ষুদ্র রূপ'।

এই তো বন-মহারাজের কুটির না?

বড়দি বললেন, 'চলো, ভিতরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে আসি। জানো, এখানকার মধ্যে ইনি একজন বড়ো ভজননিষ্ঠ মহাত্মা। এবার এঁরই উদ্‌যোগে এত সাধুর সমাগম হল এখানে। ইনি না চাইলে হত না। স্বাধীন দেশের সরকার জানালেন, মেলায় হাতি আনতে পারবে না, গাঁজা খেতে পারবে না, কলেরা-বসন্তর টিকা না নিয়ে আসতে পারবে না। শুনে তো খেপেই গেল সাধুরা। হাতি টিকা ইন্‌জেক্‌শন, এসব বুঝি ; কিন্তু গাঁজা না হলে কী করে থাকবে এরা? এই-যে এমন শীত, প্রকৃতির এত দুর্যোগ, এর সঙ্গে লড়াই করতে নিরাশ্রয় সাধুদের এই গাঁজাই তো একমাত্র সম্বল। বন-মহারাজই শেষে সাধু ও শাসনকর্তার মাঝে পড়ে আপস-মীমাংসা করেন। হাতিও আনতে পারল তারা, গাঁজাও চলল ; আর ইন্‌জেক্‌শন, টিকা তো দেখছ পথের মোড়ে মোড়ে। সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলেই ফুঁড়ে দিচ্ছে একজনকেই কতবার!'

বন-মহারাজ কুটিরে নেই, গেছেন যমুনার তীরে সাধুমণ্ডলীর মাঝে। এইমাত্র তো যমুনার তীর ঘুরে এলাম ; আবার যাব অতদূরে?

বড়দি বললেন, 'থাক্ তবে। দর্শনসৌভাগ্য লেখা নেই আমাদের। কপাল মেনে নেওয়াই ভালো।'

বিরাট ফটক। পাথরের কারুকাজ-করা লালাবাবুর মন্দিরের চূড়া দেখা যায় কত দূর হতে। গল্প আছে, লালাবাবু একদিন সন্ধেবেলা বেড়াতে বের হয়েছেন তাঁর জমিদারিতে ; শুনতে পেলেন মাটির ঘরে ধোপার মেয়ে বলছে বাপকে, 'বাবা, বাস্‌নায় আগুন দাও-না, বেলা যে যায়।' সে দেশে 'ভাটি'কে বলে 'বাস্‌না'। কথাটা কানে আসতে চম্‌কে উঠলেন লালাবাবু, 'তাই তো! ধোপার মেয়ে তো ঠিক কথাই বলেছে। আমার জীবন-রবিও তো অস্ত যায়-যায় ; কই, আজ পর্যন্ত তো বাসনায় আগুন দেওয়া হয় নি! কী করি?' ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে ছুটে এলেন বৃন্দাবনে। সদ্‌গুরু চাই।

অনেক পরীক্ষার পর সমস্ত গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে তবে গুরু কৃপা করেন লালাবাবুকে। সে আর-এক অদ্ভুত গল্প।

উৎকৃষ্ট ভোগ হয় এই মন্দিরে রোজ। পঁচিশ জন কাঙালি খায় প্রতি সন্ধ্যায়। চিরকালের ব্যবস্থা।

পথেই পড়ল লালাবাবুর কুঞ্জ। শ্রীমা এসে থেকেছিলেন এখানে, যে ক'দিন তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন।

জগদানন্দ স্বামী বলে দিয়েছিলেন, 'ঘরখানা বন্ধই থাকে, লোক ঢোকে না বড়ো ; জানেও না বিশেষ কেউ। পূজারীকে বলে তালা খুলিয়ে দেখে এসো ঘরখানি।'

লতায় লতায় ছাওয়া আঙিনার আকাশটুকু। দোতলা বাড়ি। খুঁজে খুঁজে সেই ঘর বের করে ভিতরে ঢুকি। দোতলার উপরে এক পাশে লম্বা ধরনের ঘর, এক দেয়ালে একটিমাত্র দরজা ; রাস্তার দিকের দেয়ালটায় কাঠের শিক লাগানো জানলা দু-তিনটে ; অন্য দেয়াল দুটো আগাগোড়া গাঁথনি-করা। বিশেষ কোনো ঘর আছে বোধ হয় তার ওদিকে, তাই জানলা দরজা ফোটায় নি কোনো। দেয়ালে পেরেকে ঝোলানো ফ্রেমে আঁটা মার ছোট্ট ফটো একখানা। দোলপূর্ণিমার দিনে কেউ একজন ঘরে ঢুকে একটু আবির ছুঁইয়ে গেছে কাঁচের উপর দিয়ে মার সিঁথিতে, পায়ে।

বড়ো ভালো লাগল ঐটুকু মনে করা মনের স্পর্শ। ঝুল-মলিন বন্ধ ঘরের ভাপ্‌সা গন্ধের মাঝে তা যেন মৃদু সৌরভ ছড়াল। ধুলোয়-ঢাকা শানের মেঝেতে পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে আসি। আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিই। একটি লিক্‌লিকে লতার ডগা নীচে হতে বেয়ে বেয়ে ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকেছে ঘরে ; দেখি, ছোট্ট দুটি মাধবী ফুল ফুটে আছে আগায়।

এক-একটা জায়গায় এসে মন থম্‌কে দাঁড়ায়, এগোতে চায় না, পাছে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে ফেলে ক্ষণিকের সঞ্চয়টুকু। কিন্তু এগোতেই হয়। সঞ্চয়ের লোভই ঠেলা দিতে থাকে ভিতর হতে।

এই ব্রজের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে ভক্তপ্রাণের মহিমা। শেষ পাই না। মহাপ্রভু সর্বাঙ্গে মেখেছিলেন এই ধূলি ; আর আমরা দু হাতে কাপড় সামলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলি এই ধুলোর হাত হতেই নিজেকে বাঁচাতে। খোঁচা খাই মনে, তবু উপায় পাই নে কিছু।

নানা তোলপাড় চলে মনে। এসে পড়ি শ্রীনিবাসাচার্যের কুঞ্জে। মাটির টিলার উপর বহুপুরাতন নিম তেঁতুল পাশাপাশি ; শিকড়ে শিকড়ে টিলার মাটিতে শক্ত গাঁথুনি ; তার তলায় শ্রীনিবাসের বিগ্রহমন্দির। একবার এই গাছ কাটতে গিয়ে দেখে, গাছের গায়ে যেই কুড়ুলের কোপ পড়েছে অমনি দর্‌ দর্‌ রক্ত পড়তে লাগল। গাছ আর কাটা হল না।

পূজারী বললেন, 'ঐ-যে বনবিষ্ণুপুরের রাজা মাঝপথে ডাকাতি করে বহুমূল্যবান সমগ্র গোস্বামীগ্রন্থ লুঠ করে নিল, ঠাকুর তিন দিন বালির পিন্ড খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। জানেন তো সে-সব কথা। ইনিই সেই শ্রীনিবাস প্রভু। জীব গোস্বামী এঁকে গৌড়ে পাঠান ধর্মপ্রচারের জন্য, দুই সিন্দুক বোঝাই ধর্মগ্রন্থ দিয়ে। পরে কিন্তু সেই রাজাই শ্রীনিবাস প্রভুর ভক্ত হয়ে পড়েন ; বলেন, প্রভু, কী করতে পারি আপনার জন্য? প্রভু বললেন, এই রাজ্যে আসবার পথে গ্রন্থপূর্ণ দুটি সিন্দুক ডাকাতি হয়ে যায়। রাজন্‌, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার লোক দ্বারা তা উদ্ধার করে দিতে পারেন। সেই আশাই আমি করি আপনার কাছে। রাজা বললেন, প্রভু, দুটি সিন্দুক? একদিন রাজজ্যোতিষী গণনা করে আমায় বললে, মহামূল্যবান রত্নাদি-পূর্ণ দুটি সিন্দুক শকটে করে এই রাজ্যের ভিতর দিয়ে আসছে। শুনে আমি আমার লোক দ্বারা তা লুঠ করিয়ে এনে কোষাগারে ফেলে রাখি। খুলে দেখবার সময় পাইনি আজও। দেখুন তো এসে এই সেই সিন্দুক কি না।

'প্রভু তো দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। বললেন, মহারাজ, জ্যোতিষী মিথ্যা বলেন নি। অমূল্য রত্ন এর ভিতরে। মানবজীবনের পরম সার্থকতা লাভ করা যায় যার দ্বারা, সমস্ত অভাব পূর্তি হয় যার দ্বারা, তাই তো রত্ন। অর্থের অর্থ—অভাবপূরণ ; কিন্তু রাজন্‌, অর্থ কি সত্যই অভাব পূর্ণ করতে পারে? উহা অভাব বাড়ায়। যে পরিমাণে অর্থ লাভ হয় ঠিক তার অনেকগুণ অভাব এসে মানুষকে আক্রমণ করে। রাজন্‌, এই গ্রন্থ আপনার ঘরে বিরাজ করেছে ; আপনি ধন্য।

'রাজা বিচলিত হয়ে ছিন্নতরুর ন্যায় তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। বলেন, আমি রাজা, কিন্তু কাজে দস্যু। আমাকে এই চরণের আশ্রয় হতে বঞ্চিত করবেন না।'

পূজারী থামলেন। অনেকক্ষণ নীরবে কাটল।

দাদা বললেন, 'আসি তবে আজ। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে কথা বলিয়ে।'

পূজারী বললেন, 'কষ্ট কী বলছেন! আপনাদের শোনাতে গিয়ে আমারও আর-একবার ঠাকুরের কথা শোনা হয়ে গেল। আপনাদের কৃপাতেই তা সম্ভব হল। এই তো বন্ধুর কাজ করলেন। তাই আমার প্রণতি জানাই, গ্রহণ করুন।' বলে পূজারী জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে যত মাথা নোয়ান, দাদা 'আরে আরে করেন কী' বলে আরো বেশি মাথা নোয়ালেন।

মানসিংহের তিন মন্দিরের এক মন্দির দেখা এখনো বাকি— গোপীনাথের। মানসিংহের আগে যে মন্দিরে ছিলেন গোপীনাথ তা পুরাতন জীর্ণ। তাতে এখন আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। বৃদ্ধ কালো পূজারী দাঁত-হীন মুখে 'ফ-ফ' করে কথা বলে। বললে, 'আগে দেখে যাও এঁকে। রাই-রূপ ভেবে ভেবে গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হল।'

গোপীনাথ পাশের মন্দিরে। গোপীনাথ, যাঁর বক্ষঃস্থলই প্রধান—গোপীদের আশ্রয়স্থান ; কিন্তু সে বক্ষ জামা-কাপড়ে এমন ঢাকা!

বড়দি বললেন, 'এ তো আসল মূর্তি নয়, তিনি তো জয়পুরে। সেখানে গিয়ে সেই ব্রজনাভর গোপীনাথকে দেখো ভালো করে। গোপীনাথকে পেয়েছিলেন মধু-পণ্ডিত স্বপ্নাদেশে, বংশীবটের তলে।'

রাধারমণের মন্দির বন্ধ। ভোগারতি হচ্ছে ভিতরে, অপেক্ষা করতে হবে মিনিট পনেরো। বাঁধানো প্রাঙ্গণের পাশে ঠাণ্ডা বারান্দায় বসলাম পা ঝুলিয়ে। একটি পরম সুন্দর বৈষ্ণব স্নানান্তে চন্দনতিলক কেটে সাষ্টাঙ্গে মন্দিরের সামনে লুটিয়ে পড়ল জোড় হাত মাথার সামনে সটান মেলে দিয়ে। এত প্রণাম দেখেছি, এত প্রণাম করেছি, কিন্তু প্রণামের সৌন্দর্য ফুটে উঠতে এমনতরো দেখি নি আর। চকিতে ভেসে উঠল গৌরাঙ্গের রূপ চোখের সামনে। এই বয়সে রূপের ভাণ্ডার নিয়ে তিনিও তো এসে পড়েছিলেন এইভাবে ব্রজের প্রাঙ্গণে।

মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ—

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥

এই ছয় গোস্বামীরই একজন গোপাল ভট্ট—দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ; তাঁরই ঠাকুর এই শ্রীরাধারমণ।

শুনতে পাই, এই রাধারমণ আগে একটি শালগ্রাম-শিলা ছিলেন। একবার বৃন্দাবনে এক ধনী এসে সমস্ত মন্দিরের বিগ্রহদের বস্ত্রালংকারে ভূষিত করেন। গোপাল ভট্টের কাছেও এসে তাঁর ঠাকুরের বস্ত্রালংকার করে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমার ঠাকুর তো শালগ্রাম, তাঁর শরীরে অলংকার ধারণের স্থান কোথায়?'

রাত্রে গোপাল ভট্ট পূজা-শেষে শালগ্রাম-শিলাকে একটা কৌটোর মধ্যে রেখে দিতেন। সেদিন রাখতে রাখতে ভাবলেন, 'আহা, আমার ঠাকুরের যদি নাক মুখ হাত পা কান চোখ থাকত তবে অন্যদের মতো কেমন নানা অলংকার বেশভূষায় সাজানো যেত।'

ভক্তের বাসনা নাকি ঠাকুর অপূর্ণ রাখেন না। সকালবেলা কৌটো খুলে গোপাল ভট্ট দেখেন, কৌটো-জোড়া একটি কালো পাথরের বিগ্রহ-মূর্তি। আনন্দে অধীর গোপাল ভট্ট তখনই দাতাকে ডেকে পাঠালেন—'আপনার বস্ত্রালংকারে সাজবার জন্যই কি আমার প্রাণের ঠাকুর রূপ ধারণ করলেন?'

ব্রজরমণ বললেন, 'ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য বিগ্রহের পশ্চাদ্দিকে অদ্যাবধি শালগ্রাম-শিলার কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। জন্মাষ্টমীর অভিষেকের সময়ে সাধারণ জনগণ দেখিতে পায়।'

দরজা খোলা হবে; ঘণ্টা বেজে উঠল। উঠে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘণ্টাধ্বনি কানে যেতে যে যেখানে ছিল আশপাশ হতে দৌড়ে আসতে লাগল। যেন ভোজ-বাজির মতো ভরে গেল প্রাঙ্গণ মেয়েতে পুরুষেতে। উঁচু বারান্দার উপরে ঠাকুরের ঘর। ছোট্ট বিগ্রহমূর্তি, ঝিক্ ঝিক্ করছে সাজে সজ্জায়। ফুল বেলপাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে অঞ্জলি দিচ্ছে সকলে, স্তব স্তুতি আওড়াচ্ছে মুখে, একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে ঠাকুরকে যতটা পারে; চোখের আড়াল এই হলেন ব'লে।

ছুটতে ছুটতে দুই বৃদ্ধ—পেটে-পিঠে এক—এসে ঢুকল সেখানে। একটু দর্শন খালি মাগে তারা। কী আগ্রহ চোখে মুখে। কোন্‌খান দিয়ে এগোবে; গলা বাড়ায় এর ওর ফাঁক দিয়ে। সময় বেশি নেই। একজন আর-একজনকে এগিয়ে দেয়, 'আহা, তুই-ই দেখ্'। তাদের জায়গা ছেড়ে দিই, সরে আসি পাশে। কী পরিতৃপ্তির হাসি ফোটে তাদের সেই তোব্‌ড়ানো গালের ফোকলা মুখে; দু চোখ টল্ টল্ করে দর্শনের আনন্দে। পিপাসায় আকণ্ঠ প্রাণ তাদের ঠাণ্ডা হয়। সাদা-চুল-ছাওয়া নেড়া মাথা নাড়ে আর ঠাকুর দেখে। যেন দেখে পছন্দ হল খুব; ঠিক এমনটিই তো চেয়েছিল দেখতে।

বড়দি বললেন, 'করলে কী? মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, অঞ্জলি দিলে না?'

ফুল বেলপাতা হাতে তুলে দিয়েছিলেন বড়দি, মন্দির খোলার সংগে সংগেই। কিন্তু—। মুঠির ফুল বেলপাতা সকলের অলক্ষ্যে সিঁড়ির পাশে ফেলে রেখে বাইরে চলে এলাম।

একটি বর্ষীয়সী বিধবা আপনা হতে এগিয়ে এসে বললে, 'হ্যাঁ বাছা, দূর দেশ হতে এসেছ, গিরিধারীকে দেখবে না, তা কি হয়? গিরিধারীকে দেখে যাও, কাছেই তো।'

বড়দি বললেন, 'যাবেন আপনি?'

'আমি এই আসছি সেখান হতে; আর যাব না। তবে এই পথ, সোজা গিয়ে ডাইনে বেঁকে যেয়ো, তার পর দু পা এগিয়েই মিলে যাবে।'

মন্দিরে তো গিয়ে দেখি—গোকুলানন্দ রাধাবিনোদ। গিরিধারী কই?

ওড়িয়া পূজারী বললে, 'অছে, অছে; পাঁচসুকা পয়সা ভেট লাগিবো।'

পাঁচ সিকা পয়সা গুনে নিয়ে পূজারী বিগ্রহের সামনে পর্দা টেনে দিয়ে অন্ধকার কোনায় ঢুকে গেল। খানিক পরে একটা ছোটো পিতলের বাক্স হাতে নিয়ে দোর-গোড়ায় এল।

কৌতূহলে আমরা ঝুঁকে পড়ি; কী না জানি বের হবে এর ভিতর হতে! কেমন

না জানি দেখতে!

পূজারী সামনে পিছনে তাকিয়ে অতি ধীরে বাক্স খুলে সীলমোহরের মতো ছোট্ট একটা চৌকো কালো পাথর হাতে তুলে নিয়ে বললে, 'দেখো।'

এই সেই গিরিগোবর্ধনের শিলাখন্ড, যা হাতে নিয়ে মহাপ্রভু চক্ষের উপর, বক্ষের উপর ধরে জপ করতেন; নাসায় ধরে ঘ্রাণ নিতেন। গুঞ্জামালা গলায় পুরীধামে গম্ভীরা ঘাটে তিন বছর এইভাবে তিনি জপ করেন।

বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে শিলাটুকু ধরতে ধরতে চাপে এক দিকে বুড়ো আঙুলের ছাপ স্পষ্ট পড়ে গেছে; যেন কাঁচা মাটিতে কেউ আঙুল দেগেছে।

পূজারী নিজের বুড়ো আঙুল সেই দাগে টিপে ধরে বললে, 'দেখো, এই হিসাবোরে গুটি দাগো পড়ি গছে ইয়ারে।'

পরে মহাপ্রভু এই শিলা আর জপের গুঞ্জামালা রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নিজের হাতে দান করেন।

রঘুনাথের আনন্দ আর ধরে না। ভাবেন, প্রভু—

'শিলা দিয়া দিলা মোরে গিরিগোবর্ধন।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা-বরণ॥'

মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'এই শিলাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মনে করে এর সাত্ত্বিক পূজা কোরো—

'এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমতো অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥'

শেষ দিন পর্যন্ত রঘুনাথ এই শিলা ও মালা ধারণ করেন। তার পর হতে গোকুলানন্দ-মন্দিরে এই শিলা সেবিত হয়ে আসছে।

বড়দি বললেন, 'জপের মালা, যেন ব্যাঙ্কে জমা টাকা। দেখো, সব পোড়ায় কিন্তু মালা পোড়ায় না। উপযুক্ত অধিকারীকে দিয়ে যায়; ব্যাঙ্কের ক্রেডিটব্যালেন্স নিয়ে সে জপ আরম্ভ করে। সেই জপের মালা রামকৃষ্ণদেব শ্রীমার পায়ে অর্পণ করেন। বুঝে দেখো তবে, তিনি কী মহাশক্তিশালিনী ছিলেন।'

নিকুঞ্জবন দেখেছি; নিধুবন বাকি। এক বন দেখেছি রাতের আঁধারে; আর বন দেখি দিনের আলোয়।

নিকুঞ্জবনের মতোই উঁচু দেয়ালে ঘেরা নিধুবন, রাস্তার পারে। গুজরাটি এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে থলি থেকে পাকা পেয়ারা বের করে খাওয়াচ্ছেন বানরদের। শশী মহারাজের সতর্কতা মনে পড়ল। কাঁধের ঝোলা ব্রজরমণের হাতে তুলে দিই। কী জানি যদি খাবার ভেবে তেড়ে ধরে আমায়। ব্রজরমণ বৈষ্ণব মানুষ, বানরদের সে বুদ্ধি আছে।

মুক্তালতায় ছাওয়া বন। লতা যেমন সচরাচর দেখি আমরা, এ ঠিক তেমন নয়। গোড়াটা মোটা গাছের গুঁড়ির মতো, ডালগুলিও বেশ মোটা মোটা; কিন্তু সবই কেমন এলিয়ে এলিয়ে একটার উপর আর-একটা জড়িয়ে ঝুলে পড়েছে; যেমন

কাঁধে হাত দিয়ে মেয়ের দল নাচতে নাচতে গোল হয়ে ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। এক-একটা গাছেই এক-একটা ঝোপ সৃষ্টি হয়েছে। সারা বনটাই এরকম ঝোপে ঝাপে ঠাসা। পরিষ্কার পায়ে-চলার পথ, যেন ঝাঁট দিয়ে রেখেছে কেউ। একটি শুকনো কুটো পাতা নেই কোথাও। সবুজ ঝোপের তলা দিয়ে সাদা সরু পথ-গুলি যেন লুকোচুরি খেলছে। বড়ো সুন্দর চাতুরীমাখা ভাব সব মিলিয়ে।

ব্রজরমণ বললেন, 'এ বড়ো আশ্চর্য মহিমা! বৃক্ষগুলি লতা হইয়া ব্রজের ধুলাতে লুটায়।'

মিরজাই গায়ে, গোলাপি পাগড়ি মাথায় এক পাণ্ডা গ্রামের একদল নানা বয়সের তীর্থযাত্রিণীর মাঝে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, 'এই হি হল মুক্তালতা। শ্রাবণ মাসে লাল লাল মুক্তা ঝল্‌মল্‌ করে। দেখে যাত্রীদের জীবন সার্থক হয়।'

শুনে মেয়েগুলি বিস্ময়ে বড়ো বড়ো করে চোখ মেলে তাকায় চার দিকের ঝোপে।

সবুজ সবুজ গুড়ি গুড়ি ফলগুলি পাকে হয়তো শ্রাবণ মাসে।

পর পর ঝোপের নীচ দিয়ে চলেছি। ভাবে-বিভোর ব্রজরমণ বললেন, 'শোনা যায়, বৃন্দাবনের বৃক্ষাবলী ঊর্ধ্বমুখী নহে। কথাটার সত্যতা এখানে ধরা পড়ে।'

সাধু মহাপুরুষরা বলেন, 'বৃন্দাবনের রজ পাবার আশায় বৃক্ষগুল্ম লালায়িত। উদ্ধবও বলেছিলেন, এই ব্রজধামে তৃণগুল্মরূপে যেন জন্মগ্রহণ করি। কারণ কৃষ্ণ-প্রেমপাগলিনী ব্রজগোপীদের চরণরেণু মিশে আছে ধূলিতে।'

দলবল নিয়ে সেই পাণ্ডাও চলে আমাদের আগে আগে। পুরানো গাছের যে মোটা ডালগুলি নুয়ে মাটিতে ঠেকেছে, পাণ্ডা তারই একটা ডাল দু হাতে ধরে যাত্রিণীদের বলে, 'এই-যে দেখছ গাছের ডাল, এ ডাল না আছে।'

পা থামিয়ে কান পাতি।

পাণ্ডা বলে, 'কৃষ্ণ এলেন এখানে লীলা করতে ; দেবতারা বললেন, আমরা ভি যাব দেখতে। কৃষ্ণ বললেন, তা এই বেশে তো যেতে পারবে না, লোকেরা চিনে ফেলবে। দেবতারা বললেন, বেশ, অন্য বেশেই যাব যাতে চিনতে না পারে। তখন দেবতারা এইসব ডাল হয়ে এলেন এখানে। দেখছ না পাতা তো মাটিতে পড়বেই জানা কথা ; কিন্তু ডাল কি মাটিতে পড়ে কখনো? তাই এই দেখো, ডালগুলিও এখানে মাটিতে লুটোচ্ছে। ব্রজধামে এইভাবে দেবতারা কৃষ্ণের পদধূলি পায়। এখানে প্রণাম করো, কত দেবতাকে প্রণাম করা হয়ে যাবে।'

এই নিধুবনেই স্বামী হরিদাস 'বাঁকেবিহারী'কে পান। স্বামী হরিদাস ভজন করতেন এখানে ; একদিন স্বপ্নে দেখেন, কৃষ্ণ বলছেন, 'আমি এই জায়গায় মাটির নীচে আছি, আমাকে তুমি তোলো।' পরদিন সেই জায়গা খুঁড়ে মাটি সরাতেই তাঁর আবির্ভাব হয়। তাই সেদিন বাঁকেবিহারীকে দেখবার সময় বৈষ্ণবরা গেয়ে উঠে-ছিল—

'জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারী, রাধা বঙ্কবিহারী রাধে,
হরিদাস স্বামীর প্রাণধন হে॥'

এই হরিদাস স্বামীই আকবরের দরবারের প্রধান গায়ক তানসেনের গুরু।

একবার আকবর তানসেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গুরু কে? যাঁর শিষ্য এমন গায়ক, গুরু না জানি কী!'

গুণগ্রাহী সম্রাট তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হন। তানসেন নিয়ে এলেন আকবরকে বৃন্দাবনে। হরিদাস আদর করে বসালেন উভয়কে।

তানসেন তানপুরা নিয়ে একখানা গান গাইলেন। গান শেষ হতে গুরু তাঁর তানপুরায় তান তুলে সেই গানই গাইলেন বিহারীজির সামনে বসে। শুনে আকবর মুগ্ধ।

উপযুক্ত শিষ্যের উপযুক্ত গুরু। আনন্দবিহ্বল চিত্তে ফিরে গেলেন সম্রাট। দরবারে গিয়ে সেই গানই শুনলেন ফিরে তানসেনের গলায়। বললেন, 'একই গান তোমার গুরুর কণ্ঠে শুনেছি, সে অন্য এক রসের আস্বাদন তাতে। তোমার গলায় সে রস কই?'

তানসেন বললেন, 'জাঁহাপনা, আমি গান করি দিল্লীশ্বরকে খুশি করবার জন্যে; আর গুরু গান করেন জগদীশ্বরকে আনন্দ দেবার জন্যে।'

নিধুবনেই স্বামী হরিদাসের সমাধি। ছোট্ট একটি মাটির কুটির। তাঁর নিজের হাতের তানপুরাটি ঝুলছে দেয়ালে, আর একটি আঁকাবাঁকা লাঠি—চলতে ফিরতে হাতে থাকত এইটি।

ভুর্ ভুর্ করে সুগন্ধ এল নাকে।

এক ভক্ত বৈষ্ণব যত্নে লেপছে মাটির সমাধি, মেঝে, দেয়াল—গামলাভরা মাটি-গোলা জলে চুয়া-চন্দন মিলিয়ে।

গুরু হরিদাস স্বামী একনিষ্ঠ মধুর ভাবের সেবক ছিলেন; নিজেকে রাধার সখী-রূপে চিন্তা করতেন। তাঁর এই ভাবের গভীরতার কথা ভাবছিলাম মনে মনে।

গল্প শুনেছি, একদিন হরিদাস যমুনায় স্নান করে তীরে বসে ভজন করছেন, এমন সময়ে তাঁর এক পাঞ্জাবি শিষ্য খুঁজতে খুঁজতে সেখানে উপস্থিত। গুরু ধ্যানে মগ্ন। শিষ্যের আর সবুর সয় না; বহু কষ্টে এক শিশি দামি আতর এনেছে সংগ্রহ করে, তাই তুলে দেয় কোলের উপর রাখা গুরুর খোলা হাতখানায়। ভাবতে ভাবতে এসেছে সে, গুরু এটি পেয়ে কত খুশি হবেন, এই দিয়ে বিহারীজির সেবা করবেন। কিন্তু গুরুর হাতে আতরের শিশি পড়তেই তিনি তার ছিপি খুলে সবটা বালিতে ঢেলে দিলেন।

ভক্ত হায় হায় করে উঠল। এ কী হল! বিলাসসম্ভার এনেছি বলেই কি গুরু তা এইভাবে ফেলে দিলেন? তিনি তো জানতেও পারলেন না কতখানি মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করেছি আতর। সামান্য জিনিস ভেবেই এমন উপেক্ষা করলেন?

হরিদাস ধ্যান ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন; সামনে শিষ্যকে দেখে সহাস্য কুশল-প্রশ্ন করলেন।

শিষ্যের মুখ ম্লান।

হরিদাস শুধোন, 'তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখি কেন?'

শিষ্য কাতর হয়ে আতরের ঘটনা খুলে বলে।

শুনে হরিদাস হো হো করে হেসে ওঠেন—'এই কথা! আমি ভেবেছিলাম অন্যরূপ। দেখলাম: যমুনার তীরে বিহারীজির হোলিখেলা শুরু হয়েছে—এক পক্ষে সখাসমেত বিহারীলাল, অন্য পক্ষে সখীবৃন্দ-পরিবৃতা রাধা আমার। আমি

ছিলাম রাধার দলে। বিহারীলাল যখন পিচকারি দিয়ে রাধাকে আক্রমণ করেন, আমি হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ভাবছি, কী করি! এমন সময়ে এক সখী আমার হাতে এক শিশি আতর দিল। আমি তাড়াতাড়ি ছিপি খুলে সেই আতর বিহারীলালের মাথায় উপুড় করে ঢেলে দিলাম। বিহারীজির আপাদমস্তক আতরে প্লাবিত হয়ে গেল; তিনি পিচকারি হাতে পিছু হটে গেলেন। খেলায় রাধার জয় হল; আমরা আনন্দে অধীর হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলাম।

'এখন বুঝলাম তুমিই আতর দিয়েছিলে। তা দিয়েছিলে বড়ো উপযুক্ত সময়ে। তোমার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। আতর বিহারীজির অঙ্গেই সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছে; তোমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক।'

তবু শিষ্যের মুখ প্রফুল্ল হয় না। ভাবে, গুরু আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছেন হয়তো।

হরিদাস বললেন, 'যাও, শীঘ্র গিয়ে মন্দিরে বিহারীজিকে দর্শন করো; বুঝতে পারবে।'

শিষ্য দৌড়ে মন্দিরে এসে দেখে, বিহারীজির সর্বাঙ্গ তারই আনা আতরে সিক্ত।

মনে দ্বন্দ্ব জাগে। এই-যে যত কথা, কাহিনী শুনি—সবই সত্যি?

জগদানন্দ স্বামী—যাঁর বিষয় শশী মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমন্বয় যদি কেউ থাকে, তা তিনি। মনে প্রশ্ন জাগলে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন।' স্বামীজি বৃদ্ধ; টক্ টক্ করছে গায়ের রঙ, বৈষ্ণবসুলভ মুখের ভাব, চোখে জ্ঞানের দীপ্তি। বললেন, 'ভক্তিতে যা সম্ভব হয় জ্ঞানের বিচারে তার কাছেও পেঁছিতে পারে না কেউ। আমরা তো কোন্ ছার, কত মহা মহা গুণী জ্ঞানী বিচার করতে করতে এক জায়গায় গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছেন; থই পান নি। এ জিনিস ভাবনার বাইরে। অন্তরে অনুভূতি জাগে। বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

'তাঁকে যে যে-ভাবে চায় সেই ভাবেই তিনি ধরা দেন। ঘটনা বলি একটা। একজন শিশুপুত্রের মতো তাঁকে চেয়েছিল; শিশু হয়েই তিনি এলেন। খাটের উপরে শিশুগোপাল শুয়ে আছেন; এমন সময় খাটের নীচে একটা বেরাল ডেকে উঠল। বেরালের ডাক শুনে শিশু কেঁদে উঠতেই ভক্ত হাসল, বলল, ত্রিভুবনেশ্বর তুমি, আর বেরালের ডাকে ভয় পাও—এ কী? তখনই দেখা গেল, শিশু আর সেখানে নেই। শিশুভাবে কামনা ক'রে তাঁকে ত্রিভুবনেশ্বর দেখে; মনে ঐটুকু সংশয় ছিল তার।

দুপুরে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। এই ফাঁকে ঝোলা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ি যমুনার চড়ায়। উত্তপ্ত বালি; লাফিয়ে লাফিয়ে চলি। ফোস্কা পড়ে যায় পায়ের তলায়।

এরই মধ্যে মধ্যাহ্ন-সূর্য মাথায় নিয়ে চার দিকে ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়ে গরম বালির উপর 'পঞ্চতপায়' বসেছেন কত সাধু। কঠোর তপস্যা। এমনিতেই এমন আগুনের হল্‌কা হাওয়াতে, তার উপরে আগুন জ্বালিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ করা একঠায় বসে!

তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে এক-হাত-সমান পায়ের নীচের বালি সরিয়ে বসে পড়লাম

সেখানে। নীচের বালিটা তবু সহনশীল।

খাতা পেন্সিল কোলে নিয়ে স্কেচ করতে লাগলাম তাঁদের।

সহজ সাধনার পন্থা তো অনেক আছে ; তবু কেন তাঁরা শখ করে এইসব পথ বেছে নেন তা তাঁরাই জানেন।

এক টুকরো কানিতে মুখ বুক ঢেকে, তারই আড়ালে জপ করে চলেছেন। জপের হাত নাকি দেখাতে নেই কাউকে। ঢাকার ভিতর থেকে দর্ দর্ ধারে ঘাম পেট পিঠ বেয়ে পড়ছে ; সেই ঘাম গায়েই শুকিয়ে দাগ আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

শুনেছিলাম প্রয়াগদাসের কাছে তাঁদের তপস্যার নিয়ম। বলেছিলেন 'সব ছেড়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে থাকি। অসুখবিসুখ দেহধারী মাত্রেরই আছে। কিন্তু আমাদের কথায় কথায় ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হলে চলবে কী করে? তাই সকলের আগে শরীরকে সব-কিছু সহ্য করিয়ে তৈরি করে নিতে হয়।

'বর্ষায় চার মাস শতধারায় স্নান করি ; বেলা দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত একশো আট ঘড়া জল মাথায় ঢালি। অনেক সময় ঘড়া, কলসী পাওয়া মুশকিল হয় ; ঝরনা বা গঙ্গার জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও চলে।

'গরম কালে পাঁচশো ঘুঁটের দু সারি সামনে, তিন সারি পিছনে সাজিয়ে আগুন জ্বালি। মাথা ছাপিয়ে সে আগুন ওঠে। চার মাস তার ভিতরে বসে জপ করি। বনে বনে ঘুরে ঘুরে গোবর কুড়িয়ে নিজেরাই ঘুঁটে দিই।'

'শীতকালে চার মাস কংকর-বিছানায় শুই ; খালি গায়ে একটিমাত্র ল্যাঙট পরে পাথরের উপর শুয়ে থাকি। পর পর কয়েক বছর এই ভাবে চলতে হয়। শরীর মজবুত হয়ে যায়। এক-এক সাধুর শরীর দেখবে লোহার মতো শক্ত ; আঙুল বসাতে পারবে না, পাথরের মূর্তির মতো। গায়ে ছাই মাখাও একটা আত্মরক্ষার উপায়।'

পিঠে কুঁজ এক নাগা—এঁকে দেখেছি অনেকবার পথে ঘাটে, যমুনার তীরে ; পঞ্চতপায় বসেছেন আমার কাছ হতে হাত-কুড়ি দূরে ; তাঁকে এড়িয়ে স্কেচ করছি পাশের জনের ; দেখি, জোরে নিশ্বাস টেনে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। আশ্চর্য, তাঁর পিঠের কুঁজ মিলিয়ে গেল যেন! এ কি আমারই চোখের ভ্রম?

বড়দি বলেছিলেন, 'পঞ্চতপার রজঃ বড়ো পবিত্র। ছোটো ছেলেদের অসুখ-বিসুখে একটু কপালে ছুঁইয়ে দিলে ভালো হয়ে যায় ; একটু যদি জোগাড় করতে পারতাম—'

একটা খালি আসন পড়ে আছে কাছে ; কাল দেখেছিলাম এখানে একজনকে পঞ্চতপায় বসতে। চলে গেলেন নাকি?

উঠে সেখানকার ভস্ম বালি যব গম সব মিলিয়ে এক মুঠো রজঃ নিয়ে ঝোলাতে পুরে এক-পায়ে দু-পায়ে এগিয়ে যাই নাগাসম্প্রদায়ের দলে।

কে বলে নাগারা রাগী, নাগারা সাংঘাতিক? ভয়ে ভয়ে তফাত রেখে ঘুরছি আর অতি সন্তর্পণে খাতায় স্কেচ করছি। দেখতে পেয়ে তাঁরা এক এক করে দল বেঁধে ঘিরে দাঁড়ালেন। মজা পেয়ে যান। ইনি বলেন, 'আমায় আঁকো' ; উনি বলেন, 'আমায় আঁকো'। ভারি খুশি সব। তাঁদের আস্তানার ভিতর ঢুকে আসর জমিয়ে বসি। ছোটো ছেলের মতো মহা আগ্রহে তারা উপুড় হয়ে ছবি আঁকা দেখতে

থাকেন। তাঁদের ছেলেমানুষিতে আমি হাসি, আমার হাসিতে তাঁরা হাসেন। স্থান কাল বয়েস ভুলে যাই মুহূর্তে। শুনি, পাশের দুই সাধুতে কথা হচ্ছে, একজন আর একজনকে বলছেন, 'এ বোধ হয় আমার নেপাল দেশেরই মেয়ে হবে ; কেমন সুন্দর গোলগাল দেখতে।'

কতকগুলি লোক, যাত্রী বাসিন্দা মিলে হৈ হৈ করে উঠল—'পাগলা হাতি', 'পাগলা হাতি'। যমুনায় স্নান করাচ্ছিল হাতিটাকে মাহুত ; জল পেয়ে হাতির ভারি আনন্দ ; সে এদিকে যায়, ওদিকে যায়, শুঁড় দিয়ে জল তুলে ফোয়ারা বানায় ; আর দেখে ভয়ে লোকেরা ছুটোছুটি লাগায়। বলে—'পালাও যে যেখানে আছ। গতবার দু-দুটো লোক মেরে ফেলেছিল পাগলা হাতিতে।' হুলুস্থুল বেধে যায় লোকের দৌড়ঝাঁপে।

বড়দি ভাবছিলেন আমার দেরি দেখে। বললেন, 'চলো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আনন্দময়ী মা আছেন এখানে, দেখে আসি।'

বলি, 'তার আগে চলো-না মৌনী সাধু দেখতে, কাছেই তো।'

আজই সকালে শুনেছি এঁর কথা। বলছিলেন এখানকারই এক স্বামী—'গত দশ-বারো বছর ধরে দেখছি এক ভাবে এক ঠাঁয়ে বসে আছে যমুনার তীরে একটা কুলগাছের তলায়। কী খায় না খায় কিছু জানি না। এতদিন তো কথা কইত না, এখন দু-চার কথা বলে, তাও আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে। সেবার বন্যা হল ; এই-যে সেবাশ্রম দেখছেন এত উঁচুতে, সব ভেসে গেল। আমরা শহরে উঠে গেলাম কিছুকালের জন্য। আর ঐ সাধু তখনও সে জায়গা ছাড়ল না ; কুলগাছটার উপরে উঠে বসে রইল। রিলিফের লোকেরা নৌকো করে খাবার বিলোতে এসেছিল, তাও আট-দশ দিন বাদে। এসে দেখে তাকে ঐ অবস্থায় গাছের উপরে। সঙ্গে কিছু বিস্কুট ছিল, তাই তারা দিয়ে গেল। সাধু তো নিল সেগুলি, কিন্তু খেল কি না কে জানে।'

যমুনার পাড়ের উঁচু পথ ধরে চলেছি। কত সাধুর ভিড় এখানেও। এর মধ্যে চিনে বের করা যায় কী করে? এগিয়ে গিয়ে ভাবি, হয়তো ফেলে এলাম ; ফিরে গিয়ে ভাবি, হয়তো সামনে গিয়ে পাব। 'সেবাশ্রমের কাছাকাছি' বলতে কতখানি পথ তাঁদের মনে ছিল মাপ নিই নি তো!

বড়দি বললেন, 'শেষ তো একটা আছে পথের? চলো না, এগিয়েই দেখি।'

যেতে যেতে সাধুসন্ন্যাসীর ভিড় পেরিয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ি। দু-একখানা ঘরও দেখা যায় রাস্তার পাশে, হয়তো এখানকার চাষী বাসিন্দাদের। তাও পেরিয়ে যাই। নির্জন বালির উপরে ঐ তো একটা কুলগাছ!

কাছে গিয়ে দেখি, চটের ছালায় আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে বসে তার ভিতর হতে রেগে রেগে বকে চলেছে কে একজন সম্মুখের একজোড়া গুজরাটি বৃদ্ধবৃদ্ধাকে—'কী? এখানে দাঁড়িয়ে মজা কী দেখছ? আমি তো দোকান সাজিয়ে বসি নি। যারা দোকান সাজিয়ে বসেছে তাদের কাছে যাও। আমাকে বিরক্ত করলে ভালো হবে না। আমি রাগলে লাভ নেই কারো। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ক্ষতি করলে আমিও ক্ষতি করতে জানি।'

বকুনি শুনে মুখ টিপে হাসছেন তাঁরা। চেনেন বোধ হয় সাধুকে। ইনিই তা হলে সেই মৌনীসাধু, মৌন ভঙ্গ করেছেন সম্প্রতি? কিন্তু দেখতে কেমন?

বসে পড়ি তাঁর সামনে, বালির উপরে। কাঠবেড়ালি শালিক টিয়া লাফালাফি করে কুলগাছে; পাকাপাকা কুল টুপ্‌টাপ্‌ তলায় ফেলে—কোনোটা গোটা, কোনোটা আধ-খাওয়া।

নিজেকে সব দিক হতে ঢেকেঢুকে জবুথবু হয়ে বসে আছেন মৌনী সাধু পুঁটলির মতো। পাশে দইয়ের খুরির মতো একগাদা ভাঙা খুরি। কেউ হয়তো খাবার দিয়ে যায় তাতে করে। একটা ভাঙা কুঁজো, জলের। এ পথ দিয়ে যেতে চালে-ডালে-মেশানো এক মুঠ চটের উপরে ফেলে পুনিা কুড়োতে কুড়োতে চলে যাত্রীরা। কয়েকটা কাঠবেরালি নিশ্চিন্তমনে কুট্‌কুট্‌ করে কয়েকটা চাল ডাল খেয়ে সাধুর গায়ের উপর দিয়েই ছুটে পালাল।

ছেঁড়া চটের ফুটো দিয়ে মৌনী সাধুর ডান চোখটা দেখা যায় খালি। সেই এক চোখে সাধু আমাদের দেখে মুখের ঢাকাটা সরিয়ে দিলেন। জটাতে চুলেতে দাড়িতে জাপটাজাপটি সে মুখ। তারই মধ্যে যেটুকু দেখা যায়—টিকোলো নাক, বড়ো বড়ো চোখ, রঙ বোধ হয় এককালে ফরসাই ছিল। সুপুরুষ তো নিশ্চয়ই। বয়েস কত আর হবে—মাঝবয়সী, কি তারও কম। বাংলা হিন্দি জড়ানো কথা। মনে তো হয় বাঙালীই হবেন বা। দেশী লোক দেখে তাই কি নরম হল মন?

আত্মীয়ের মতো প্রশ্ন করতে থাকেন, কোথায় আছি, কী করছি, কতদিন থাকব—এমনি সব হাল্কা কথাবার্তাই বেশি। বৃন্দাবন-পরিক্রমার রাস্তা এটা। সকাল বিকেল অনেক যাত্রী পরিক্রমায় যায় এই পথে। আমাদের দেখে অনেকে এসে বসে পড়ে সেখানে। ভিড় জমে যেতে দেখে সাধুর আবার রাগ হয়, কথা বন্ধ করে দেন।

দাদা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'চলি আমরা।'

সাধু মাথা নাড়েন, 'বোসো আর একটু, প্রসাদ দেব।'

এক পাঞ্জাবি ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ থেকে ধন্না দিয়েছেন—তাঁর একমাত্র মেয়ে অসুস্থ; ওষুধ চান। চেয়ে চেয়ে জবাব না পেয়ে শেষটায় উঠে গেলেন। সাধু মুখ খুললেন, 'ওষুধে কি নিয়তি বদলায়? বলি, গুরুর উপর বিশ্বাস রাখো, মন্ত্র জপ করো; তা না, কেবল এসে বলে, ওষুধ দাও।'

ব্রজরমণ ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা জটিল প্রশ্ন করে বসেন।

সাধু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, 'আজ কত বছর এমনি হয়ে পড়ে আছি; জল ঝড় রৌদ্রতাপ সব গেছে এই শরীরের উপর দিয়ে। এক পাথর পারে এমনি ভাবে সইতে। সেইরকম পাথর করে ফেলেছি নিজের দেহকে। বোধশক্তি রাখি নি। তুমি যা প্রশ্ন করলে সেসব ভারি কথা বলতে আমার মাথায় লাগবে, কষ্ট হবে। এখনো ততটা শক্তি ফিরে পাই নি দেহে।'

এমন সরল কথা শুনে বড়ো ভালো লাগল। সাধু চটের ভিতর থেকে বাঁ হাত বের করে বললেন, 'এই নাও প্রসাদ।'

লাড্ডুর গুঁড়ো খানিকটা। নিই হাত পেতে; কিন্তু মুখে দিতে পারি না। ঐ চটের ভিতরে নোংরার মধ্যে না জানি কী ভাবে ছিল লাড্ডু।

প্রসাদবিতরণ হচ্ছে দেখে অন্য যাত্রীরাও এসে হাত পাতে।

সাধু রেগে ওঠেন, 'বারে বারে হাত বের করতে আমার অসুবিধা হয় ; ঐ প্রসাদই ভাগ করে খাও।' বলে ফের মুখ ঢাকা দেন।

তাড়াতাড়ি আমার হাতের প্রসাদ যাত্রীদের হাতে তুলে দিই।

বুকের কাছে চটের উপরের কাঁপন দেখে বুঝতে পারি, সাধুর ডান হাতের আঙুল নাড়ার সংগে সংগে জপের মালা ঘুরছে হাতে। প্রসাদের বেলায়ও ডান হাত বাইরে আসে নি তাই।

ব্রজরমণ বললেন, 'বংশীদাস বাবাজির কথা জানি, তিনিও কিছু আহার করিতেন না। গংগার ঘাটে বসিয়া বসিয়া কেবল তামাক খাইতেন ; যে যাহা দিত সম্মুখে তেমনই পড়িয়া থাকিত, পচিয়া যাইত। কেহ কেহ আবার আহার্য দ্রব্য তুলিয়া লইয়াও যাইত।'

কয়েক পা পথ এগিয়ে বড়দি দুটো টোপাকুল বের করে একটি আমাকে দিলেন, একটি নিজের মুখে ছুঁড়লেন। বললেন, 'কোলের কাছেই ফেলে দিয়েছিল কাঠ-বেরালি ; কুড়িয়ে নিয়ে হাতে রেখে দিয়েছিলাম।'

ভাবতে ভাবতে চলি, এই-যে সব-কিছু ছেড়ে এঁদের এই সাধনা, মানবের কী উপকারে লাগে তা?

বড়দি বলেন, 'আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস থাকলে উপকার হয় বৈকি। কেউ টাকা দিয়ে সেবা করে, কেউ করে শক্তি দিয়ে, কেউ সাধনা দিয়ে। সিপাই মিউটিনির পরে, এক্স্ সৈন্যেরা অনেকে যোগী হয়ে চলে যান হিমালয়ে সাধনা করতে, দেশের স্বাধীনতার জন্য। নাম-করা-করা সাধু হয়েছেন তাঁরা পরে। সত্যানন্দজি, মহানন্দজি, বিশুদ্ধানন্দ গিরি, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, বালানন্দের গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী, আরও কত জন! এঁরা কেউ "অ্যানার্কিস্ট্" ছিলেন, কেউ সিপাই মিউটিনিতে ছিলেন। যে-সে লোক তো নন এঁরা। এঁরা যোগশক্তি "অ্যাপ্লাই" করেছিলেন। বাইরের সেবাটাই আমরা দেখতে পাই! আজকের দিনের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে এঁদের দানও কম নয় কোনো অংশে।'

বৃন্দাবনের আর-এক প্রান্তে ওড়িয়া-বাবার মঠ ; সেখানে আছেন আনন্দময়ী মা। চলতে চলতে থমকে যাই। যে কয়টা টাংগা আছে, তা কেবল মথুরা বৃন্দাবন করে। শহরে চলাচলের বড়ো অসুবিধে। আর টাংগা চলবেই বা কী করে? বেশির ভাগই তো গলিপথ। গাড়ি ঘোড়া ঢোকে না তাতে। তবু খোশামোদ করি, খানিকটা যদি এগিয়ে দেয় পথ। বহু কষ্টে জোগাড় হয় একটা। আরাম করে বসতে না বসতে ব্রহ্মচারীর মন্দিরের সামনে নামিয়ে দিল ; আর যাবে না।

গোয়ালিয়রের রাজা এই মন্দির তৈরি করে ব্রহ্মচারী বাবাকে উৎসর্গ করেন।

প্রকাণ্ড মন্দির নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায়ের আচার্যদেব ছিলেন মহর্ষি নারদের শিষ্য।

গল্প আছে, একবার কয়েকজন জৈন সাধু দিবা-অবসানে আশ্রমে আসেন। জৈনরা সূর্যাস্তের পর আহার করে না। নিমগাছের ফাঁকে তখন দিনান্তের রবি অস্ত যায়-যায় প্রায়। অতিথিদের অভুক্ত থাকতে হয় দেখে আচার্যদেব সুদর্শন-

চক্রকে আহ্বান দ্বারা সেই অস্তমান সূর্যকে বন্দী করে নিমগাছে আটকে রাখলেন। অতিথিদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর সূর্যদেব মুক্তি পেলেন। সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখেন তখন দুই প্রহর রাত্রি। নিম্ববৃক্ষে সূর্যকে ধরে রেখেছিলেন বলে সেই অবধি তাঁর নাম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য।

রাসলীলা হচ্ছে নাটমন্দিরে। দোল-উৎসবে মিলন ঘটে গেছে ; আর বিরহ নেই। রাধাকৃষ্ণ এক সিংহাসনে বাঁশি মুখে গলাগলি বসে। যুগলরূপ-দর্শনের আবেশ লাগে ভক্তদের চোখে। সেই চোখে আটকা পড়েন ভগবান কিছুক্ষণের তরে।

পূজারী বললেন, 'এখন বংশীবটে হয় ; আগে এখানেই রোজ রাসলীলা অভিনয় হত। একদিন রাত্রিশেষে অভিনয় ভেঙে গেলে সবাই দেখে, কে যেন একজন সভা ছেড়ে দৌড়ে মন্দিরে ঢুকে গেল। মাত্র মুহূর্তের দেখা ; আকুল হয়ে ওঠে সবাই। "এই তো এই পথ দিয়েই গেল"—নিশানা মিলিয়ে চোখ বুলোতে বুলোতে আসে ; নাট-মন্দিরের পুরু কার্পেট শেষ হয়েছে যেখানে মন্দিরের কাছে, সেখানে দেখে সাদা পাথরের মেঝের গায়ে দৌড়ে-যাওয়া দুটি চরণের স্পষ্ট ছাপ।

আজও আছে তেমনি। ফুল-বেলপাতায় ঢাকা। হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে দেখলাম। হতে পারে সত্যি ; হতে পারে পাথরের গায়ের স্বাভাবিক রেখা—সাদার গায়ে হাল্কা কালো রঙের কালের বয়স লেপা।

ব্রজরমণ হাঁটু গেড়ে বসে চরণচিহ্ন দুখানি নরম হাতে বুলিয়ে সর্বাঙ্গে মেখে নেন। চরণধূলি করুণা লাভে বিভোর হয়ে পড়েন।

ভক্তের হাতের এই-যে মৃদু স্পর্শ, এই মধুর সত্যিটুকুই মনে গেঁথে নিই।

খুঁজতে খুঁজতে আনন্দময়ী-মার আশ্রমে আসি। দরজা পেরিয়ে আমরাও ভিতরে ঢুকেছি কি একদল মহিলা হুড়্ হুড়্ করে সেই দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যেতে বড়দিকে বলি, 'চলো, ভিতরে যাই।'

বড়দি বললেন, 'আর ভিতরে গিয়ে কী করব? আনন্দময়ী-মা তো বেরিয়ে গেলেন।'

'আনন্দময়ী-মা! ওঁদের মধ্যে? কোন্ জন? ঐ-যে সাদা থান পরা লাবণ্যবতী এক বয়স্কা, তিনিই কি?'

বড়দি মাথা ঝাঁকালেন ; বললেন, 'ফোটো দেখেছি অনেক, তাতেই চিনতে পারলাম।'

আশ্চর্য! সাজে সজ্জায় কোনো তারতম্য নেই। কেবল মুখখানি আকৃষ্ট করে শতেক ভিড়ের মাঝেও। বলি, 'চলো বড়দি, কোথায় গেলেন অত দলবল নিয়ে গিয়ে দেখি।'

মনে হতেই ছুটি দলের পিছনে। কাছেই হরিবাবার আশ্রম। সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একখানা ঘরের সামনেকার একফালি ছাদে এসে জড়ো হই। এইটুকু জায়গায় কজনই বা ধরে, বাকি সব কেউ সিঁড়ি ধরে ঝুললেন, কেউ নীচে দাঁড়িয়েই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রইলেন। ভিড়ের আগে জায়গা নেবার কায়দা জানা থাকলে কত সুবিধে!

সামনের ঘরখানা হতে ঋষিতুল্য হরিবাবা বেরিয়ে এলেন। গেরুয়া আলখাল্লা

গায়ে ; কী রূপ, যেন এক ঝলক আলো এসে পড়ল সেখানে। আনন্দময়ী-মা থালায় সাজিয়ে উপহার এনেছেন—গেরুয়া বস্ত্র, ফলফুলের ডালা। আজ হরিবাবার জন্মদিন। হরিবাবা হাসিমুখে বস্ত্র ফলফুল গ্রহণ করে ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন, 'এখানে তো সকলের স্থান অকুলান হবে ; নীচে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি আসছি এখনি। কীর্তন হবে।'

অনেকের কাছে হরিবাবার কীর্তনের কথা শুনেছি : 'যাচ্ছ ওখানে, পার তো হরিবাবার কীর্তন শুনে এসো। শোনবার মতো জিনিস।' ভাগ্য সুপ্রসন্ন ; হঠাৎ কেমন সব-কিছুর যোগাযোগ হয়ে সুযোগ ঘটে গেল।

হরিবাবা নীচে নেমে এলেন। অন্যরা আগেই তৈরি ছিলেন খোল করতাল নিয়ে। হরিবাবা মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হাত জোড় করে দম নিয়ে আরম্ভ করলেন, 'রা—া—া—া—'। এই 'রা' থেকে আর-এক দমে 'ধা' পূর্ণ করতেই কেটে গেল পুরো দশ মিনিট। এক-একবার এইরকম দীর্ঘস্বরে 'রা—ধা' নাম পূর্ণ করেন আর এক-এক পর্দা সুর চড়িয়ে ধরেন। চড়তে চড়তে যখন শেষ ধাপে গিয়ে পেঁছিল তখন আবার তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনতে আনতে অতি-মৃদুতে নিয়ে এলেন। এখন সুরের দীর্ঘতা কমিয়ে দ্রুততালে নাম ধরলেন। দোহাররা খোল করতাল বাজাতে লাগল। হরিবাবা একটা কাঁসরঘণ্টা হাতে তুলে নিলেন ; ধীরে ধীরে আবার সুর চড়তে লাগল, তাল দ্রুততর হল। সেই তালে ঘুরে ঘুরে হরিবাবা তালে তালে ঘণ্টা বাজিয়ে চললেন। দেখবার মতো এই নাচ, ভঙ্গি। সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে নাম গাইছেন ; আবার সেই শক্তিরই রাশ চেপে ধরে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে দুলিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। এ যে পাগলের আত্মভোলা উন্মত্ততা। নাচে গানে তুমুল তাণ্ডব ; অথচ সব স্থির, যেন সুতোয়-গাঁথা নিখুঁত পরিপাটি মালা একগাছা।

পথে এসে বড়দি বললেন, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছিলে কি, প্রথম "রাধা" নামের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন হরিবাবার মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল। কী অদ্ভুত শিহরন নামের!'

নিম্বার্ক আশ্রমের পাশ দিয়ে ফিরছি। পাতা-ঝরা নিমগাছটার কাঠি কাঠি ডালের ফাঁকে গোল চাঁদ উঠছে। পথের মাঝখানে একজন হিন্দুস্থানি পুরুষ বড়ো একটা গোল 'চাক্তি বাজনা' হাতে তুলে আঙুল ঠুকে বাজাচ্ছে আর দুজন স্ত্রীলোক গান গাইছে—যমুনার তীরে বাঁশি বাজিয়ে কৃষ্ণ রাধাকে ডাকে, শাশুড়ি-ননদিনীর কড়া পাহারা, রাধা কেঁদে আকুল—'ম্যাঁয় ক্যায়সে জাওঙ্গী।'

অন্য জায়গায় হলে লোকে দেখে বলত 'পাগল'। এখানে আর কে কাকে বলে।

দুপুরের কড়া রোদে মাথা মুখ পোড়ে, ঘূর্ণি হাওয়ার ধুলোতে নাক চোখ ঢেকে দেয় ; তবু বেরিয়ে পড়ি বাইরে। মন টেঁকে না ঘরে। একজনের জন্য বের হতে হয় দলের সবাইকে। কিন্তু যাই কোথা? সব মন্দির বন্ধ। ঠাকুরের না-হয় বিশ্রামের দরকার নেই ; কিন্তু পূজারী? ঠাকুরের দরজা খোলা থাকলে তার বিশ্রাম হয় কী করে?

এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে করি। খোলা ফটকের ভিতর দিয়ে বড়ো একটা প্রাসাদ দেখা যায়; হবে হয়তো কিছু। ঢুকে পড়ি ভিতরে। প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি; ঠিক বাগানবাড়ি নয়, ও তো থাকে বড়োলোকদের। দেবতার হল মন্দির। গরমের সময়ে রঙ্গনাথজি হাওয়া খেতে আসেন এখানে রোজ বিকেলে। দুপাশে নানা ফলফুলের বাগান; মস্ত নাটমন্দির, পুকুর, কত কী! বাঁধানো পথ উঁচু হতে হতে উঠে গেছে নাটমন্দির পর্যন্ত। গড় গড় করে রঙ্গনাথজির গাড়ি সোজা গিয়ে ঢোকে ভিতরে।

কটা দিনের জন্য কী রাজকীয় ব্যবস্থা! রঙ্গনাথজির বাগানমন্দিরে বসে খানিক জিরিয়ে চলি আবার অন্য খোঁজে। বড়দি বললেন, 'শুনেছি কাত্যায়নীর মন্দির এখানেই হবে কোথাও, বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত। অনেকে বলেন পীঠস্থান; সতীর কেশ পড়েছিল। সম্প্রতি পীঠোদ্ধার হয়েছে। খুঁজে বের করো তো।' ব'লে নিজেই ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকান।

দাদা বললেন, 'ঐ তো, ঐটাই হবে বোধ হয়; ঐ যেটা নিমগাছ ফুঁড়ে উঠেছে।' ব'লে ঘট-বসানো মন্দিরের চূড়া দেখালেন আঙুল দিয়ে।

সারি সারি পাকাপাতা-ভরা নিমগাছ, তলার শুক্‌নো পাতা ঝেঁটিয়ে জড়ো করছে ব্রজবালক। দুটো গোরু পরম পরিতোষে খাচ্ছে সেই পাতা তাদের তাড়া খেয়েও।

বড়দি বললেন, 'যে বালির দেশ! নয়তো নিমপাতাও গোরুতে খায় শুনি নি কখনো।'

ব্রজবালকের কাছে পথ জেনে নিই কাত্যায়নী-মন্দিরের। নতুন মন্দির; কেউ কোত্থাও নেই; নিঝুম পুরী। বন্ধ দরজার ভিতরে দেবী কাত্যায়নী।

কাগজিলেবুর ঝোপের আড়ালে বড়ো বড়ো হাঁড়ি কড়াই মাজছে পালোয়ান খোট্টা চাকর। নিশ্চয়ই আজ বিশেষ রকমের ভোগের ব্যবস্থা গেছে দুপুরে; তাই দিবানিদ্রায় এখনও অদৃশ্য সবাই।

দেখা যাক দেবীদর্শন ঘটে কতক্ষণে। পা ছড়িয়ে বসে পড়ি বারান্দার শীতল মেঝেতে। রাধাদাসী আছে সঙ্গে, গল্প জুড়ি তার সাথে।

রাধাদাসী বলে, 'নাম ছিল আগে আমার হরিদাসী। ঐ নিত্যগোপাল মহান্তের মার নামও হরিদাসী। সে বলে, ওই নামে তোকে ডাকি কী করে? আজ হতে তুই হলি রাধাদাসী। সেই অবধি এই নামই আমার। কত বছর হয়ে গেল এসেছি এখানে। মুর্শিদাবাদ জেলায় আমার বাড়ি। বিধবা হয়ে বৃন্দাবনে এলাম গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তীর্থ করতে। পাণ্ডা আমাদের তুলল মহান্তের বাড়িতে। দু মাসের জন্য এসেছিলাম সবাই। মহান্তের মা বললে, ফিরে আর যাবে কেন তুমি; এখানেই থাকো, আমার ছেলের সেবা করো। গাঁয়ের লোক গাঁয়ে ফিরে গেল; আমি রয়ে গেলাম। মহান্তের মা মরে গেছে, তাও আজ পাঁচ-ছ বছর হল।'

'বলি, বাঙালি তো তুমি। তবে হিন্দুস্থানিদের মতো সেজে থাক কেন?'

সে বললে, 'মহান্তের দেশী লোকেই যে ও-পাড়াটা ভরতি। তার মধ্যে আমার আলাদা ভাবে সেজে থাকতে কেমন লাগে; পড়শিরা নিন্দে করে। এই তো হাতে এখন সোনার পাতের রুলি পরেছি দুটো; অন্য সময়ে এও পরি না। গোছা গোছা

কাঁচের চুড়িই পরে থাকি। তাই ওদের রেওয়াজ। কিন্তু কিছুদিন হল দেশ হতে আমার ননদ এসেছে এখানে তীর্থ করতে; অন্য জায়গাতেই আছে অবশ্য। তাই কাঁচের চুড়ি খুলে তাড়াতাড়ি এই দুটো হাতে দিলাম।'

'কেন?'

'মাঝে মাঝে পথে ঘাটে দেখা হয় ননদের সঙ্গে—লজ্জা লাগে।' ব'লে রাধাদাসী হেসে মুখ নিচু করে।

এতক্ষণে পুজারী এসে মন্দিরের কপাট খোলে। অষ্টভুজা সিংহবাহিনী অসুর-মর্দিনীর মূর্তি।

বড়দি বললেন, 'কাত্যায়নী মহাশক্তি। গোপীরা কৃষ্ণ-আরাধনার শক্তি পেল কোত্থেকে? কাত্যায়নীর কাছ হতেই। রাধা ও গোপীরা আগে কাত্যায়নীর আরাধনা করে শক্তি নিয়ে তবে কৃষ্ণ-আরাধনায় কৃষ্ণকে পান। ভাগবতে আছে গোপীদের মন্ত্র—

'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥'

আগে-পরেই সময় ক্ষয়; দর্শনে আর কতক্ষণ লাগে? আবার হাঁটা ধরি।

পথে পড়ল চৌষট্টি মহান্তের সমাজ। গুরুবর্গ, অষ্ট প্রধান মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, ছয় চক্রবর্তী, অষ্ট গোস্বামী, অষ্ট কবিরাজ, আচার্য, প্রভু এইসকল চৌষট্টি মহান্তের যেখানে যেখানে সমাধি আছে সেই সেই স্থানের ধূলি এনে এক জায়গায় এই সমাধি-সমাজ হয়েছে। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ঘেরা আঙিনায় ছোটো ছোটো স্মৃতিফলকে নামধাম লেখা—জয়দেব-পদ্মাবতী, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি, জগাই-মাধাই, নরোত্তম ঠাকুর, কর্ণপুর, শ্রীবাস, রূপ-সনাতন, কেশব-ভারতী। বড়দি নাম পড়েন, আর 'আহা, একবার স্পর্শ করি' ব'লে হাত বাড়ান।

কয়েকজন বৈষ্ণব বসেছিলেন সেখানে, সেবায়েত বোধ হয়; বললেন, 'না না; বাঁধানো পথ ছেড়ে কাঁচা মাটিতে পা দিয়ো না। ওখানে পা দেওয়া মানে, তাঁদের গায়ে পদধূলি দেওয়া।'

গেরুয়াপরা দুই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী নেমে পড়েছিল বলবার আগেই। সেবায়েতরা তাদের ডেকে বললেন, 'শোনো তো দেখি; তুমি তো বৈষ্ণব দেখতে পাই। নিজে নিজেই গেরুয়া নিয়েছ নাকি যে নিয়ম জান না?'

লোকটা কুঁচুমাচু করে।

'আপাপন্থী নিশ্চয়ই!'

দাদা বললেন, 'মানে?'

বললাম, 'মনে নেই রামময় মহারাজের কথা? তিনি বলেছিলেন, সাধু হতে হলেই তাকে কোনো-এক সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে; নামের পরে তা যুক্ত থাকে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী, কেবল স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বললে চলবে না, বলতে হবে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পুরী, বা গিরি, বন, ভারতী ঐসবের একটা-কিছু। তা নইলেই তারা টিট্‌কারি দেবে—"বেটা আপাপন্থী"; মানে আপনা-আপনিই সাধু হয়েছে। আমাদের সাধুদের মধ্যে বড়ো কড়া নিয়মকানুন। এই-যে আমাদের চুল

দাড়ি, যদি চুল রেখে দাড়ি কামাই সাধুসমাজ নিন্দে করবে। ঐ এক পূর্ণিমার দিনে মানে মাসে একবার, চুলদাড়ি একসঙ্গে কামাব। অন্য জায়গায় অবশ্য এতটা মানি না; কিন্তু এখানে এসব না মেনে উপায় নেই।'

এই তো একটু আগে দেখে গিয়েছিলাম না, চৌরাস্তার মাথায় এক সাধু সর্বাঙ্গে আবির মেখে দুপুর রোদে জোড়া পা আকাশে তুলে স্থির হয়ে আছে? দাদা বলেছিলেন, 'এ হল শীর্ষাসন।' আর এখন দেখি, মাথার উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে বগলের নীচ দিয়ে পা ঢুকিয়ে পিছন দিক দিয়ে নিয়ে মাথার তালুর উপর চাপিয়েছে।

'এ আবার কি?'

'এ পাদস্কন্ধ-আসন।'

যাত্রীরা যেতে-আসতে একটা দুটো পয়সা ছুঁড়ে ফেলছে সামনে-পাতা গামছাখানার উপর। এক বৃদ্ধা একটা দু-আনি রেখে আটটা পয়সা ভাঙিয়ে নিল সেখান হতে।

'রাধে গোপাল নিতাই গৌর' গাইতে গাইতে চলেছে বৈষ্ণব, জপের থলিতে আঙুল ঢুকিয়ে। এখানে সকলের মুখেই 'রাধাশ্যাম' নাম। টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়া হাঁকায়—'রাধে রাধে'; ভাড়ার পয়সা হাতে পেয়ে সেলাম জানায়—'জয় রাধে;' পথিক কুশল শুধোয়—'রাধে কৃষ্ণ'; দোকানি জিনিস দিয়ে বলে—'রাধারানী'; ভিক্ষে না পেয়ে ভিখিরি গালাগালি করে—'রাধেশ্যাম শ্রীহরি'।

নানা দেবদেবীর রঙিন ছবির দোকানে এসে দাঁড়ান বড়দি। মা-গঙ্গার ছবি একখানা কিনেছেন হরিদ্বারে; সিনেমার শিব বসে আছেন চক্ষু বুজে; উষাবালার মতো গঙ্গা হাসতে হাসতে এসে পড়ছেন শিবের মাথার উপরে। এমনি রাধাকৃষ্ণের পছন্দসই একখানা ছবি পান যদি তো বাঁধিয়ে রাখেন ঘরে। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে সব দেবদেবীকেই দর্শন করে দিন আরম্ভ করা যায়। বলেন, 'নয়তো আর কি সময় মেলে সারা দিনমানে?'

দেবদেবীর ছবির ফাঁকে ফাঁকে নেহরু প্যাটেল গান্ধী সুভাষের ছবি। বলি, 'এগুলি কেন এখানে?' দোকানি প্রায় ধমকে ওঠে, 'উসব নেতা লোক হ্যায়।'

মণিবাহাদুরের সঙ্গে দেখা পথে। আজই সকালে কত খুঁজেছি তাঁকে। শুনেছি, তাঁরাও এসে আছেন এখানে; কিন্তু কোথায় জানি নে। পাণ্ডাদের কাছে খোঁজ নিতে নিতে যদি-বা তাঁদের বাড়ি পেলাম, কিন্তু তাঁরা তখন বাইরে বেরিয়ে গেছেন।

বড়দি বললেন, 'কুইট ইণ্ডিয়া করলে কী হবে! আজ তো আপনার পরিচয় দিলাম—সাহেবের মতো দেখতে, তবে তো পাণ্ডা বুঝলে, বাড়ি দেখিয়ে দিলে।'

মণিবাহাদুরের হাতে মাটির খুরিতে পাতা-ঢাকা মালাই। বললেন, 'ক্ষীর নয়, সন্দেশ নয়, যমুনা-পুলিনের ঘাস-খাওয়া গোরুর দুধের মালাই। পৃথিবীতে এমন জিনিস আর নেই। খান নি? খেয়ে দেখুন। বৃন্দাবনে এসে আগে মালাই খেতে হয়। কেবল ভক্তিরসে চলে না, পার্থিব রসও চাই। একা কৃষ্ণ কী করতেন যদি না অর্জুন থাকতেন। গীতাই হত না।—তা যাচ্ছেন কোথায় আপনারা?'

বলি, 'ফৌজদার-কুঞ্জে। শুনেছি রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন সেখানে।'

'চল্‌ন, আমিও যাই। ওখানকার মহান্তের সঙ্গে আলাপ আছে আমার, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যে ওখানে ছিলেন তা তো বলে নি কেউ।' ব'লে মণিবাহাদ্‌রও সঙ্গে চলেন। বলেন, 'পাণ্ডাদের এবার বড়ো দ্‌ঃখ। যাত্রীর ভিড় হয় নি মোটে। তারা বলে, বেশির ভাগ যাত্রী আসত প্‌র্ববঙ্গ হতে ; ধর্ম জাগিয়ে রেখেছে তারাই। আমরা তো উপর-পালিশ মাত্র!'

মণিবাহাদ্‌রের সঙ্গে পথ চলতে বড়ো আরাম। গল্পে গল্পে মাতিয়ে রাখেন। বলেন, 'ভর্তৃহরির গল্প জানেন তো? সাধ্‌ ফল দিয়েছিল, বলেছিল, তোমার যে একান্ত প্রিয় তাকে দিয়ো। সেই ফল হাত ঘ্‌রতে লাগল—একজন তার প্রিয়জনকে দেয়, সে আবার তার প্রিয়জনকে দেয় ; চলল এইভাবে। কেউ আর উল্টে দাতাকে দেয় না। ভালোবাসা দানই করা যায়, ফিরে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবরা রাধাভাবে সাধনা করে ; ভালোবাসায় যে আত্মত্যাগ তা মেয়েদের কাছেই তাদের শেখা।'

বলি, 'আমরা তো যাচ্ছি আবার হরিদ্বারে ফিরে : আপনি যাবেন না?'

তিনি বললেন, 'ওরে বাস্‌ ; জ্ঞান দিয়ে ময়লা ধ্‌য়ে ভক্তিজলে ডুব দিয়েছি হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবনে এসে। আর কি নষ্ট করি তা আবার সেখানে ফিরে গিয়ে?' ব'লে হাসতে লাগলেন। বললেন, 'আমার বন্ধ্‌ বাঁকেবিহারী পাঞ্জাবি, বৈষ্ণব হয়ে এই নাম নিয়েছে। মীরাবাঈর জীবনী ও ভর্তৃহরির গান নিয়ে দ্‌খানা প্রসিদ্ধ বই লিখেছে। ছ বছর মৌনী থেকে সম্প্রতি মৌন ভেঙে এখন কীর্তন নিয়ে মেতে আছে। সে বলে, আনন্দময়ী-মার কাছে যেয়ো না, দ্‌র থেকে নমস্কার কোরো। শক্তি বড়ো জোরালো, ভক্তি নরম। বেশি কাছে গেলে তোমার মধ্যে শক্তি ঢ্‌কে যাবে।'

ফৌজদার-কুঞ্জে এসে পড়েছি। দোতলার যে ঘরে রামকৃষ্ণদেব ছিলেন সে ঘর তালা-বন্ধ। ফাঁক দিয়ে দেখি, বিছানা বাক্সে ভরা মেঝে ; বোধ হয় ভাড়া দেওয়া হয়েছে কোনো যাত্রীকে।

দাদা বললেন মহান্তকে, 'তিনি যে এখানে ছিলেন এ কথা জানে না অনেকেই। বরং ঠাকুরের একখানা চিত্রপট এই ঘরে রেখে বাইরের ফটকে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিন, দেখবেন যাত্রীদের ভাড়া দেওয়ার চেয়ে বেশি দক্ষিণা মিলবে আপনার।'

মহান্ত বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, তাই করব। এই তো কিছ্‌দিন আগে দ্‌ই মেমসাহেব খ্‌ঁজতে খ্‌ঁজতে এখানে এসে ঘরের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে গেল।'

বড়দি বলেন, 'একেই বলে উকিলের ব্‌দ্ধি।'

সেখান থেকে গেলাম সওয়া-মোন শালগ্রামের মন্দিরে। এতবড়ো শালগ্রাম-শিলা দেখা যায় না সচরাচর। নেপাল রাজ্যে গণ্ডকী নদীতেই মেলে খালি এই শিলা। সাধ্‌সন্ন্যাসীরা সেখান থেকেই নিয়ে আসেন। বিশেষ ধরনের পাথর ; বজ্রকীট থাকে শিলাতে, চন্দ্রাদেবীর শাপে।

এবার এলাম আমলিতলায়। অতিবৃহৎ স্‌প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ। এই বৃক্ষের নীচে বসে মহাপ্রভু জপ করতেন। মথ্‌রায় থাকতেন ; লোকের ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নাম-সংকীর্তন করতে পারতেন না, চলে আসতেন এখানে। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত নামগান করে অক্র্‌র-ঘাটে গিয়ে ভিক্ষে করতেন। যে কদিন ছিলেন এইভাবেই কাটাতেন। এক-

দিন মহাপ্রভু বসে নামকীর্তন করছেন। যুবক রাজপুত্র কৃষ্ণদাস যাচ্ছিলেন যমুনার পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে। মহাপ্রভুকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। এঁকেই যে তিনি গতরাত্রে স্বপ্নে দেখে বেরিয়ে পড়েছেন!

গাছের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সেই দৃশ্য দেখি মনে। কত ধনী দরিদ্র উদ্ধার পেয়ে গেল তাঁর করুণায়।

এর পর আসি রাধা-দামোদরের কাছে। এখানে আছেন রূপের গিরিগোবর্ধন।

রূপ প্রতিদিন সকালে চোদ্দ মাইল গোবর্ধন গিরিরাজ পরিক্রমা করে মুখে জল দিতেন। বৃদ্ধ হলেন, তবু রূপ নিয়ম ছাড়েন না। একদিন রাত্রে গোবিন্দ তাকে বললেন, 'রূপ, তুমি এত কষ্ট কোরো না, আমার পদচিহ্ন নাও ; তা চার বার পরিক্রমা করলেই তোমার গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা হবে।' ব'লে তিনি একটি পাথরের নির্দেশ দিলেন। পরদিন সেখানে গিয়ে রূপ সেই পদচিহ্ন নিয়ে আসেন।

কার্তিক মাসে পদচিহ্ন জনসাধারণকে দেখানো হয় ; অন্য সময়ে ভেট লাগে।

ভেট দিতে, পূজারী যমুনার জলে দোরগোড়া মুছে দু হাতে ধরে পদচিহ্নসমেত একটি জলচৌকি এনে সেখানে রাখলেন।

কালো পাথরের গায়ে প্রমাণের চেয়েও বড়ো মাপের ডান পায়ের ছাপ ; পাশে গোরুর খুরের দাগ।

পূজারী বললেন, 'এই হল ধবলীর পা ; ধবলীর গায়ে হেলান দিয়ে এইভাবে কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়েছিলেন।' ব'লে ডান পায়ে ভর দিয়ে পূজারী ভঙ্গি দেখালেন।

বেশ গভীর গর্ত, গোড়ালির দিকে চাপ বেশি—স্পষ্ট সে ছাপ।

শুনি, কৃষ্ণের মুরলীবাদনে পাষাণ গলে গিয়েছিল। তাই যদি হয় তো সেই গলা পাথরে পায়ের ছাপ পড়া আশ্চর্য কী? কিংবা কাদামাটিতে পায়ের ছাপ কালে কালে ফসিলে দাঁড়িয়েছে। সে যাই হোক, যে পরম ভক্ত রূপ এতে 'কৃষ্ণপদ' পেয়ে গেলেন, যে পদচিহ্ন তাঁর মতো ভক্তের পূজা পেয়েছে—নরুনে-কাটা হলেও তা দর্শনে স্পর্শনে পুণ্য।

পূজারী বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ; বললেন, 'আপনারাই ধন্য। আমি হতভাগ্য এত কাছে থেকেও রসের আস্বাদ পেলাম না আজ অবধি।'

বড়দি বললেন, 'কী, পরিক্রমা করবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। এত সহজে গিরিগোবর্ধন পরিক্রমার ফল ছাড়তে আছে?'

পূজারী বললেন, 'ও-পাশের নিমগাছতলা দিয়ে বারান্দা ঘেঁষে মন্দির ডাইনে রেখে পরিক্রমা করুন।'

সন্ধের ঘোর লেগে গেছে। টর্চ জ্বালিয়ে সেই আলোতে পথ দেখে চলি। মন্দিরের এক পাশের আঙিনায় জীব গোঁসাই আর জন-কয়েক ভক্তের সমাধি ; অন্য পাশে রূপের ভজনকুটির সমাধিমন্দির। বৈষ্ণবরা এসে রূপের ভজনকুটিরের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে।

চার বারের বার পরিক্রমা শেষ করে আঙিনার মাঝে এসে দাঁড়াই। জ্বল্ জ্বল্ করে শুকতারাটি ঝির্‌ঝিরে গাছের ফাঁকে।

এখন নন্দ-যশোদার মন্দির। ঘটি বাটি ভরা দুধ ঢেলে দিয়ে যায় ব্রজের মেয়েরা ; বলে, 'গোপাল ধেনু চরিয়ে মাঠ থেকে ফিরে এসে খাবে যে।'

হাজার হাজার বেতের ছড়ি জমেছে কোনায়।

শুধোই, 'এগুলো কী?'

পুজারী হিসাব লিখছিলেন খেরো-বাঁধানো লম্বা খাতায়, বোধ হয় মা-যশোদার সংসার-খরচের। বললেন, 'জগন্নাথ থেকে যাত্রীরা ফিরে এসে এই এক-এক গাছি ছড়ি এখানে নন্দ-যশোদাকে জিম্মে দিয়ে যায়। এ হল সাক্ষী। নইলে তীর্থ-যাত্রা পূর্ণ হয় না। আর কেদারবদরী-ফেরত তীর্থযাত্রীরা জমা দেয় লোহার বালা।'

দেখি, লক্ষ লক্ষ লোহার বালা পড়ে আছে যশোদার সামনে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে এগুলি যমুনায় বিসর্জন দেয়।

বড়দি বললেন, 'ভেবে দেখো, কত লোক যায়-আসে তবে ফি বছরে।'

আর কাকে দেখা বাকি রইল? শাহ্‌জির মন্দির। এই মন্দির দেখতেই তো ছুটে ছুটে লোক আসে। একবার চোখের দেখা না দেখে গেলে যে আফসোস থেকে যাবে। 'শাহ্‌জির মন্দির' 'শাহ্‌জির মন্দির'—রব শুনছি এসে অবধি।

বড়দি বললেন, 'চলো তবে পা চালিয়ে। শেষ করে ফেলি। অল্পের জন্যে খুঁত থাকবে কেন?'

আগাগোড়া শ্বেতপাথরের বিরাট মন্দির। দিল্লীর ফ্যাশানে বাগান ফোয়ারা। ছাদের উপরে এখানে ওখানে পাথরের মর্মরমূর্তি। শৌখিন বড়োলোকের বাগান-বাড়ি আর টাকা-ঢালা মন্দিরের বিচিত্র সমাবেশ।

হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভজন গাইছে ছোকরার দল এক ধারে। সিঁড়ির মাথায় চওড়া চাতাল শ্বেতপাথরের; পরিচয়-লেখা এম্‌বস্‌ড্‌ মূর্তি পাতা। যাত্রীরা ঠাকুর দেখতে যেতে-আসতে মাড়িয়ে চলে তাদের। সকলের পদধূলি গায়ে মেখে পড়ে আছেন কুন্দলাল সাহা স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে।

প্রকাণ্ড 'হল'। চার দিকের দেয়ালেও রঙিন পাথরের এম্‌বস্‌ড্‌ নারী-পুরুষের মূর্তি, নানা রঙ ভঙ্গির বাহার দেখায়। ঘুরে ঘুরে তাদের দেখি, দেখি মেঝের নকশা, ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর ঝিলিক, দেখি বিজলিবাতির জ্যোতি। সব শেষে এসে দেখি এক পাশে রেলিঙ-ঘেরা আটকে-রাখা রাধাকৃষ্ণের ছোট্ট বিগ্রহমূর্তি।

অবাক হই। এত বিচিত্র ঐশ্বর্যের মাঝে কে ওখানে দাঁড়িয়ে ময়লা ছেঁড়া কাপড় প'রে?

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই কাছে।

ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে একটি, অতি সন্তর্পণে ক্ষুদ্র টিনের আয়নাটি হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখছে, উল্টো পিঠে কাগজে-সাঁটা রাধাকৃষ্ণের ছবির সঙ্গে বিগ্রহমূর্তি।

বলি, 'মিলল দুইয়ে?'

তৃপ্তির হাসি হেসে সে মুখ তুলে ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ।

ফিরতি পথে দেখা এক সাধুর সঙ্গে। দেখেই চিনেছি। কাছে এসে তিনি শুধোলেন, 'আর কদিন আছ এখানে?'

বলি, 'যাবার সময় হয়ে এল এবার।'

বড়দি বললেন, 'কারা এ'রা? কজনাকেই তো দেখলাম, যেচে এসে কথা বললেন। চেন নাকি?'

চলতে চলতে বলি, 'এ'রা আমার যমুনাপারের নাগা বন্ধু। সেই একদিনেরই চেনা।'

মাটির দেয়ালের গা-ভরা কাঁটাগাছের ফুল আজ আলো করে রেখেছে সেবা-শ্রমের গলিটুকু। বাসন্তী রঙের ফুল, পাতলা ফিন্‌ফিনে পাপড়ি, যেন এক ঝাঁক হলুদ প্রজাপতি, ডানা কাঁপছে থরো থরো, গুটি থেকে প্রথম বেরিয়ে।

মথুরায় এসেছি।

টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টির বিরাম নেই।

যমুনার তীরে 'বাঙালি ঘাট'। উ'চু বাঁধানো সি'ড়ির দু পাশে থামের উপর ছাদ-বসানো চারদিক-খোলা ঘর, জলের উপর অনেকটা এগিয়ে আসা। তারই একটাতে বসে আছি ধার ঘে'ষে। আজ আর কোথাও যাওয়া নয়। বহুদিন পরে যেন বিশ্রাম পেয়েছি, যেন স্থির হয়েছি খানিক। এ কদিন কেবল চলেছি, কেবল দেখেছি। বেশি দেখারও ক্লান্তি আছে একটা।

নীচের জলের দিকে তাকিয়ে ভাবছি কত কথা।

ঝাপ্‌সা আকাশের বৃষ্টির ধারা যেন পর্দা ফেলে আড়াল করে রেখেছে আমায় সব-কিছু হতে। নিশ্চিন্তে এখন নিজেকে খুলে ধরতে পারি সামনে। বহুব্যস্ত-তার চাপে ক্বচিৎ-পাওয়া এই ফাঁকটুকুরই অপেক্ষায় থাকে মন।

যমুনার জলে সর্বত্রই কী কাছিম ভরা! গায়ে শেওলা পড়ে গেছে এক-একটার। দু জাতের কাছিম বোধ হয়। এক দলের রঙ যেন হল্‌দেটে সবুজ।

ঘাটের পাড়ে পান্ডার আস্তানা। সাইনবোর্ড ঝুলছে দরজায়— কানে লাড়ু সাড়ে-আট ভাই—'Ladoo in ear 8½ Brothers'। গাঁট্টাগোট্টা কতকগুলি ষণ্ডামার্কা পান্ডা বসে আছে ঘরে মহাজনি চালে মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পাশে বটকৃষ্ণ পালের ধর্মশালা। একদল বাঙালী তীর্থযাত্রিণী এনে ছেড়ে দিয়ে পান্ডা ঘাটে-বসা নাপিতের কাছে গাল বাড়িয়ে দিল নগদ পয়সা ফেলে। যেন গোরুর পালকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে আরাম করতে বসল নিশ্চিন্ত হয়ে।

বটগাছের তলায় যাত্রিণীরা নিজ নিজ পোঁটলা-পু'টলি খুলে পিতলের মালসাতে দুটি চাল ডাল ও একটা আলু ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে গোটা-কয়েক ভাঙা পাথরের উনুন সাজিয়ে, চার পয়সার কাঠকাঠি জেবলে, কেউ ভাগে, কেউ-বা আলাদা। অল্পবয়সী সধবা বউ একটি এসেছে পিস্‌শাশুড়ির সঙ্গে কুমিল্লা হতে। বোঁচ্‌কায় ঠেস দিয়ে বসে সে গাল-ভরা পান চিবোচ্ছে; তেলেভাজা কচুরি ফুলুরি খেয়েছে পেট ভরে, ভাতের হাঙ্গামা নেই আজকের মতো। পাশে ঐ বয়সীই রুক্ষ বিধবা মেয়েটি বারে বারে নিজের ছে'ড়া কাপড়ের পু'টলিটা খুলছে আর বাঁধছে; কিসের কী এক অসন্তুষ্টি যেন মনে।

দেড় মাস হল এরা বেরিয়েছে। গাঁ হতে। অনেক ঘুরেছে, আরও ঘুরবে—যাবে গিরিগোবর্ধনে। আজকের এই বিকেলটুকুতেই যা বিশ্রাম, কাল আবার তল্পিতল্পা কাঁখে নিয়ে শুরু করবে পথ চলতে। দলের মধ্যে থুরথুরে বুড়ি কতজনা। এত শক্তি এরা পায় কিসের জোরে? ঘুম নেই, খাওয়া নেই; তিন-চার দিন পরে হয়তো একদিন সময় পায় রান্না করতে। নয়তো পুঁটলি হতে মুড়ি চিঁড়া বের করে জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিয়ে দিন কাটায়। টাকা পয়সা যা আনে পাণ্ডাই ট্যাঁকে গোঁজে নানা ছলে।

ঘাটে বাসন মাজছিল নেড়ামাথার এক বুড়ি; দিল লোহার হাতা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে কাছিমটার ঘাড়ে। বাসন ধুতে যাবে, গলা বাড়িয়ে আসে বারে বারে। না মেরে উপায় কী?

ওপারে চিতা জ্বলছে—এক দুই তিন চার। ঐ দূরে আরও দুটো।

বড়দি এসে নিঃশব্দে পাশে বসলেন।

অন্য সময়ে আমাদের কথার থই থাকে না। আজ কোনো কথা নেই। কাছাকাছি দুজনে বসে আছি; দুইয়ের ভাবনা এক হয়ে মিলেছে গিয়ে যেন ঐ দূরে, যেখানে আবছা চিতাটা পেরিয়ে সীমারেখা মিলে গেছে এক ধূসর রঙের আবরণে।

সবুজে রঙের মাঝারি কাছিমটা তিন পায়ে সাঁতার কাটছিল এতক্ষণ; আর-একটা কাছিম নীচে হতে এক গুঁতো মেরে উল্টে ফেলল তাকে। সত্যিই, ডান দিকের পিছনের পা'টা নেই তো ঠিকই। ছেলেবেলায় কেটে নিয়েছে হয়তো কিছুতে।

দাদা এলেন পাণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, 'বৃষ্টি একটু ধরেছে মনে হচ্ছে; চলো মথুরানাথকে দর্শন করে আসি।'

যমুনার পাড় ধরে বাঁধানো রাস্তা—দোকান পাট বাজার বসতি। দেখে মনে হয়, এটা কিনি, ওটা কিনি। হাতে আঁকা দেবদেবীর ছবিই বা কত। আর, নরুনে-কাটা সাদা কাগজের গোয়ালিনী দুধ মাথায় নিয়ে চলেছে, হরিণ পিঠ চুলকোচ্ছে, ময়ূর পেখম খুলে বাহার দেখাচ্ছে—দু আনা, চার আনা, আট আনায় মাত্র।

ক্ষীর-ভরা মোটা সরের পাটিসাপটা। সের হিসেবে নাও, পোয়া হিসেবে নাও—কত সস্তা!

ডেকচি হাতা খুন্তি বাটি উনুন-ভরা পিতলের বালতি; এই একটি বালতি সঙ্গে থাকলে রান্নার সরঞ্জামের ভাবনা থাকে না বাইরে বেরিয়ে। কত সুবিধে!

বরফের চাঁইয়ের উপর পেতে-রাখা পান সেজে দেয় তখন-তখনই দোকানি। সেই ঠাণ্ডা পানের স্বাদই আলাদা।

পাণ্ডা হাঁকে, 'আবার বৃষ্টি আসছে, জোরসে হাঁটো।'

পাণ্ডার কাজ মন্দির দেখিয়ে ছেড়ে দেওয়া। দু পা গিয়ে গিয়েই ফিরে দাঁড়ায়; ভালো লাগে না তার।

মথুরানাথের দুয়ার বন্ধ; খুলবে এখনই। নাটমন্দিরে উঠে দাঁড়াই সবাই লোকের মাথা ঠেলে।

একটু পরেই দুয়ার খুলল।

মন্দিরের কপাট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা চাপ অনুভব করলাম চার

পাশ হতে। বড়দির জন্য ভয়, পাতলা মানুষ। ডান হাতে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরতেই তিনি কেমন মাটি হতে আল্‌গা হয়ে শূন্যে উঠে রইলেন। পা রাখার জায়গা নেই, অন্য পা এসে দখল করে নিয়েছে। তার পরই কী যে হল মুহূর্তে, দেখি আমরা দোল খাচ্ছি সবাই মিলে। একবার হুড়্ হুড়্ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। পরমুহূর্তেই এক ধাক্কায় নীচে গিয়ে সিঁড়িতে গড়াচ্ছি ; সেইরকম গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া অবস্থায়ই সবাইকে তুলে কে আবার ঠেলে দিল বাঁয়ে, বাঁ থেকে ঈশান কোণে : ঈশান থেকে এক দোলা খেয়ে নৈঋতে আসি, সেখান হতে পলকে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি। ভূমিকম্পে তোলপাড় হচ্ছে যেন সব। গা এলিয়ে ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে। এ বড়ো মজা। হেসে লুটোপুটি খাই আমি, বড়দি, দু হাতে আমার গলা-জাপটে-ধরা দক্ষিণী বউ, দোল খেতে খেতে। তীর্থে বেরিয়ে অবধি অনেক রকম ভিড়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু এ একেবারে নতুন। হাসতে হাসতে এক সময়ে এসে ছিট্‌কে পড়ি বাইরে। তাড়াতাড়ি দু হাতে মোটা থামটা আঁকড়ে ধরি, বড়দি ধরেন আমাকে। হাসি শেষ হলে চোখের জল মুছে নিশ্বাস টেনে সুস্থির হই।

বড়দি বললেন, 'রাজদর্শনই বটে! হবে না এমন? রাখাল বেটা রাজা হয়েছেন—চালই আলাদা।'

'কিন্তু বড়দি, কই, মথুরানাথকে তো দেখা হল না আমার।'

'ঐ হয়েছে ; এসেছ, সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছ, আবার কী! দর্শন হয়ে গেছে।' ব'লে বড়দি বাইরে যাবার পথ দেখেন।

মথুরার শহর ছাড়িয়ে খানিক দূরে কেশবদেবের প্রাচীন মন্দির, ঔরঙ্গজেব সেটাকে মসজিদ করেন। তার পাশে ছোটো মন্দিরে পরে কেশবদেব এসে প্রতিষ্ঠিত হন।

কাছেই কংসের কারাগার, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। রেলিঙ-ঘেরা খুপ্‌রি একখানা : বন্দী পিতামাতার জাজ্বল্য প্রমাণ। দরজায়, দেয়ালের গায়ে অসংখ্য গোবরের ফোঁটা। সিন্দূরের ফোঁটা দেয় জানি পূজাপার্বণে ; কিন্তু গোবরের ফোঁটা দিতে দেখি নি কখনো। পাণ্ডা বললে, 'অপুত্রবতীরা এখানে মানত করে পুত্রবতী হয় ; ছেলে কোলে নিয়ে এসে পুজো দিয়ে যায়, গোবরের টিপ পরায়। দেখো-না, কতজনা পুত্র পেয়েছে এখানে পুজো দিয়ে। গুনে শেষ করতে পারবে না ফোঁটা।'

কারাগারের কাছেই পুত্রকুণ্ড। বড়দি হাঁকেন, 'শোনো শোনো, শিগ্‌গির এসো। নাও, এবার হাতেনাতে প্রমাণ। অনিল তো বিশ্বাস করে না কিছু, কৃষ্ণ বলে কেউ যে ছিলেন এককালে, মানতেই চায় না। কত ব্যঙ্গ করল আমায় সেদিন। ফিরে গিয়ে বলতে পারব, কৃষ্ণের মা আঁতুড়ঘরের কাঁথা কাপড় ধুতেন যে জলে সেই পুত্রকুণ্ড দেখে এলাম এবার। কী পাণ্ডাঠাকুর, তাই বললে না?'

উৎসাহে পাণ্ডা ঘাড় ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—কৃষ্ণের ময়লা কাঁথা ধোওয়া হত এই-খানে। ছোটো ছেলে তো, মিনিটে মিনিটে নষ্ট করে দিত।'

ধ্রুবঘাটে এলাম। রামকৃষ্ণদেব মথুরায় এসে এই ঘাটে ব'সে, বাসুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছেন, দেখতে পেয়েছিলেন।

যমুনার অন্য ঘাটের তুলনায় এ ঘাট অনেক নিরিবিলি, শান্তিমাখা। এসেই ঝট্ করে উঠে যেতে মন সরে না।

বিশ্রাম ঘাট। কৃষ্ণ বলরাম বিশ্রাম নিয়েছিলেন এখানে, অসুর নিধন ক'রে।

আরতি হয় রোজ সন্ধেয় যমুনাঘাটে। গঙ্গার আরতি দেখেছি ; যমুনারটাও দেখি, এসেছি যখন।

ছুটতে ছুটতে এলাম, দেরি হয়ে যায় বা ভেবে। ঘাটে এত লোকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে কতটুকু দেখব? লোক নিয়ে নিয়ে নৌকো চলেছে মাঝ-যমুনায়। পাণ্ডা বললে, 'ওখান থেকে ওরা আরতি দেখবে।'

আমরাও যাই না কেন তবে?

দেখাদেখি দল বেঁধে নৌকোতে চেপে বসলাম। নৌকো তীর ছাড়ল।

এতক্ষণে রূপ খুলল যমুনাঘাটের, মথুরানগরীর। উঁচুনিচু প্রাসাদ, বাড়ি; মন্দিরের চুড়ো, স্নানের ঘাট। কোনোটাতে লেগেছে সূর্যাস্তের আভা, কোনোটাতে পড়েছে বেলাশেষের ঘন ছায়া। সব মিলিয়ে যেন স্বপ্নপুরীর মায়া।

যমুনাঘাটের উপর উঁচু বেদী, তার উপরে নীল রঙের বেনারসি পরে এক গৌরবর্ণ সুদর্শন যুবক পূজারী উঠে দাঁড়াল। চওড়া বুক, সরু কোমর—সুঠাম গঠন।

নীচ হতে দু'জনে ধ'রে কাঁসার ভারী আরতিপ্রদীপ তুলে দিল তার হাতে। ঘিয়ে ভেজানো পলতের শিখা জ্বলে ওঠে হাওয়া লেগে, থাক্ থাক্ প্রদীপের গায়ে। পূজারী ধীর হতে দ্রুত হাত নাড়ে শূন্যে বৃত্তাকারে। সন্ধের অন্ধকারে আরতির আলো উদ্দাম নেচে চলে সব-কিছু ছাপিয়ে।

অপরূপ এ রূপ।

বড়দি বললেন, 'চলো, তাড়াতাড়ি পাড়ে যাই। আরতির অগ্নি স্পর্শ করতে হবে।'

মনে হল, স্পর্শ যদি করতে হয়, তবে ঐ পূজারীর হাত থেকেই।

ঠেলতে ঠেলতে বড়দিকে নিয়ে উপস্থিত হই সেখানে। প্রদীপ হাতে বেদী থেকে নেমে নীচে দাঁড়িয়েছে পূজারী সবে ; হাত বাড়িয়ে সে অগ্নি স্পর্শ করি। সে সেই প্রকাণ্ড প্রদীপ দু হাতে ধরে সযত্নে নামিয়ে রাখল বেদীতে ; ভিড় ভেঙে পড়ল তার উপরে। পূজারী চলল মন্দিরের দিকে, দর্ দর্ করে ঘাম ঝরছে তার বুক পিঠ বেয়ে।

সৌন্দর্য কি কেবল মনের খুশির জন্যেই? তা নয়। গাম্ভীর্যও আনে কত!

আগ্রা হোটেলে ফিরে আসি। বাঙালিঘাটে সেই যাত্রিণীরা ঝিমোচ্ছে যে যার পুঁটলিতে মাথা গুঁজে। 'কানে লাড়ু সাড়ে-আট ভাই'এর বৈঠকখানার সামনে পাতা বড়ো শিল-নোড়াটায় সিদ্ধি বাটা হচ্ছে। গুণ্ডামতো এক পাণ্ডা কাঁসার ঘটি সামনে নিয়ে 'রামহনুমান'এর গানের শেষে একটা করে 'হো' ডাক ছাড়ছে পাড়া কাঁপিয়ে আর গায়ের জোরে সিদ্ধি ঘুঁটছে। কুমিল্লার বউটি আদুরে আদুরে ভাব নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে হেলে দুলে কথা কইছে।

বটগাছের তলায় এক কোনায় আবছা আলোতে একলা বসে সেই রুক্ষ বিধবা মেয়েটি পোঁটলা খুলে একমনে কী দেখছে। একজোড়া গোলাপি রঙের সাটিনের

নিকার-বোকার ; হয়তো আজই দুপুরে কিনেছে বাজার থেকে, দেশে-রেখে-আসা দু বছরের ভাইপোটির জন্য।

চলেছি গিরিগোবর্ধনে টাঙ্গাতে। বেশ দূরের পথ। দু পাশে সোনালি গমখেত। ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে, উড়ছে। পাকুড় গাছটির কোটরে টিয়ার বাসা ; একটি টিয়া লাল ঠোঁট বের করে বসে আছে—বোধ হয় মা। ভিজে মাটির মাঝখান দিয়ে ঢালা পিচের রাস্তা, বড়ো বড়ো গাছের ছায়া-ফেলা।

বড়দি বললেন, 'দেখো, ভগবানের কী করুণা। বৃষ্টি নেই, বাদল নেই ; কত সুবিধেয় চলেছি আমরা।'

বড়দির ভগবানের করুণার কূলকিনারা পাই না। উঠতে বসতে শুনি তাঁর করুণার মহিমা। এখন বৃষ্টি নেই বলে বলছেন, 'কী করুণা' ; আবার বৃষ্টি হলেও বলতেন, 'বৃষ্টি দিলেন, রোদে তাতে কষ্ট না পাই যেতে ; এ কি তাঁর কম করুণা'!

একদল পাণ্ডা গাড়ির চাকা ধরে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে সঙ্গে। একজন বলে, 'আমি অমুক, গিরিগোবর্ধনে আমাকে পাণ্ডা নিয়ো' ; একজন বলে, 'আমার নাম সবাই জানে, আমার মতো পাণ্ডা পাবে না একটিও' ; একজন বলে, 'আমি হলাম— সাড়ে-চার ভাই, এক ডাকে সবাই বলে—হ্যাঁ, পাণ্ডা বটে।'

বলি, '"সাড়ে-চার ভাই"টা আবার কী? বাঙালিঘাটেও দেখি "সাড়ে-আট ভাই" লেখা।'

একবার যখন কথা বলেছি, তখন আর তাকে না নিয়ে যাই কোথায়? উৎসাহে পাণ্ডা আর সবাইকে কনুইয়ের ধাক্কায় হটিয়ে দিয়ে গাড়ির ভিতরে মুখ বাড়ায় ; বলে, 'সাড়ে-চার ভাই হল—আমরা পাঁচ ভাইয়ের চার ভাই সাদি করেছি, আর এক ভাই এখনো বাকি আছে। সাদি না করা পর্যন্ত কেউ "পুরা" হয় না, "আধা" থেকে যায়।'

দলে দলে চলেছে লোক বেদের দলের মতো জোরু গোরু সংসার সঙ্গে নিয়ে। গোরুর গাড়ির উপরে সরকাঠির দোচালা ছাউনি, ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট খাটিয়া। পথে পথে থেমে দিনে রান্নাবান্না করে, গাছের ছায়ায় খাটিয়া পেতে ছেলে শুইয়ে রাখে। রাতে গোরুর গাড়ির নীচে সেই খাটিয়াতে নিজেরাও ঘুমোয়। চুরাশি ক্রোশ পরিক্রমায় বেরিয়েছে যাত্রীরা। গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে হাঁটে নিজেরা। মাসাবধি চলে এমনি, জল ঝড় মাথায় নিয়ে।

টাঙ্গাওয়ালা বুড়ো মানুষ, ভক্তিমান ; বললে, 'কোথায় কী লীলাস্থলী ছিল কে জানে? খাঁটি আছে কেবল তিনটে জিনিস—যমুনা, গিরিগোবর্ধন, আর ব্রজ-রজঃ। বাদবাকি সব এই চুরাশি ক্রোশের মধ্যে।'

পথে আড়িংগ্রাম। এখানে কৃষ্ণ 'দানী' হয়ে বসেছিলেন, দইয়ের পসরা মাথায় রাধাকে খেয়া পার করে দিতে। অরিষ্টাসুরও বধ করেছিলেন এখানে, তাই গ্রামের এই নাম।

গিরিগোবর্ধনে এসে টাঙ্গা থেকে নেমে নগরের ভিতর ঢুকি। পাণ্ডা আমাদের এনে

দাঁড় করায় এক বাঁধানো দিঘির ধারে। বলে : এক গঙ্গা দেখে এলে, আর এই এক দেখো। এ হল 'মানসগঙ্গা'। কৃষ্ণ বাছুররূপী অসুর বধ করেছিলেন ; রাধা বললেন, হলই বা সে অসুর, বাছুররূপী তো? তাকে বধ করে তোমার গো-বধের পাপ হয়েছে। আগে গঙ্গাতে স্নান করে প্রায়শ্চিত্ত করো, তবে আমাকে ছোঁবে।

কৃষ্ণ বললেন, আমার পাদোদক হতে গঙ্গার জন্ম ; সেই গঙ্গাতে আমি কী করে স্নান করি! আচ্ছা, তবু তোমার কথা আমি রাখব ; বলে কৃষ্ণ মন থেকে এই মানসগঙ্গাকে সৃষ্টি করলেন। বললেন, এই হল শ্রেষ্ঠ গঙ্গা।

রাধা বললেন, তার প্রমাণ কী? অন্য দেবতারাও মানবেন, তবে তো?

কৃষ্ণ অমনি দেবতাদের আহ্বান করলেন। দেবতারা সকলে মানসগঙ্গাতে ছুটে এলেন। এক এক করে দেবতা আসেন আর রাধা জিজ্ঞাসা করেন—

তুমি কে?

আমি ব্রহ্মা।

তুমি কে?

আমি শিব?

তুমি?

'আমি মনসা', 'আমি লক্ষ্মী', 'আমি বরাহ', 'হিরণ্যকশিপু', 'সরস্বতী', 'যমুনা', 'ইন্দ্র'—এইরকম পরিচয় দিতে দিতে যিনি যেখানে ছিলেন এসে পড়লেন। তখন রাধার বিশ্বাস হল ; কৃষ্ণকে বললেন, হ্যাঁ, এইবার তুমি স্নান করতে পার।

চৌষট্টি তীর্থের ফল পাওয়া যায় এই এক মানসগঙ্গাতে স্নান করলে। এগারো মোন ঘিয়ের বাতি জ্বলে কার্তিক মাসে অমাবস্যায়। দুধের ধারা ছোটে এই মোটা হয়ে রামধনুকের মতো, মানসগঙ্গার উপর দিয়ে—কোনোবার এদিক থেকে ওদিক, কোনোবার ওদিক থেকে এদিক ; যেবার যেমন মর্জি ভগবানের। কোথা হতে এত দুধ ওঠে কেউ বলতে পারে না। দুধে দুধে জল সাদা হয়ে যায়।

বলি, 'চৌষট্টি তীর্থের ফল পাবে, ডুব একটা দাও বড়দি।'

জল দেখে বড়দির মতো ভক্তিমতীরও ভাবে আগ্রহ ফোটে না। গুঁড়ি গুঁড়ি সবুজ শেওলাতে ভরতি জল। জলে ভাঙ্ পড়েছে—দিদিমার ভাষায়।

পাণ্ডারা সুবিধে অসুবিধে বুঝে শাস্ত্রমতে সব রকম বিধানই দিতে জানে, পণ্ডিত ব্রাহ্মণের মতো। বললে, 'তা স্নান না করলেও চলে, তবে স্পর্শ করে মাথায় ছোঁয়াতে হবে।'

বড়দিকে নিয়ে পাণ্ডা সিঁড়ি ধরে নেমে যায় নীচে। আমিও গেলাম। পাণ্ডা এক আঁজলা জল তুলে বড়দির হাতে দেয়, 'নাও, এবার মন্ত্র পড়ো।' ব'লে জোরে জোরে অর্ধেক মন্ত্র পড়িয়ে বাকিটা শেষ না করেই খপ্ করে বড়দির জোড়া হাত ধরে ফেলে ; বলে, 'কত দক্ষিণা দেবে বলো আগে।'

এদিকে টস্ টস্ করে গঙ্গা ঝরে পড়ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। গঙ্গাজলেই গঙ্গাতর্পণ করে লোকে। তাড়াতাড়ি মোটা দক্ষিণারই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেন বড়দি। পাণ্ডা তখন খুশি হয়ে হাত ছেড়ে দেয় ; বলে—'আচ্ছা, এবার বলো তবে—

নমো মানসগঙ্গায় নমঃ। হাতের জলটা এবার গঙ্গাকে দিয়ে দাও।'

বড়দি শুকনো অঞ্জলি ফাঁক করে মানসগঙ্গাকে মানসগঙ্গায়ই তর্পণ করে তর্ তর্ করে পাড়ে উঠে আসেন ; বলেন, 'কী ফাঁদে ফেলতে জানে! সাধে কি ভক্তি উবে যায়?'

গিরিগোবর্ধনের মন্দিরে ঢুকেও পুজো দিতে হয় পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে। বোঝাপড়া থাকে হয়তো এদের ; একজন নিয়ে গিয়ে আর-একজনের হাতে ছেড়ে দেয়। এড়িয়ে বের হয়ে আসা দুষ্কর।

দাদা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। বলেন, 'কথা বাড়িয়ে লাভ কী? কষ্ট করে আসা যখন, আর-একটু কষ্ট করা যাক। যা বলে এরা তাতেই রাজি হও।'

যাত্রী বুঝে পুজোর ব্যবস্থা হয়। পাণ্ডা বলে, গিরিগোবর্ধনকে ফুল চন্দন ভোগ বস্ত্র ও পঞ্চরত্ন দিতে হবে।

শুনে আঁতকে উঠি। পঞ্চরত্ন! না জানি কত টাকা ধরেই টানবে।

বলি, 'পঞ্চরত্ন কী কী?'

'এই—সোনা রুপা তামা হীরা চুনি। আমাদের কাছেই আছে, কিনতে যেতে হবে না কোথাও।'

'দাম?'

'জনপ্রতি সোয়া টাকা লাগবে।'

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। পুজার সামগ্রী নিয়ে আসে পাণ্ডা। বসে যাই বড়দি আমি আগে, পুজো দিতে। গিরিগোবর্ধন একখানি শিলা ; শিবের মতোই অনেকটা। তবে, এ যেন মাটি ফুঁড়ে ওঠা, লেপাপোঁছা, চ্যাপ্টা। তারই গায়ে ঠকাঙ করে ঠেকিয়ে শুকনো নারকেল উচ্ছুগ্গু করি ; বাসি জবাফুল ছিটিয়ে বলি, এই গন্ধপুষ্প দিয়ে তোমার পুজো করলাম। শশা কলা দিয়ে রাজভোগ দিলাম ; তেলচিটে শালুর টুকরোয় বস্ত্রদানও হল। আর পঞ্চরত্ন? বালি-কাগজের ছোট্ট একটা মোড়ক হাতে দিয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে পাণ্ডা। 'খুলো না, খুলো না, পড়ে যাবে, হারিয়ে যাবে', ব'লে তাড়াতাড়ি মন্ত্র পড়িয়ে হাত থেকে কেড়ে নেয়। সর্ব উপচারে আমাদের পুজো দেওয়া শেষ হয়।

এবার দাদা ব্রজরমণ বসেন পাশাপাশি। সেই একই ফুল কুড়িয়ে আনে পাণ্ডা গিরিগোবর্ধনের গা হতে। দক্ষিণা দিলেই শুদ্ধ হয়ে যায় সব। সেই একই শালুর টুকরো হাজার জনে হাতে নিয়ে বলে 'এই নববস্ত্র দিয়ে তোমাকে সাজালাম নারায়ণ!'

সব পাণ্ডাকে বিদায় করে হাল্কা হয়ে পথ চলতে চাই। দক্ষিণা পেয়ে যে যার পথে ফিরে যায়, কিন্তু 'সাড়ে-চার ভাই' আর সঙ্গ ছাড়ে না কিছুতে। পিছন ফিরে ফিরে দাদা তাড়া লাগান, 'কে ডাকছে তোমায় সঙ্গে আসতে?'

পানদোক্তা-খাওয়া খয়েরি দাঁতের সার বের করে সে হাসে আর হাত কচলায়, 'পাণ্ডাকে কে ডাকে বাবু, পাণ্ডা আপনিই আসে।'

এখানেও নানা দেবদেবীর মন্দির, ভক্তদের স্থাপিত। নির্জন বলে এখানেও এসে সাধনভজন করতেন রূপ সনাতন, অদ্বৈত মহাপ্রভু।

'বামে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোঁসাই॥'

মানসগঙ্গায় সওয়া ক্রোশ পরিক্রমা ; পাড় ধরে সরু চলার পথ, দু পা অন্তর মন্দির। সবই দেখি ঘুরে ঘুরে। মণিপুরী যাত্রী, পূজারীই বেশি এখানে। বড়দি খুশি হয়ে ওঠেন তাদের দেখে ; যেচে গিয়ে আলাপ করেন দেশী ভাষায়। তারাও হাসে, বড়দিও হাসেন। যেন বাপের বাড়ির আত্মীয় কুটুম্ব সব ; বহুদিন পরে দেখা হয় অচেনা দেশে এসে। কেউ লুকিয়ে সন্দেশ-ভোগ প্রসাদ এনে দেয়, কেউ আদর করে আসন পেতে দেয়, কেউ ডেকে নিয়ে যায় ; তফাতে বলে, 'খাঁটি জিনিস দেখে যাও, অনেকেই জানে না ; এই হল গিরিরাজের জিব।'

হলদে পাথরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা হলদে জিহ্বার ছাপ। রঘুনাথ স্বামী স্থাপন করে গেছেন। পুজো হয় রোজ।

চলতে চলতে দাদা বলেন বড়দিকে, 'এখানেই কোথায় সেই মন্দির না, তরাশের জমিদারের?' বলতে না বলতেই এসে পড়ি তার সামনে।

উঠোনের কুয়ো থেকে জল তুলছিল খিট্‌খিটে এক বুড়ি ; সমানে বক্ বক্ করে চলেছে—'আর পারি নে বাবা। রাজার জামাই, তার মর্জিই আলাদা। কে চলতে পারে তাল রেখে? হাত গেল, রথ গেল, তবু রেহাই নেই—'

বালতির জলটা ছোটো পিতলের কলসীতে ভরে বুড়ি কোমর বেঁকিয়ে কাঁখে তুলে নেয়।

এতক্ষণে তার চোখ পড়ে আমার দিকে।

শুধোই, 'কে রাজার জামাই?'

বুড়ি বেঁকতে বেঁকতে কাছে আসে, এদিক ওদিক তাকিয়ে সুর নামিয়ে বলে, 'রাজার জামাই-ই তো হল। রাজকন্যে পান দিতে গিয়েছিল—নিয়ে নিল না তাকে?' ব'লে বুড়ি কপালে ভুরু টানা দিয়ে হাতের মুখের নানা ভঙ্গিতে বাকি ঘটনা ইঙ্গিতে বোঝায়।

পথে বেরিয়ে বিরক্তমনে বড়দিকে বলি, 'রাজকন্যা পান দিতে গেল, রাজকন্যাকে নিয়ে নিল—এ আবার কী সব কেচ্ছার কথা মন্দিরের ভিতরে?'

বড়দি হেসে উঠলেন, বললেন, 'তা বুঝি জান না? এইজন্যই তো রাধাবিনোদের নাম "জামাই ঠাকুর"। তরাশের জমিদার মস্ত জমিদার, রাজা বলত সবাই। তাঁর কুমারী মেয়ে রাধাবিনোদের পুজো করে ; তাঁকে স্নান করায়, সাজায়, খাওয়ায়-দাওয়ায়—ঐ নিয়েই থাকে। একদিন ভোগের পর পান সেজে নিয়ে মেয়ে গেছে রাধাবিনোদকে খাওয়াতে ; রাধাবিনোদ পান-সমেত মেয়েকেই নিয়ে নিলেন টেনে। আর কেউ দেখে নি সেই অবধি মেয়েকে। তখন থেকেই রাধাবিনোদ জামাই-আদরে আছেন এখানে। কুমারী মেয়েকে যিনি গ্রহণ করলেন তিনি তো জামাই-ই হলেন। মহাধুমধামে উৎসব হয় এখানে জামাইষষ্ঠীতে। আসল মন্দির বৃন্দাবনে। এখানে ইনি প্রতিনিধি।

এসে পড়ি শ্যামকুণ্ডে, রাধাকুণ্ডে। লাগালাগি দুই কুণ্ড, মাঝখানে সরু বাঁধানো

পথ দিয়ে ভাগ করা।

বনে জঙ্গলে ঢাকা জায়গা ; চৈতন্য মহাপ্রভু এলেন লীলাস্থলী উদ্ধার করতে। খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখেন, পাশাপাশি দুটি ধানখেত। আঁজলা করে ধানখেতের জল মাথায় দিলেন মহাপ্রভু। সেখানকার মাটি নিয়ে তিলক কাটলেন কপালে।

'তীর্থ লুপ্ত হৈল জানি সর্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈলা স্নান॥'

মহাপ্রভু বললেন, 'এই ধান্যক্ষেত্র হল শ্যামকুণ্ড, আর এই রাধাকুণ্ড।'

পরে ভক্তরা কাটিয়ে বাঁধিয়ে কুণ্ডের শোভা ফুটিয়েছে। এই কুণ্ডের অপার মহিমা।—

'কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা-মধুরিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা॥'

কুণ্ডের তীরে তীরে তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জ, সুদেবী কুঞ্জ, চম্পকলতা কুঞ্জ, রসমঞ্জরী, কস্তুরীমঞ্জরী ; এমনি আরও কত কুঞ্জ, কত মঞ্জরী। রাধাকৃষ্ণ সখীদের নিয়ে কুণ্ডে জলকেলি করে কুঞ্জে কুঞ্জে কোথাও দোল খেতেন, কোথাও শিঙ্গার করতেন, কোথাও-বা বিশ্রাম নিতেন। বৈষ্ণবরা ভোগারতি গায়—

'মধ্যাহ্নকালেতে রাই সূর্যপূজা ছলে
রাধাকুণ্ডে আইলেন মহা কুতূহলে।
সখীগণ সঙ্গে আসি কৃষ্ণেরে মিলিলা ;
রাধাকুণ্ডে নানা রঙ্গে জলকেলি কৈলা।
কেলি সমাধিয়া যবে কুণ্ডতীরে উঠি
বেশভূষা করিলেন মহা পরিপাটি
তবে কৃষ্ণ বসিলেন করিতে ভোজন
পরিবেশন করে রাই আনন্দিত মন॥'

বড়দি বললেন, 'লীলা কেবল রসাস্বাদনের জন্যই।'

যাত্রীরা আগে শ্যামকুণ্ডের জল মাথায় ছুঁইয়ে পরে এসে নামে রাধাকুণ্ডে। ভালোভাবে নিজেকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে স্নান করে বারে বারে। রাধাকুণ্ডেরই যেন প্রাধান্য বেশি।

শ্যামের কুণ্ড দেখে রাধার অভিমান হয়। বলেন, 'তোমার কুণ্ডে আমি নাইব না, নিজের কুণ্ডে নাইব।' ব'লে হাতের কঙ্কণ খুলে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। হুড় হুড় করে শ্যামকুণ্ডের জল এসে রাধাকুণ্ড ভরিয়ে দিল। কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আমার কুণ্ডের চেয়ে তোমার কুণ্ড আমার বেশি প্রিয়। আমার কুণ্ডে স্নান করলে লোকে সর্বপাপমুক্ত হবে ; কিন্তু তোমার কুণ্ডে স্নান করলে আমার প্রেম সে পাবে।'

বাঁধানো পথের এক ধারে ঝুড়ি ঝুড়ি তিলকমাটি নিয়ে বসে বিক্রি করছে লোক। রাধাকুণ্ডের তিলকমাটি হলুদ রঙের, শ্যামকুণ্ডের কালো। পয়সায় দুটো। কাকে কাকে দিতে হবে আঙুল গুনে বড়দি তিলকমাটি কিনছেন।

দেখা মণিবাহাদুরের সঙ্গে। তিনিও এসেছেন আজ বৃন্দাবন হতে রেবাদিকে নিয়ে, শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান করতে। দেখা হতেই দু পক্ষ উল্লসিত। মণি-

বাহাদুর বললেন, 'আর ভয় নেই ; দুই কুণ্ডের মাঝখানে যখন ফিরে দেখা হয়ে গেল, গোলোকে গিয়ে আবার দেখা হবে ঠিক।'

এতক্ষণে মনে হয়, বহুক্ষণ হেঁটেছি ; খিদেও পেয়েছে যেন। সামনেই লুচি-পুরীর দোকান ; যাত্রীরা ভিড় করেছে দোকান ঘিরে। দোকানিরা কড়াই-ভরা ঘিয়ে লুচি ভেজে কূল পাচ্ছে না ; আরও ঘি ঢালে, আগুন খোঁচায়, তিন-চারজনে মিলে দিস্তা দিস্তা লুচি একসঙ্গে কড়াইয়ে ছেড়ে দেয়।

কিছু গরম পুরী প্যাঁড়া কিনে খেয়ে গাছতলায় রাখা টাঙ্গাতে এসে বসি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখ বুজে আসে।

একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে চেঁচাতে থাকে চার দিক ঘিরে—

'এ মাইয়া, আড় কাড়েকে, পাড় কাড়েকে,
আনা, আনা, আনা।'

বুঝলাম, 'আনা' 'আনা' চাইছে সবাই। কিন্তু এ যে অনেকগুলি। চেয়ে দেখতে হাত পেতে তারা সুর ধরে—

'সাম কুণ্ডা, রাদা কুণ্ডা, গিরিগোবরদনা—
মাদুর মাদুর বাংশী বাজে এই ছে বৃন্দাবনা।'

বড়দি এসে উঠলেন গাড়িতে। বলি, 'কী বলছে এরা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে? পদটা কী?'

বড়দি বললেন, 'আরে, এ তো সেই গান। শীতকালে মণিপুরী মেয়েরা আসত আমাদের বাড়িতে ভিক্ষে করতে এই গান গেয়ে।—

'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই বৃন্দাবন।'

বেলাশেষে রওনা হই আর-এক পথ দিয়ে। পথের বাঁ পাশে মাইল অবধি পাথরের স্তূপ। এই পাথরের রঙের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আর কোথাও এমন দেখি নি। অনেকটা স্লেটের গায়ের রঙ। মনে হল, এক টুকরো পাথর নিয়ে নিই, মার ঠাকুরের আসনের পাশে রেখে দেব সাজিয়ে।

টাঙ্গাওয়ালা বললে, 'অমন কাজও কোরো না মা। এখানকার এই গিরিগোবর্ধনের পাথর নিয়ে কেউ সহ্য করতে পারে না। সেবার এক গুজরাটি এক টুকরো পাথর নিয়ে গিয়েছিল। কী সর্বনাশ তার হল। ছেলে মরল মেয়ে মরল, মা স্ত্রী সবাই মরল ; ব্যাবসা-বাণিজ্যে লোকসান হল, টাকাকড়ি সব গেল ; শেষে কোনোমতে ছুটতে ছুটতে এসে পাথর ফিরিয়ে দিয়ে যায়, তবে সে প্রাণে বাঁচে।'

ব্রজরমণ বললেন, 'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজিও কাহাকে যেন বলিয়াছিলেন—"আরে মূর্খ, তুই করিয়াছিস কী? শীঘ্র যা, এই পাথর ফিরাইয়া দিয়া আয়।"'

বড়দি বললেন, 'থাক্, নিয়ো না। স্বামী সন্তান নিয়ে ঘর কর—কী জানি কী হতে কী হয় শেষে।'

যতই চলি, পথ জুড়ে দেখি—ছেলেবেলায় যেমন খোলামকুচি দিয়ে পুতুলখেলার ঘর বানাতাম, সেইরকম নুড়ি-সাজানো অজস্র খেলাঘর শুকনো ঘাসের উপর। ভক্তরা যাবার সময়ে বানিয়ে রেখে যায় যে যার নামে। মানত থাকে মনে, 'এই আমার

ঘর করে রেখে দিয়ে গেলাম, মরবার পরে যেন তোমার কাছে ঘর মেলে।'

'এ কী!' রেবতী না?' হঠাৎ বড়দি টাঙ্গা থামিয়ে নেমে পড়েন পথে। মণিপুরী যাত্রীদলের মধ্যে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে, পরনে মেখলা, গায়ে সাদা ওড়না ; বড়দি গিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাকে। বলেন, 'তুমি এখানে?'

'হ, পরিক্রমাত্ আইছি।' ওড়নার আঁচল দাঁতে চেপে ধরে মেয়েটি। কাঁচের মতো চোখ দুটি জলে ভরে আসে। তাকিয়ে থাকে স্থির নয়নে বড়দির দিকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

যেন দুই পাথর মুখোমুখি।

সময় ধীরে বয়ে যায়।

বড়দি বেরতীর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ফিরে চলে আসেন। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে গাড়িতে ওঠেন। চাকায়-ওড়া সাদা ধুলোয় মিলিয়ে যায় দূরে রেবতী। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বড়দি বলেন, 'ছোট্ট মেয়েকে বুকে নিয়ে বিধবা হয়ে এল শিলচরে। মাস্টারি করত স্কুলে। সেই অবলম্বনটুকুও হারাল অভাগী পাঁচ মাস আগে।'

আগ্রা এড়িয়ে কোন্ পথে জয়পুর যাওয়া যায়? যদিও সোজা, সুবিধের একমাত্র পথ ঐ আগ্রা হয়েই যাওয়া। অনেক গবেষণার পর ঠিক হয়, মথুরা থেকে ঘণ্টা-দুই ট্রেনে গিয়ে ছোটো একটা স্টেশনে গাড়ি বদল করে যাওয়া যেতে পারে ; তবে ওঠানামার হাঙ্গামা আছে, লেট-হওয়া গাড়ির প্রতীক্ষা আছে। হোক, তবু রাজি তাতেই।

এইটুকু পথ ; দুপুরে রওনা হয়ে ঢিকুতে ঢিকুতে রাত সাড়ে আটটায় এসে থামি 'অছ্নেরা' স্টেশনে।

টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলে প্ল্যাট্ফরমে। ঘণ্টা আড়াই বসে থাকতে হবে এখানে। সময় কাটাই কী করে? একটা লাইটপোস্টের নীচে মালপত্র জমা ক'রে চার পয়সার ঝুরিভাজা কিনে অন্ধকার এক কোনায় লুকিয়ে বসলাম। দাদা দেখলে রাগ করবেন ; পথে ঘাটে এইসব কিনে খাওয়া পছন্দ করেন না মোটে।

গলা বাড়িয়ে এ-কোনা সে-কোনা খুঁজতে খুঁজতে একজন এসে হাজির হল সামনে। বললে, 'বহিনজি, তুমিই না মথুরা স্টেশনে ছবি এঁকে তুলছিলে খাতার পাতায়?'

বলি, 'হুঁ।'

সে বললে, 'আমি বলছিলাম একে সে কথা যে, বাঙালি লোক জাদুকর আছে।' ব'লে তার সঙ্গীকে এনে এগিয়ে ধরল।

মথুরা স্টেশনে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। ট্রেন লেট। ঘাগরাপরা ওড়নায় ঢাকা যোধপুরী মেয়েরা বসেছিল সেখানে ; স্কেচ করছিলাম তাদের। একটি মেয়ে কাছে উঠে এল ; বললে, 'আমার এই ছেলে মনোহরের ছবি এঁকে দেবে একটা?' বললাম,

'আঁকব ; কিন্তু খাতার পাতা ছিঁড়ে তোমায় দিতে পারব না।'

সে কী ভাবল খানিক, বললে, 'আচ্ছা, না দিলে আমাকে, আঁকা তো হয়ে থাকবে।' ব'লে কোলের ছেলেকে পায়ের উপর ধরে বসিয়ে কথা কয়ে কয়ে ভোলাতে লাগল। আমি আঁকতে লাগলাম। আঁকা হলে, দেখে কী খুশি মা। বারে বারে ছেলের মুখখানি দেখে আর খাতায়-তোলা ছবি দেখে। মাতৃত্বের সে কী গৌরব ফুটে ওঠে তার মুখে। আট-দশ বছরের মেয়েও ছিল তার একটি। তাকে এনেও বসায় সামনে ; বলে, 'একেও আঁকো।'

ফুট্‌ফুটে সুন্দরী মেয়ে ; লজ্জায় কাঁচুমাচু করে। তাকেও আঁকি। ভিড় জমে যায় আমাদের ঘিরে। মা হাসে, মেয়ে হাসে, মেয়ের বাপ হাসে, যারা দেখে তারাও খুশিতে হাসে। ঠেলাঠেলি ক'রে আরও বউ-মা'রা সামনে এসে দাঁড়ায়। 'আমায় আঁকো', 'আগে আমায়'—কাকুতি জানায়।

হুস্‌ হুস্‌ করে ট্রেন এসে থামে। উঠে পড়ি খাতা বন্ধ করে।

লোকটি বললে, 'বহিনজি, ছবিগুলো দেখাবে একবার একে? না দেখালে বুঝতে পারছে না আমার কথা।'

অতি সাধারণ লোক, ছেঁড়া খাকির শার্ট গায়ে। কিন্তু কী সরল অন্তরঙ্গতা। মন গলে যায় ঐ এক 'বহিনজি' ডাকেই।

ঝুরিভাজা মুখে পুরতে পুরতে বাঁ হাতে ঝোলা থেকে খাতা বের করে দিই তাকে। আলোর নীচে গিয়ে দুই বন্ধু পাতা ওল্টায় আর দুজনে দুজনের মুখে তাকায়।

হোল্ডলে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম বোধ হয়। দাদার ডাকে উঠে বসলাম। ট্রেন আসবার ঘণ্টা বেজেছে।

প্ল্যাট্‌ফরমে মালগাড়ি জোড়া। আমাদের ট্রেন এসে থামে ওপাশে। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীরা দরজা এঁটে রেখেছে নিজেদের দাবিতে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায় আর দেখে—আমরা কজন ট্রেনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছুটোছুটি করছি কুলিদের নিয়ে। যে কামরারই কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তারা অন্য প্রান্ত দেখিয়ে দেয়, বলে, 'ঐখানে অনেক জায়গা খালি আছে দেখেছি।' ঐ প্রান্তের কাছে যেতেই তারা শার্সি টেনে দেয়, বলে, 'ছ জন হয়ে গেছি, কামরা পুরো ; অন্য ব্যবস্থা দেখো।' ঝুলে ঝুলে লোক চলেছে থার্ডে, ইণ্টারে ; সূচ্যগ্র স্থান নেই সেখানে। ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে আসে, দৌড়ে স্টেশনমাস্টার টিকিট-কালেক্টর গার্ড, যাকে পাই গিয়ে ধরি—এত বড়ো গাড়িটা, যেমন করে হোক, যেখানে হোক, ঢুকিয়ে দাও আমাদের কোনোমতে। তারা নির্বিকার। ট্রেন ও মালগাড়ির মাঝখানের ফালি পথটুকুতে আর-এক দফা দৌড়োদৌড়ি করি। ট্রেন চলে যায়, মালগাড়ি চলে যায় ; দেখি হা-হা-করা লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা চারটি প্রাণী।

রাগে দুঃখে গর্‌ গর্‌ করি। তুবড়ি ছোটাই কালো কোট গায়ে যে যেখানে আছে সকলের উদ্দেশে। দাদাকে বলি—'যাব না জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর ; কোথাও না। ফিরে যাব এখনি দিল্লি ; দিল্লি থেকে হরিদ্বারে, সেখান থেকে সোজা

ঘরে। কী বলো বড়দি?'

বড়দি বললেন, 'বাধা পড়ল, মনে খট্‌কা লাগল। পথঘাটের এই ঝঞ্ঝাটে তোমার দাদাকে কষ্ট দেওয়া; ছেলেরা শুনলে বলবে কী? বাদই দাও যাওয়া। আমারও উৎসাহ লাগছে না আর।'

দাদা ঠাণ্ডা মানুষ, এরই মধ্যে রাগ বিরক্তি সব পড়ে গেছে। বললেন, 'আচ্ছা, এখনি না-হয় মনঃস্থির নাই করলে। সময় তো পাওয়া গেল হাতে সারা রাত; কাল সকালে ভেবে ঠিক করা যাবে।'

'না না, কাল সকাল পর্যন্ত কী ভাবব? যাব না কিছুতেই। একেবারে খাঁটি ঠিক। জয়পুরের টিকিট বদলে দিল্লির টিকিট কিনে ফেলুন।'

সুস্থির হতে দিই না তাঁকে।

দাদা বললেন, 'টিকিট কিনেছি মথুরা থেকে, এরা কেন রিফাণ্ড দেবে? সেই লেখালেখি, নানান হাঙ্গামা; এই কটি টাকার জন্য আবার হয়তো আসতে বলবে।'

বলি, 'না-হয় গচ্চাই যাবে, তবু এখনি আগে দিল্লির টিকিট কিনুন, পরে অন্য কথা।'

শেষবারের মতো দাদা আর-একবার বড়দিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'আজ না গেলাম, কাল যাব। জয়পুর দোষ করল কী?'

বড়দি মাথা নেড়ে সেই এক 'উঁহু-হু' চালিয়ে যান। অগত্যা দাদাকে উঠে গিয়ে নতুন টিকিট কিনে আনতে হয় দিল্লি ফেরবার জন্য।

খানিকটা রাগ কমে। এসে ওয়েটিং-রুমে ঢুকি। জয়পুর গেলাম না, খুব জব্দ করলাম! কাকে তা জানি না। এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেঝেতে হোল্ডল বিছিয়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ি।

ঘুম এল না চোখে।

সারা রাত কেবল খচ্ খচ্ করল মনে, আহা, মনোহরের মাকে দিলেই হত ছেলের ছবিখানা খাতার পাতা ছিঁড়ে।

বহুকালের অভিজ্ঞতায় মেয়েদের মন ভালোভাবেই জানেন বোধ হয় দাদা। পরদিন সকালে ওয়েটিং-রুমের বাথরুমে স্নান করে ঠাণ্ডা হয়ে, ধোপাবাড়ির পাটভাঙা শাড়ি জামা পরে, কাঁচের গ্লাসের দু গ্লাস চা খেয়ে, ভেণ্ডারের কাছে কেনা গরম পুরীতে কামড় দিয়েছি, দাদা বললেন, 'আমি অবশ্য কিছু বলি না, তোমাদের মতই মত, তবে একটা কথা ভেবে দেখো—এতদূর এসে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না। আসল গোপীনাথ, গোবিন্দ দেখবে বলে এত আগ্রহ করলে! তা দেখো চিন্তা করে, আমি বলছি না যে যেতেই হবে। দিল্লির টিকিট তো কেনাই আছে।'

তরকারির আলুটা পুরীর উপর টিপতে টিপতে বড়দির দিকে তাকাই; দেখি, তিনিও তাকিয়ে আছেন আমারই দিকে।

দু চোখ নাচাই; মানে, কী বলো বড়দি?

বড়দি দৃষ্টি নামিয়ে প্যাঁড়া তুলে দেন সবার হাতে একটা একটা।

বলি, 'তা হলে দেখেই যাই জয়পুরটা। পথঘাটের নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে জেনেই তো বেরিয়েছি; শেষে কিনা এইটুকুতেই বিচলিত হই? ফিরে গিয়ে বলব কোন্ মুখে?'

বড়দি বললেন, 'তাও ঠিক, আর এও ঠিক, গোপীনাথ এতখানি টেনে আনলেন কি মাঝপথে ঘুরিয়ে দেবার জন্য? আমার মনে হয় এ তাঁর ইচ্ছে নয়।'

'তবে কিনে ফেলুন টিকিট এক্ষুনি। এই যে-ট্রেনটা আসছে, তাতেই যাব জয়পুরে।'

দাদা বললেন, 'দিল্লির টিকিট কী হবে?'

'না-হয় আর-একবার গচ্চা যাবে।' ব'লে তাড়াতাড়ি হাত মুখ মুছে, ঝুড়ি বাক্স বন্ধ করে তৈরি হয়ে নিলাম।

ট্রেনে উঠে শুরু হয় আমাদের হাসি—হু হু হু হু, হি হি হি হি, হা হা হা হা। গড়াগড়ি যাই বড়দি আর আমি। বেচারা দাদা! যত তাঁর মুখ দেখি তত বেশি হাসি। ভেবে পাই না, কেন এত রাগ হয়েছিল কাল আমাদের, কার উপরে? ট্রেনে উঠতে পারলাম না, দোষ কার? ছোটো স্টেশনের পথ বেছে নিয়েছিল কে শখ করে? কী তম্বি অকারণে দাদার উপরে! হাসিমুখে সয়েছেন; এই বয়সে বারে বারে টিকিট-ঘরে ছুটেছেন, টিকিট কিনেছেন, বদলেছেন ঐ অত রাতে।

দাদা বললেন, 'কী করব? তখন যা অবস্থা তোমাদের, "না" বললে ছিঁড়ে খেতে আমাকে। জানিই তো, পরের দিনই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব। এত দিন ধরে এতসব দেখে আসছি, কিসে কী হয় এটুকু বুঝি না?'

কামরায় আছেন আরো কয়েকজন পাঞ্জাবি মহিলা। এর মধ্যে দুজন জয়পুরে নামবেন। একজন বর্ষীয়সী। আর-একজন বছর-চারেক বয়সের ছোটো ছেলের মা, যাচ্ছে স্বামীর কাছে; বেশ সলজ্জ একটা ভাব মুখে। আলাপ হচ্ছে ছেলেতে-মায়েতে মুখোমুখি বসে—বাপ আসবে কি তাদের নিতে, না কাকাকে পাঠাবে; তাঁর হয়তো আপিসের কাজ পড়ে যাবে।

সকলের সঙ্গে ভাব জমে ওঠে, গল্পে গুজবে সময় কেটে যায়। জয়পুরে এসে ট্রেন থামে। বর্ষীয়সী মহিলাটি দু স্টেশন আগে হতে প্রসাধনে লেগেছে; পরিপাটি করে চুল বাঁধলেন, ঘটি ভরা জল নিয়ে জানলায় মুখ বাড়িয়ে সাবান ঘষলেন, হাত পরিষ্কার করলেন, দু পা তুলে তুলে জল ঢাললেন, বাথরুমে ঢুকে সাদা সিল্কের শালোয়ার পাঞ্জাবি বদলে পরে এলেন; এবারে আয়না বের করে মুখে পাউডার ঘষতে বসলেন। এখানে ট্রেন অনেকক্ষণ থামে, তাই বোধ হয় নিশ্চিন্ত।

আমরা নেমে মালপত্র জড়ো করে এক পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। পাণ্ডা এসে জুটেছে কয়েকজন। নতুন জায়গা, চেনা লোক কাউকে খবর দেওয়া হয় নি ইচ্ছে করেই। কোন্ পথে কী ভাবে যাব, কোথায় গিয়ে থাকব! দাদা বললেন, 'একজন পাণ্ডা নিয়ে নেওয়া ভালো; কী বলো?'

কিন্তু কোন্ জনকে নেব? পাণ্ডা-বাছাই চলে আমাদের। সামনে দিয়ে সেই বর্ষীয়সী শৌখিন মহিলা সেজেগুজে পাশ কাটিয়ে চলে যান হেসে নমস্কার জানিয়ে। বাঃ, বেশ লাগল তো। এখন যেন আরো সুন্দরী মনে হল।

রোগা লম্বা পাণ্ডাকেই পছন্দ করে আমরা গিয়ে টাঙ্গাতে উঠে বসি। রোদের তাত লাগে চোখে। কাঁধের ঝোলাতে হাত ঢোকাই চশমার খোঁজে। ঝোলা খালি। বরাবরের অভ্যেস, চলতে ফিরতে ঝোলায়-ভরা সঙ্গে থাকে। বহুদিনের সঙ্গী

সেই চশমা নেই ; কলম নেই ; একগাদা ফ্রেঞ্চ ক্রেয়ঁ পেন্সিল, তা নেই ; অতিকষ্টে জোগাড় করিয়েছিলাম বিদেশ হতে। কী হল সব? ট্রেনে উঠেও যে আমি ব্যবহার করেছি ; পড়ে গেল নাকি সেখানে? ট্রেন তখনও প্ল্যাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কামরায় ঢুকি। জানলার পাশে গদি সরিয়ে দেখি, বেঞ্চের তলায় উপুড় হয়ে দেখি, বাঙ্কের উপরে হাত বুলিয়ে দেখি। নেই—কোথাও নেই। আর-একটি প্রৌঢ়া সঙ্গিনী ছিলেন আমাদের ; বসেছিলেন কোনায় ; ইনি যাবেন আরো দূরে ; বললেন, 'ওসব তোমার ছিল? আমি তো দেখলাম তোমরা যখন নামছ তখন সেই মোটা মেয়েলোকটি ওগুলি তার নিজের হাত-ব্যাগে পুরে নিল।'

সেই বর্ষীয়সী সুন্দরী মহিলাটি!

মনটা খারাপ হয়ে গেল। চোখমুখ বুজে ফিরে চলে আসি।

কোচবক্স থেকে পাণ্ডা হাঁকে, 'বাবু ধরম্‌শালায় যাবেন, না হোটেলে উঠবেন? আমার জানা ভালো হোটেল আছে।'

বেলা পড়ো-পড়ো। কোথাও গিয়ে উঠতে পারলেই হয় এখন। দাদা বললেন, 'তোমার জানা হোটেলেই চলো।'

রাস্তার পাশে বড়ো একটা দেশী হোটেলের সামনে টাঙ্গা থামে। বাইরে থেকে বাড়ির রূপ দেখেই খুশি হয়ে উঠি। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় যাই। মাঝখানে খোলা উঠোন, চারদিক ঘিরে বারান্দা, প্রতি বারান্দায় চারখানা করে ঘর। পালঙ কার্পেট পর্দা সোফা দিয়ে কায়দা-মাফিক সাজানো।

মারোয়াড়ী যাত্রীতে কিল্‌বিল্‌ করে হোটেল। তিনখানা ঘর মাত্র খালি আছে। তিনখানার যেখানাতেই ঢুকি, বাথরুমের উৎকট গন্ধ আসে। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বারান্দা ঘুরি—সর্বত্র ঐ গন্ধ। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি সেখান হতে ; এমন স্থানে দিবারাত্র বাস করা দুরূহ।

পাণ্ডা বললে, 'তবে এক ধর্মশালা আছে, নতুন তৈরি হচ্ছে।'

বলি, 'আচ্ছা, চলো সেখানেই।'

বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলি-ঘুপ্‌চি ঘুরে টাঙ্গা চলে ; ধর্মশালা আর দেখা দেয় না।

পাণ্ডা আমতা-আমতা করে—'এখানেই কোথা হবে ; আমার শালার ভায়েরা বলছিল সেদিন।'

খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকার নেমে আসে। অবশেষে ইঁটপাটকেলে-বোঝাই এক ধর্মশালায় এনে হাজির করে আমাদের। নীচের তলার গাঁথনি উঠেছে সবে, তারই একটা ইঁট-গাঁথা ঘরে এক পরিবার যাত্রী এসে উঠেছে আজই। লোহার আংটাতে রুটি তরকারি রেঁধে খাওয়াচ্ছেন গিন্নি স্বামীকে দেওরকে সামনে বসিয়ে। কলাইকরা পিতলের থালাতে রাখা বুঁদে মণ্ডা মেঝেতে নামিয়ে এক-হাত ঘোমটা টেনে দেন আমাদের দেখে।

পায়রার খোপের মতো ঘরগুলি—না জানলা, না কিছু। একটা কেবল দরজা, বার-ভিতর করবার। দেখেই বড়দি সর্‌ সর্‌ করে বেরিয়ে এলেন পথে। বললেন, 'এমন পাণ্ডার হাতে পড়েছি, সারা রাত ঘোরাবে এই ভাবে। বলি, জয়পুর শহরে কি আর হোটেল নেই? চলো একটা হোটেলে।' ব'লে দুই ধমক দিলেন

পাণ্ডাকে।

ধমক খেয়ে পাণ্ডা তৎপর হয়ে ওঠে। হেঁড়ে গলায় হেঁকে 'সিধা চলো', 'ডাইনে ঘোরো', 'বাঁয়ে ঢোকো' ব'লে গাড়োয়ানকে তাগিদ লাগায়।

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে শহরের মাঝে আর-এক হোটেলের সামনে এসে থামি।

'আমি এখানকার লোক, আমার জানা এ ছাড়া আর ভালো হোটেলই নেই,' বলে পাণ্ডা নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভালো হোক মন্দ হোক, এখানেই রাত কাটাব, মন স্থির করেই নামি গাড়ি হতে।

বিশিষ্ট, বিচিত্র হোটেল। সরু অন্ধকার সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে রাস্তা ধরে দোতলায়। গায়ে লাগে দু দিকের তেল-চক্‌চকে দেয়াল। একজন ওঠে, একজন নামে। বিপরীত দিক হতে আসা দুজনের মাঝ-পথে মুখোমুখি ঘটলে একজনকে পিছু হটে হটে নেমে আসতে হয়। উপরের জন চেঁচাতে থাকে, 'কেউ এসো না, আমি নামছি এখন।' মনে পড়ল আমাদের পুরোনো বাড়ির কথা। লম্বা শোবার ঘরের এক দিক ঘেঁষে স্নানের ঘর 'হাফ ডোর' দিয়ে আলাদা করা। ছুটি-ছাটাতে আত্মীয়বন্ধুদের ভিড় হলে নিয়ম করা থাকত, যে স্নানের ঘরে ঢুকবে তাকে গান গাইতে হবে। নয়তো অন্য কেউ ঢুকে পড়তে পারে ভুলে। ভাগ্নে বললে, 'আমি যে গাইতে পারি না, আমার কী উপায়?' ব'লে দৌড়ে গিয়ে ছেলের হাতের মাউথ-অরগ্যানটা নিয়ে এল।

হোটেলের দোতলায় সরু করিডোর ; দু পাশে সেই মাপের দু সার ছোটো ঘর। সিঁড়ির ধারে একটিমাত্র কল ; দেয়াল ফুটো করে কালো রবারের নল ধরে জল নেওয়া হয় স্নানের ঘরে। সেখানকার বালতি ভরলে তা উঠে যায় তেতলায় ; রান্না-ঘরের ঘটি বাটি জলে ভরে ছাদের কোনায় বাসনমাজার জলের টিনে নলের মুখ ছাড়ে। ততক্ষণে নীচের লোক হাঁক পাড়ে—'নল খুলে নাও, দাঁত মেজে দাঁড়িয়ে আছি, মুখ ধোব।' স্নানের ঘরের লোক দরজা খুলে উঁকি মারে—আর দু ঘটি জল চাই তার। রান্নার বামুন চেঁচামেচি করে, 'এমন চাকরি ছেড়ে দেব। ডালটা ধুতে না ধুতেই জল ফুরিয়ে যায়, রান্না চাপাই কী দিয়ে? ঠিক সময়ে খাবার না দিতে পারলে আবার উল্টে গালাগালি করবে কানা ম্যানেজার।' হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি, মুহূর্তে মুহূর্তে। ফাঁকে ফাঁকে জল নিয়ে নেয় যে যেমন পারে গায়ের জোরে।

'তা হোক, তা হোক, এই বেশ', ব'লে মেঝেয়-বিছানো ছেঁড়া সতরঞ্চির উপর নিজেদের বিছানা বিছিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। অনাহারক্লিষ্ট ছারপোকা-গুলি বাঙালির রক্ত চুষে নিল রাতভোর যতটা পারল।

জয়পুর শহর লোকে সুন্দর বলে। লাল পাথরের প্রাসাদ দালান বড়ো রাস্তার দুধারে ; ছক-কাটা নিখুঁত পরিমাপ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুন্দর বৈকি সব মিলিয়ে।

কিন্তু আমায় যদি কেউ থাকতে বলত তবে শহর পেরিয়ে ঐ যেখানে ছুঁয়ে চলে গেছে সকালের সোনালি রোদ পাহাড়ের গা বেয়ে, তারই নীচে ঘর বাঁধতাম মনের আনন্দে। যে দিকে তাকাই, মনশিশু যেন খোলা আঙিনায় ছুটে ছুটে বেড়ায়; কখনো গিয়ে লুকোয় গমখেতের আড়ালে, কখনো গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে 'ধোক্'গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, কখনো এসে শুয়ে পড়ে দু পাহাড়ের মাঝখানে পাতা সবুজ আঁচলখানিতে মুখ গুঁজে। এ মিলমিশ শহরের পাকা বুকে কোথায় পাব খুঁজে।

টাঙ্গাতে সওয়ার হয়ে চলতে চলতে এসে পৌঁছই মানসিংহের দুর্গে। রাজ্য ঘিরে দুধারের পাহাড়ের সারি এসে মিলেছে এখানে মাঝখানের চলাচলের পথটুকু ছেড়ে দিয়ে। যেন আকাশ-ঢাকা বিরাট এক দেউড়ি। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দূরের বিস্তীর্ণ নগর, সবুজে-ঘেরা দিগন্তের কোলে।

পাহাড়ের উপরে দুর্গে বসে দেখতেন মানসিংহ এ অপূর্ব শোভা; আর দেখতেন শত্রুর আগমন বহু দূরের আকাশে ধুলোর মেঘে।

বাগ-বাগিচা দিঘি-ফোয়ারায় ঘেরা দুর্গ। পাথরের বাঁধানো চওড়া পথ ঘুরে বেঁকে উঠে গেছে উপরে পাহাড়ের চূড়ায় প্রাসাদপ্রাঙ্গণে। হাতির পিঠে উঠতেন নামতেন মানসিংহ এই পথ ধরে। এই পথেই এনে তুলেছিলেন যশোর হতে যশোরেশ্বরীকে দুর্গ-অন্তঃপুরে, রাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে হারিয়ে। আর এনেছিলেন যশোরের রূপসী যুবতী রাজকুমারীকে।

পাণ্ডা বললে, আগে এখানে দেবীর সামনে নরবলি হত। নরবলি উঠে যেতে দেবীর রাগ হয়। সেই হতে দেবী রাগে ঘাড় বেঁকিয়ে আছেন।

শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, শ্বেতপাথরের থাম, শ্বেতপাথরের গলি দেয়াল—সব পেরিয়ে শ্বেতপাথরের আঙিনায় এসে দাঁড়াই। ধব্ ধব্ করে চার দিক সাদায় সাদায়, যেন বেল-জুঁইয়ের গাঁথনি-তোলা মহল; তার মাঝখানে বসে আছেন মা যশোরেশ্বরী। লাল চোলি পরা, যেন কালো রঙের কনে বউটি। সলজ্জ গ্রীবাভঙ্গি! জ্বল্ জ্বল্ করে হীরের নাকছাবি কালো টিকোলো নাকের উপরে। অতি সুন্দর মূর্তি। এমন দেবীমূর্তি দেখি নি কোথাও। এমন সুন্দর ভঙ্গি! আর একেই পাণ্ডা বলে কিনা দেবী রাগ করে ঘাড় বেঁকিয়ে আছেন! এই কি রাগের ভঙ্গি?

রক্তপট্টাম্বর-পরা পূজারী দু ভাই এসে দাঁড়াল সামনে। দেবীপূজার জন্য একঘর বাঙালি পূজারীও এনেছিলেন মানসিংহ সেইসঙ্গে।

সুপুরুষ পূজারী দু ভাই: বাঙালি যাত্রী দেখে খুশির হাসি হাসে আর পাণ্ডাকে পরিচয় শুধোয়। বাংলা বলতে পারে না এরা এখন আর। বংশানুক্রমে এদেশের মেয়ে বিয়ে করে বদলে গেছে আমূল। তবে, বর্তমানে দুই ছেলেকে কলকাতায় পাঠিয়েছে পড়তে; এক ছেলের বউ এনেছে বিহার হতে। বাংলাদেশে ক্রিয়াকর্ম করতে শুরু করেছে ফিরে।

এই রাজার আগে যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন গোবিন্দ-উপাসক। 'শক্তি' ছিলেন অবহেলায় পড়ে। বর্তমান রাজা শক্তি-উপাসক; তিনি রাজা হয়েই মন্দির সংস্কার করেন, জয়পুরী পাথরের কারুকাজ দিয়ে সৌন্দর্য ফোটান। সবুজ পাথরের

টাটকা কলাগাছ দু দিকে বসান। প্রবেশদ্বারের পিতলের কপাটে প্রার্থনা খোদাই করেন—

শিলাদেবী হো দৃঢ় অচল, শংকর অচল সমান।
ধ্যান মান 'শ্রীমান' কা য়ে মম দো দল জান।
য়হ 'কিশোর' বিনতি সুনো, হে জগজননী আপ,
জয়পুরপতিকা তপন সম, হো তপ তেজ প্রতাপ॥

গুম্ গুম্ শব্দে বলির ডঙ্কা বেজে উঠল। মন্দির হতে বেরিয়ে এলাম।

এবার মানসিংহের প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি। বারো রানী ছিল মানসিংহের। নীচে একতলায় বারো রানীর মহল এক উঠোনের চার দিক ঘিরে। উঁচু দেয়াল গাঁথা, অতি সুরক্ষিত। এক-এক রানীর দুখানা করে ঘর, রান্নাঘর, সামনে খোলা এক ফালি বারান্দা; পর পর সমানভাবে ভাগ করা, যেন রানীদের বন্দীশালা। প্রত্যেক মহলেই সিঁড়ি আছে একটা উপরে যাবার, বা উপর হতে আসবার। অতি সাধারণ খর্‌খরে মেঝে দেয়াল। উঠোনের মাঝখানে বাঁধানো চাতাল। একই সুখে দুঃখে দিন মাস কাটায়, একই আশা নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে— সেই এগারো রানীর কমন-রুম হ'ল চাতালটি।

বারো রানীর এক রানী পালা করে উপরে থাকেন রাজার সঙ্গে, এক মাস বছরে। সেই এক মাসের রানীর স্নানের ঘর দেখতে ঢুকি আগে। গোলাপজলের ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে স্নান করতেন রাজার অঙ্কবিলাসিনী। চুল শুকোতেন অলিন্দে বসে। বর্ষা দেখতেন কাঁচঘরে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে। সোহাগমন্দির হতে ফুল ফেলতেন রাজার মাথায়, দরবার সেরে অন্তঃপুরে আসবার পথে দ্বারের মুখে। সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতেন খাবার ঘরে; তীর্থস্থানের দৃশ্য-ভরা দেয়ালচিত্র-আঁকা দেয়াল— তাই দেখে সর্বতীর্থদর্শনের ফললাভ করে খেতে বসতেন রাজা রানী পাশাপাশি। তার পর শীষমহলে এসে এক রানী লক্ষ রানী হয়ে বিশ্রাম নিতেন রাজার ক্রোড়ে।

এক মাসের সুয়োরানীর বিলাসের দুঃখে অনুকম্পায় ভরে ওঠে মন।

একই সাজে সাজি আমি বড়দি রোজ, লালপেড়ে তসর-গরদে। সবাই ভাবে আমরা মা-মেয়ে, নয় দুই বোন। ননদ-ভাজ বলে না কেউ।

হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে আসছি— খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠলেন বড়দি। পা থামিয়ে ঘাড় ফেরালাম; মানসিংহের বারো রানীর প্রভাবে উদ্‌ভ্রান্ত পাণ্ডা দেখি দাদাকে চেপে ধরেছে; বলছে 'এতে হবে না বাবু। আপনার দুই রানীর নামে আমাকে ডবল দক্ষিণা দিতে হবে।'

গোবিন্দজি আছেন রাজবাড়িতে, শহরের ভিতরে। গোপীনাথও শহরেই থাকেন, তবে অন্য জায়গায়। আর মদনমোহন আছেন করোলিতে।

বিবাহের পর রাজকন্যা যাবেন স্বামীর ঘরে। আবদার ধরলেন, মদনমোহনকেও চাই সঙ্গে।

রাজা বললেন, 'মদনমোহনকে যে চাই আমিও। তুমি গোবিন্দকে নাও, বা

গোপীনাথকে।'

রাজকন্যার ঝোঁক ঐ মদনমোহনেরই 'পরে।

রাজা বললেন, 'তবে চোখ বেঁধে দিই; হাত বাড়িয়ে যাঁকে ছোঁবে তিনিই তোমার।'

কানামাছি-খেলার মতো জায়গার অদল-বদল করে রাখলেন গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনকে। রাজকন্যা হাতড়ে হাতড়ে এসে ধরলেন মদনমোহনের হাত। সেই হাত ধরেই চললেন তিনি পিত্রালয় হতে শ্বশুরালয়ে। সেই অবধি করোলিতেই আছেন তিনি জামাইবাড়ির হেফাজতে। তাঁর দেখা মিলল না; তবে, দেখলাম গোবিন্দের মুখমণ্ডল, দেখলাম গোপীনাথের বক্ষঃস্থল। আধ-মানুষ সমান উঁচু কালো পাথরের নিটোল মূর্তি দুটি।

রাজভোগে রাজসুখে আছেন, এঁরা। সুগন্ধি পুষ্পচন্দনে সাজেন, আতর গোলাপজলের ফোয়ারায় স্নান করেন, নানা বস্ত্রালংকারে নিত্য নবরূপ ধারণ করেন।

দোরে নুয়ে প'ড়ে মাথা ঠেকালাম। দেখব-দেখব সাধ ছিল, দেখার শান্তি হল।

বড়দি বললেন, 'গোবিন্দের সন্ধ্যারতি হবে, তা দেখেই যাই।'

দোরের পাশ ঘেঁষে বসে পড়লেন বড়দি। আমিও বসি তাঁর পিছনে। আরতি দেখতে কত নারী পুরুষ জমা হল এসে। দুজন মণিপুরী খোল বাজিয়ে কীর্তন গাইতে লাগল সামনে। গানের সুরের সঙ্গে সমস্ত শরীর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে হাত-পা তোলে—যেন হাওয়ায় পা ফেলে হেঁটে চলে।

দুটি মারোয়াড়ি মেয়ে সেই তখন হতে দু হাতে মন্দিরের শ্বেতপাথরের চৌকাঠ টিপছে, যেন গোবিন্দেরই পদসেবা করে ধন্য হচ্ছে।

কোনায় হাজার টুকরো কাঠ গাঁথা প্রকাণ্ড জপের মালা মেঝেতে ছড়িয়ে জপ করে চলেছে বুড়ো এক।

জরির চাদর গলায় ঝুলিয়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি কজনা। আরতির শেষে আশীর্বাদী তুলসীচন্দন নিয়ে চলে গেলেন তাঁরা।

পুরোহিত শান্তিজল ছিটোলেন সবার গায়ে। প্রসাদ বিতরণ করলেন হাতে হাতে।

তার পর গোবিন্দকে আড়াল করে নিলেন দু পাশের ভারি পর্দা টেনে দিয়ে।

উঠে পড়লাম।

মন্দির পেরিয়ে আধো-আলো আধো-ছায়া-ঘন নিমগাছটার তলা দিয়ে যাচ্ছি, আবেশে বিভোর বড়দি দু হাতের মুঠিতে চাপা গরদের আঁচল এগিয়ে এনে আমার মাথায় ছোঁয়ালেন। বললেন, 'এ কী পেলাম আমি! এও কি সম্ভব?' ব'লে সেই আঁচলভরা মুঠি বুকে চেপে ধরলেন।

কী পেয়েছেন তা জানি আমি। পর্দা টেনে দেবার সময় পুজারীর কী মনে হল—গোবিন্দের গলায় দুলছিল একটি জুঁইয়ের গোড়ে, সেইটে খুলে এক ফাঁকে ঝপ্ করে চোখ-বুজে-বসা বড়দির কোলে-পাতা আঁচলখানিতে ফেলে দিলেন। আর দিলেন প্রসাদী আতরের ফায়া একগাছি সেইসঙ্গে।

তীর্থবারি

দিল্লি হয়ে ফিরে এলাম আবার হরিদ্বারে। এবার আর কোনো কথা নয় ; পাঁজিপুঁথি দিনক্ষণ দেখা নির্ভুল যোগ পূর্ণকুম্ভ-স্নানের।

এ কদিনে গোটা হরিদ্বার-কনখলের রূপই বদলে গেছে। চার দিকে জাঁক-জমক, হৈচৈ, যাত্রীসাধুর ঠাসাঠাসি, আনন্দ-উত্তেজনার ঢেউ—যেন বিয়ে-বাড়ির অধিবাস, উৎসবের ভোররাত্রি।

গাছে গাছে কচি পাতা, আমের পল্লবে নতুন বোল, লাল ফুলে ছেয়ে গেছে রাস্তার পাশের ঝির্‌ঝিরে পাতা-ঝুলে-পড়া ঝাপ্‌ড়া গাছগুলি।

পরের দিন ভোর না হতে চলে আসি হরিদ্বারে।

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেদ্‌ যোগঃ কুম্ভনাম তদোত্তমঃ॥

আজ সেই কুম্ভযোগ পুণ্যস্নানের ; সূর্য মেষরাশিতে ও বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে অবস্থান করছেন।

আগেভাগে গঙ্গাস্নান করে এসে বসি হরকি পৌড়ীতে। সামনাসামনি বসে সাধুদের স্নান দেখব সেই দিনের শিবরাত্রির স্নানের মতো—মনে বাসনা। সেদিনও তো এখানে বসেই দেখেছিলাম ; কিন্তু ঢুকতে কী বেগই না পেতে হয়েছিল। আজ তাই ফন্দি এঁটে আগে হতেই ঢুকে বসে আছি। আর আমাদের পায় কে? দলে এবার আমরা বেশ ভারী। মণিবাহাদুর আবার ফিরে এসেছেন, বোধ হয় রেবাদির তাড়নায় ; মাসিমাও সঙ্গে আছেন, আর আছেন রেবাদির আরও দুই ভাই বোন। সেবাশ্রমের দু দল যাত্রীও সঙ্গ নিয়েছেন আমাদের। সকলে মিলে জমাট বেঁধে বসেছি ; আর আমাদের ভাবনা কী? চার ঘণ্টা ছ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিতে আর কত লাগে। তার পরে তো সাধুদের স্নান আরম্ভ হয়ে যাবে, চোখের সামনে পলকে পলকে দৃশ্যপট বদলাতে থাকবে, তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে সন্ধে উতরে দেব। কিন্তু কেমন খিদে খিদে পাচ্ছে যেন। কিছু খাবার, নিদেন কয়েকটা ফল-পাকুড় সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী ছিল?

পাশে দুই পাঞ্জাবি মেয়ে বসে বসে পুরী তরকারি খাচ্ছে।

বড়দি বললেন, 'তাকিয়ো না তো ওদিকে। ঐ দেখে দেখেই তোমার খিদে পেয়ে যাচ্ছে।'

উঠে দাঁড়াই ; বলি, 'তবে আমার জায়গা রেখে দিয়ো, আমি ঘুরে আসি খানিক।'

ঘাটে তিলধারণের স্থান নেই। আজ এমন দিনে কত কত লোকের আপ্রাণ আকাঙ্ক্ষা—স্নান করবে এখানে। কী পরম বিশ্বাস! জলে নেমে একটা ডুব দিলেই কী এমন পুণ্য হয়! হংসদেব বলেছিলেন, 'বিশ্বাস থাকলে সবই হয়।' ধনী দরিদ্র আজ পাশাপাশি এক ঘাটে নামে, পাণ্ডার একই ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর বসে, একই ঝুড়িতে রাখা যে যার শুক্‌নো কাপড় ঝেড়ে নিয়ে স্নানান্তে গায়ে পরে।

ঘড়া ঘড়া দুধ ঢেলে গঙ্গাকে খাওয়ায় দলে দলে লোক, বৃদ্ধা মাকে পিঠে করে

এনে তর্পণ করায় সমর্থ ছেলে, স্নানের শেষে আঁজলা করে জল এনে মাথায় ছোঁয়ায় মা তার তিন মাসের কচি শিশুর। আজকের এই কল্যাণমুহূর্তে কল্যাণ হোক সকলের। কল্যাণকামনায় ভরে যায় বুক, মনে ভেসে ওঠে প্রিয়পরিজন ; ভাসে একখানি মুখ।

ফিরে আসি নিজের জায়গায়।

বড়দি বললেন, 'দেখলে না তুমি, দুই স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বুক-জলে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে অঞ্জলি ভরে জল তুলে তুলে তর্পণ করল। তর্পণ-শেষে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে দুজন দুজনকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে পাড়ে উঠে এল। কী এক অপার্থিব তৃপ্তির হাসি ছিল লেগে তাদের মুখে। কী মধুর!'

'হটো হটো', 'ওঠো ওঠো' রবে চার দিক হতে তাড়া লাগল। সন্ত্রস্ত ভিড় চঞ্চল হয়ে এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। বসতে দেবে না কাউকে। কে উঠতে বলছে? উঠবই বা কেন? গতবার তো বসেছিলাম এখানেই সবাই।

গতবারে আর এবারে তফাত অনেক। এ-ঘাটে ও-ঘাটে একটি জনপ্রাণীও থাকতে পাবে না। সাধুদের আসবার সময় হয়েছে। ঘাট খালি করে দিতে হবে। পুলিশ, সার্জেণ্ট ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু যাই কোথায়?

ভিড় ঠেলে দেয় একমুখী।

তারই চাপে চলতে চলতে দেখি, পুল পেরিয়ে চলে এসেছি গঙ্গার অপর পারে। এসেছি তো এসেইছি, আর ফিরবার উপায় নেই। ও-মুখী যাবার পথই বন্ধ।

নিরুপায় আমরা তাকাই বারে বারে। অমন জানলে হরকি পৌড়ীতে না হোক, কাছাকাছি কোথাও জায়গা বেছে নিতাম।

গঙ্গার এপার জুড়ে মস্ত মেলা—বাজার, দোকান, সার্কাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, সেবা-বিভাগ, এক্‌জিবিশন, পুলিশ-স্টেশন, গান্ধীর জবানি লাউডস্পীকারে—কত কী। কন্‌খলে গঙ্গা পেরিয়ে সাধুদের শোভাযাত্রাও যাবে এ-পথ দিয়েই ব্রহ্মকুণ্ডে।

বাদ্যভাণ্ডের তূর্যনাদে লক্ষ লোকের কোলাহল চাপা পড়ে। এসে পড়েন সাধুরা। দু মাইল জোড়া পথ ঠাসা শোভাযাত্রা। যেন রণযাত্রা। হাতি ঘোড়া উট মোটর চতুর্দোলা সিংহাসন পতাকা মালা ছাতা চামর—সে এক বিরাট ব্যাপার। এক কল্পনাতীত দৃশ্য। এত সন্ন্যাসীর একত্র সমাবেশ—এঁরা সব ছিলেন কোথায় এই হরিদ্বারে ছড়িয়ে?

নাগা—নাগাই বা কত, অফুরন্ত। কালো কালো গায়ে হলুদ গাঁদার মালা, পিঠে খোলা জটা, পিল্‌ পিল্‌ করে চলেছে সব। কী সুন্দর লাগে দেখতে। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, মেয়ে সন্ন্যাসী, মহান্ত, মণ্ডলেশ্বর, বিগ্রহদেবতা—শোভাযাত্রার কী অপূর্ব বাহার। চলেছে তো চলেইছে, শেষ নেই। শুক্‌নো বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ নরনারী অধীর আগ্রহে দেখছি তাঁদের।

হঠাৎ খেয়াল হয়—যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হল নীল ধারার শুক্‌নো নালা। কাঠের পাটাতন শিকলে বেঁধে গঙ্গার মুখ বন্ধ করেছে এখানে। তাকিয়ে

তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি, একটা পাটাতন খুলে যায় যদি কোনোমতে—কী কাণ্ড হয় তা হলে! আমি কী করব? ঐ-যে কাঠের স্তূপ ফেলা আছে সামনে, তার উপরে দৌড়ে গিয়ে উঠব। কাঠ তো ভাসিয়ে নেবে আগেই। তবে? ঐ পাথর-গুলির উপর। উঁহু, তাও তো ডুবে যাবে। তা হলে ছুটে যাব সকলের আগে ঐ দূরে, যেখানে বালি শেষ হয়ে সবুজ ঘাসের রেখা দেখা যায়—খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠি আপন মনে। হায়, পলকে যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে, সময় দেবে কোথায়?

বড়দি বললেন, 'ঐ দেখো দেখো। কার মোটর যেন বালিতে আটকে গেল। কে নেমে পড়ল—মহানন্দজি না? হেঁটেই চললেন? আহা, বুড়ো মানুষ পারবেন কি অতটা পথ—'

এ-পুল সে-পুল করে গঙ্গার সব কটা পুলের কাছে গিয়ে ধস্তাধস্তি করতে করতে বিকেল নাগাদ এসে পেঁছিই ফিরে এই পারে।

তখনো চলেছে সাধুদের স্নান সমানে। একদল যায়, আর দল আসে। পুলিশ গলদ্‌ঘর্ম। গঙ্গার বুকে বাঁধানো চাতাল দিয়ে স্নানশেষে ফিরে যায় দল; মাঝখানে লম্বা ফাঁকা পথ ছেড়ে দিয়ে যাত্রীরা ঠেসে বসে আছে সকাল হতে সাধুদর্শন-আকাঙ্ক্ষায়।

ঠেলেঠুলে জায়গা নিয়ে দাঁড়াই এক পাশে। কয়েকটি গুজরাটি প্রৌঢ়া—বোধ হয় বসে আছেন সেই সকাল হতে; মুখ চোখ বসে গেছে রোদে তাতে কালো হয়ে। বড়ো বড়ো চোখ দাঁত-উঁচু মহিলাটি ঢুলছিলেন সামনে ঝুঁকে। সাধুর দল এসে পড়তে পাশের সঙ্গিনী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে দিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি হাতের-মুঠোয়-চেপে-ধরা ঝলসানো ফুলগুলি ছুঁড়ে ফেললেন পথে। সাধুরা চলে যেতে তাঁদের পায়ে মাড়ানো থেঁত্‌লানো ফুল আঁচলে বেঁধে রেখে আবার কোঁচড় থেকে একমুঠো ফুল নিয়ে বসে রইলেন আর-এক দলের অপেক্ষায়।

সাধুদের স্নানের পরে পবিত্র গঙ্গায় স্নান করবার শখ ছিল বড়দির, কিন্তু আশা ছিল না। 'আশা' থাকলে বোধ হয় মিটতও না, 'শখ' বলেই ঘটল। ঠেলাঠেলির ধাক্কায় কী করে যে এসে ঠেকলাম ব্রহ্মকুণ্ডের সিঁড়িতে—নিজেই অবাক মানি। বড়দিকে বলি, 'নেমে পড়ো যেমন আছ। কাপড় বদলাবার হাঙ্গামা কোরো না।' বলতে বলতে আমিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

সারা দিনের ধুলো রোদ ক্লান্তি তেষ্টা, সব ধুয়ে গেল। ঠাণ্ডা জল—কত সুমধুর। মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে স্নান করি। একটা আধফোটা কুন্দকুঁড়ি ভাসতে ভাসতে এসে শাড়ির আঁচলে ঠেকে। উঠে আসি পাড়ে। স্নিগ্ধ দেহ মন।

সামনের উঁচু পাহাড়ের মাথায় মনসাদেবীর মন্দিরের চূড়ার পিছনের মেঘখানিতে রঙ লাগে সূর্যাস্তের।

গঙ্গার পাড় ধরে ধীরপদে হেঁটে ফিরি। ভোলাগিরির আশ্রম পেরিয়ে কাঁচা রাস্তার মাঝে শুকনো একটা নালা এসে মিলেছে; সাবধানে পা ফেলছি—'গেল, গেল, কার কাপড় গেল,' ব'লে বড়দি ঘুরে এগিয়ে যান জলে।

মোটা খেরোর বুটিদার ঘাগরা এক ভাসে স্রোতের মুখে।

তিন-চার জন পুরুষ খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল হাঁটু-জলে। বড়দি আঙুল

বাড়িয়ে ঘাগরা দেখাতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ান। মৃতার ঘাগরা আগেই ভাসিয়ে দিয়েছে, এবার তারা নির্বাক দৃষ্টিতে বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে ধরাধরি করে এক বস্তা চিতাভস্মও ঢেলে দিল গঙ্গাতে।

তাঁবুর ভিতরে বসে বসে কাঠের সিঁড়িতে আলপনা আঁকছি এলামাটি, গেরিমাটি, পিটুড়ি, সিঁদুরের বাটি সামনে সাজিয়ে। সেদিন রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গেল; নানা ফুলের গোড়ে তোড়া দিয়ে সাজানো হল আসন। তবু দেখে দেখে মনে হচ্ছিল, একটু যদি আলপনা থাকত সামনে তো সর্বাঙ্গসুন্দর হত। দেখি আর ভাবি, দিতে তো পারি আলপনা বড়দিতে আমাতে মিলে, কিন্তু নারীবিবর্জিত এই-যে জায়গা—পুরুষের কঠিন হাত সগৌরবে নিপুণভাবে ক্ষুণ্ণ করে মেয়েলি-হাতের প্রয়োজনকে। মনে মনে হার মানি আর জ্বালা অনুভব করি। ভোগের আলুভাজা হল সেদিন, মিহিসুতো তুলনায় আসে। একটি নয়, দুটি নয়, শতেক লোকের পাতে পড়ল ভাজা। শক্ত হাতে এ সূক্ষ্মতা আসে কোথা হতে? রঙ মিলিয়ে কোমল ফুলে গাঁথা মালা দু বেলা দোলে ঠাকুরের গলায়। ডাক পড়ে না কোনো কাজে—অভিমান জাগে। বহু ইতস্তত করে জানাই আলপনার কথাটা। আশ্চর্য, আপত্তি ওঠে না। মহা উৎসাহে বড়দি বেটে আনলেন ভেজানো আতপ চাল; বললেন, 'দাও এবারে মনের সাধে লাল মেঝেতে সাদা গোলা দিয়ে আলপনা।' দিয়েছিলাম। ছিলও ছ-সাত দিন; মোছে নি কেউ। এবার যাবার সময় খেয়াল হয়েছে শশী মহারাজের, স্থায়ী কিছু করিয়ে রাখবার। মিস্ত্রি ডাকিয়ে পাইন কাঠ, কাঁঠাল কাঠ জুড়ে মস্ত এক পিঁড়ি বানিয়ে দিয়ে গেছেন খানিক আগে।

দুদিন মাত্র সময় হাতে; শেষ করতেই হবে। ঘাড় গুঁজে বসে গিয়েছি কাজে। মেঘলা করে আছে আজ সকাল হতে। ভালোই; কেউ বের হবেন না আমাকে একলা ফেলে। নয়তো খুঁত খুঁত করত মন।

কাল গিয়েছিলাম ঋষিকুমারের কাছে, গঙ্গার ওপারে। শিক্ষিত পণ্ডিত-সাধু। গুজরাটি। পাটনা ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েট ছেলে, বেরিয়ে গেলেন সংসার ছেড়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে। সে কতকালের কথা। ছাইমাখা, মাথা-ভরা জটাজুট নিয়ে এখন বসে আছেন বালির চড়ায় ধুনি জ্বালিয়ে। দেখে কে বলবে এঁর তফাত কোথায়? আলাপ হয়েছিল এখানেই একদিন? প্রভাদির শক্ত হাঁপানি, কে যেন খবর পেয়ে নিয়ে এল ঋষিকুমারকে। ইনি ওষুধও দেন রোগীদের, গাছগাছড়া শিকড়বাকড় বন হতে সংগ্রহ করে; বলেন, 'এও একরকম জীবসেবা।'

ঋষিকুমারের কথাগুলি বেশ—সহজ, বোধগম্য। বলেন, 'ঈশ্বর কী? শংকরাচার্য, নিতাই, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সবার মনে এই প্রশ্নই জেগেছিল—আমি কে? মায়া কী? ব্রহ্ম কে? উপনিষৎ বলেছেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সর্বত্রই এক ব্রহ্ম ব্যাপক। কিন্তু তাঁর কথা বলা যত সহজ, অনুভব করা তত সহজ নয়। কারণ ঈশ্বরকে জানতে হলে আগে নিজেকে জানতে হবে।

শংকরাচার্য সংসার ত্যাগ করে গুরু-অন্বেষণে বের হলেন। গুরু ছিলেন ঘরের ভিতর। শংকরাচার্য দরজায় ধাক্কা দিলেন। গুরু হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৌন্-হ্যায়—কে তুমি? শংকরাচার্য বললেন, আমি কে তাই যদি জানব তো তোমার কাছে এসেছি কীজন্য? শুনে গুরু হেসে বাইরে এসে শংকরাচার্যকে আলিঙ্গনবন্ধ করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

'আত্মজ্ঞান লাভ হলে ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান আত্মার আত্মা—পরমাত্মা। যাঁর ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ হয় তাঁর আচরণ অপূর্ব।

'নামদেব একদিন সারাদিনের ভিক্ষার পর কয়েকখানা রুটি বানালেন, ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাবেন। রুটি সেঁকা হলে ঘরে উঠে গেলেন একটু ঘি আনতে। এই ফাঁকে একটা কুকুর এসে রুটি কখানা খেয়ে নিল। নামদেব ঘি নিয়ে এসে ব্যাপার দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন, আরে প্রভু, তোমার আজ এত খিদেই পেয়েছে যে রুটিতে ঘি মাখাবারও সবুর সইল না?'

ঋষিকুমার বলেন, 'কলিতে নামই একমাত্র আধার।'

'য়হ কলি ন ধরম বিবেকু,
রাম নাম অবলম্বন একু॥'

'নাম জপ করো সবাই। জান না কি এই নামের প্রতি "নামী"র অত্যন্ত প্রীতি। যেখানে নাম হয় "নামী" সেখানে যাবেনই যাবেন। না গিয়ে পারেন না।

'ধরুন না, এই তো এখানে এত লোক আছে; কিন্তু আমি যখন "দত্তজি" বলে ডাকব তখনই আপনি সাড়া দেবেন তো? ঠিক ঐভাবে ভগবানকে নাম ধরে ডাকলে তিনি সেইভাবেই সাড়া দেন। রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"তেও এই কথাই তিনি বলে গেছেন।' বলতে বলতে ঋষিকুমারের গলার স্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। বলেন, 'এ জগতে জন্মগ্রহণ করার পর সকলেই একবার-না-একবার ভগবদ্দর্শন পায়। তবে সে হয়তো চিনতে পারে না। এই চিনে নেবার জন্যই কলিতে সহজ উপায় নামজপ ও সাধুসঙ্গ। সাধুদর্শনেও পুণ্য। আর পুণ্যের ফললাভও আছে বৈকি।'

মনে পড়ল, শুনেছিলাম উদাসীবাবার কথা। এই হরিদ্বারেই থাকতেন তিনি; নানকপন্থী বৃদ্ধ সাধু। বড়ো বড়ো মহাত্মারা বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন তাঁকে, গণ্য করতেন বড়ো সাধু বলে।

উদাসীবাবা বহুরূপীর মতো এক-একদিন এক-এক অদ্ভুত সাজে সেজে ঘুরে বেড়াতেন গঙ্গার ধারে বাঁধানো চত্বরে। কোনোদিন পরতেন বহুমূল্য রেশমের রঙিন আলখাল্লা, জুতো মোজা, পায়ে ঘুঙুর, মাথায় ময়ূরপাখার দেড়হাত উঁচু উষ্ণীষ; কোনোদিন থাকতেন কালো রঙের পোশাকে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে। বৃদ্ধ সাধুর এই অপূর্ব বেশ দেখে বহু লোক আকৃষ্ট হয়ে ছুটত পিছনে পিছনে। মজাও লাগত তাদের। লজ্জার অতীত না হলে কেউ চলতে পারে রাজপথে এই সাজে হাসিমুখে? একজন শুধোল, 'বাবা, তুমি এইরকম বিদ্‌ঘুটে বেশ কেন পর?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এত ভিড়ের মধ্যে প্রকৃত সাধুদর্শন ঘটে ওঠে না সকলের। সাধুকে চিনে নেওয়া বড়ো কঠিন। আমি তাই এই ভাবে ঘুরে বেড়াই, যাতে সহজে নজর পড়ে সকলের; আর তারা সাধুদর্শনের পুণ্যলাভ করে সেইসঙ্গে।'

ঋষিকুমারের স্কেচ করছিলাম একটা, গল্প শুনতে শুনতে। বললাম, একটা

সই দিতে তাতে। কলম ছিল না আমার সঙ্গে। ঋষিকুমার বাঘছালের নীচ হতে পুঁটলি বের করে দোয়াত কলম বের করলেন। ফাউন্‌টেনপেনই ছিল এটা এককালে; এখন কালিতে ডুবিয়ে লিখতে হয়। লিখবার সময় বালি কির্‌ কির্‌ করে উঠল নিবের মুখে।

সামনে পড়েছিল ঝক্‌ঝকে একটা খোলা টাঙ্গি। বৈরাগী সাধুর আবার এসবের দরকার কী? অশোভন লাগে চোখে। হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে তাই ভাবি আপন মনে। ঋষিকুমার বুঝতে পেরে হাসলেন, বললেন, 'বনে জঙ্গলে থাকি; শাস্ত্র যখন কাজ না দেয় তখন শস্ত্র লাগে শুভ কাজে।'

সাদা রঙটা যতই লাগাই, হয় না মনের মতো। পাইন-কাঠের তেলে মিলিয়ে ফেলে খড়িমাটির জেল্লা। সাদা পদ্মের পাপড়িই যদি না ফুটল তো বাহার খুলবে কী করে? মানিক যাচ্ছিল তাঁবুর সামনে দিয়ে। ডেকে বললাম, 'হাসপাতালে জিঙ্ক্‌অক্সাইড থাকে ওষুধে মেলাতে। তাই আনো তো খানিক, গুঁদে গুলে দেখি কাঠে ধরাতে পারি কি না।'

মানিক এনে দেয় কাগজে মুড়ে; বলে, 'ওঁরা তো বললেন, জলে এ গুলবে না, তেল ছাড়া।'

হাতের তেলোয় একটু তুলে নিয়ে আঠা মিশিয়ে ঘষে দেখি, বাঃ, এই তো মিশ খায়—বেশ কাজ চলবে। খুশি হয়ে পিঁড়িতে সাদা রঙ চাপাই। ঋষিকুমারের কথা কানে বাজে, 'তেরি ভাবনা বড়া বিচিত্র হ্যায়। ভগবান অন্তরে আছেন, বাদলছায়া সূর্যকে দেখতে দেয় না।'

আমাদের তাঁবুর সামনাসামনি বসুমতী-মার ছোট্ট তাঁবু। তাকালেই সোজাসুজি দেখা যায় তাঁকে। এই নামেই সবাই ডাকেন তাঁকে এখানে। জীর্ণ একখানা কেটের ধুতি পরনে; গায়ে সামান্য সুতির চাদর; বসে আছেন এক ঠাঁই একভাবে সারাক্ষণ আগুনের একটা ছোটো মালসা কোলে টেনে। ভোর তিনটেয় উঠে দেখি অমনি; রাত বারোটায় যদি তাকাই কখনো, তখনো ঠিক ঐ এক ভঙ্গি। ঘুমোন না কি কখনো? মাটিতে বিছানো চাটাইয়ের এক ধারে ছেঁড়া একখানা কম্বল পাতা, বিছানা বলতে ঐ যা। আর কিছুর বালাই নেই। দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টার বাইশ ঘণ্টা বসে বসে এক-মনে জপ ধ্যান করে ঘণ্টা দুই ঐ বিছানায় আশ্রয় নেন—কখন কেউ টের পায় না মোটে।

বড়দি বলেন, 'একবার দেখো খেয়াল করে; এমন প্রণাম দেখি নি কখনো। নিজেকে কিভাবে লুটিয়ে দিয়ে প্রণাম করেন বসুমতী-মা—সেদিন রাতে পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম তাঁবুর ফাঁক দিয়ে।'

শশীমহারাজ বললেন বড়দিকে, 'এই দেখুন বসুমতী-মার অবস্থা। বসুমতী কাগজের উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইনি। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। ছেলে সতীশ মুখোপাধ্যায়, নাতি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সোনার সংসার। রাজরানী রাজমাতা একাধারে। কিন্তু কী কপাল! স্বামী মরল, সেই একমাত্র ছেলের ঘরের একমাত্র নাতি মরল, ছেলে মরল, ছেলের বউ মরল। সর্বহারা বিধবা বুড়ি কেবল ঠাকুরের নাম সম্বল করে বেঁচে রইলেন। স্বামী মারা গিয়ে অবধি আহার ছেড়ে

দিয়েছেন। সারা দিনের পর রাত বারোটা-একটায় এক বাটি দুধ আর দুটো কলা খান খালি। কিসের এ'র অভাব? ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। তবু ইনি পথের ভিখারিনী। এই তো সংসার। চোখের সামনে এতবড়ো শিক্ষা, এ থেকে ফললাভ করুন আপনারা।'

যশোরের দিদি চেনেন ভালো করে বসুমতী-মাকে; বললেন, 'নাত-বউ দামি কম্বল কিনে দিছে ঠাকুরমাকে, তা সেডা উনি বাড়িতে দারোয়ানের জিম্মে করে আসিছেন। এখন দেখো-না, কেমন ছেঁড়াছুড়া নিয়ে আতুরঘরের মতো আগুন জাপ্‌টে বসি আছেন।'

'যশোরের দিদি'—এই বলেই ডাকি আমরা তাঁকে। কালো মুখখানি সদা হাসিখুশিতে ভরা। লাল সিঁদুরের টিপ টক্ টক্ করে কপালে। মাঝ-বয়সী, লম্বা দোহারা দেহ। বড়ো ভালো লাগে তাঁকে আমাদের। স্বামীর সঙ্গে এসেছেন তীর্থ করতে। স্বামীর সঙ্গে তিনি ঠিক আসেন নি; বলেন, 'ও বুড়োডা কি আমাকে নিয়ে বার হবে কোথাও? নিজে নিজেই এ-তীর্থ সে-তীর্থ করবে। আমাকে বলবে, তুমি পরে করবা, ছেলেরা তোমাকে তীর্থ করাবে। বলি, নিজে আল্‌গা দিয়া বেড়াবা, আর ছেলেদের ঘাড়ে আমাকে চাপাবা—কেনে হবে সেডা। এবারে আমিই স্বামীজিদের বলে আসা ঠিক করলাম; তাঁকে কলাম, চলো, আমাকে নিয়ে তো তুমি যাবা না, আমিই তোমাকে নিয়ে যাই চলো, তীর্থ করায়ে আনি।'

যশোরের দিদি প্রায়ই গিয়ে বসেন বসুমতী-মার কাছে; নানা গল্প শোনেন। বলেন, 'এত বলি, একবার পা'ডা ছুঁতে দাও মা, একবার প্রণাম করি। তা বুড়ির এমনই ছুঁত্‌বাই, তাড়াতাড়ি পা টানি নিয়ে ঢাকা দেবে। বলবে, স্নানের সময় ছুঁবা। বুড়ি নিজেই কন যে, দেখো, ঊনপঞ্চাশ বায়ুরই ওষুধ আছে; ওষুধ নাই কেবল দুডার—নেঙিগবাই আর শুচিবাইয়ের।'

শুনেছি সেদিন আমিও, বলছিলেন বসুমতী-মা, 'এই শুচিবাই নিয়ে কি কম জ্বালিয়েছি আমি? একদিন কর্তা ভাত খাচ্ছেন, হাঁচতে গিয়ে মুখের একটা ভাত কোথায় ছিট্‌কে পড়ল। তিনদিন ধরে সেই একটা ভাত খুঁজে ঘরের সব তোলপাড় করলুম, পেলুম না। আর একবার ধোপাবাড়িতে কাপড় দেব, আল্‌না থেকে কোট নামিয়ে দেখি, কর্তার কোটে হলুদের দাগ। কদিন আগে এই কোট গায়ে দিয়ে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন; তরকারি পড়েছিল হয়তো। হায় হায়, এই কোট আমি আলনাতে তুলেছিনু—ছিষ্টি এঁটো হয়ে গেল। সব টেনে টেনে ধোয়ানু, তবু মনের খুঁৎখুতুনি যায় না। আমার এই "বাই" নিয়ে কেউ কিছু বললে কর্তা বলতেন, থাক্ থাক্ কিছু বোলো না ওকে। ও হতেই আমার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা; আর ওর এই বাইটুকু আমরা সইতে পারব না?'

বলি, 'আর নেঙিগবাইটা কী?'

বসুমতী-মা বললেন, 'ওটাও একটা সাংঘাতিক বাই। যার ধরে আর যায় না। নেঙিগবাই হল, বউকে সন্দেহ করা; "এই বুঝি সে ও দিকে তাকাল", "এই বুঝি সে কার দিকে চেয়ে হাসল"—এই আর-কি। তাই বলি, এ দুয়ের আর ওষুধ নেই।'

যশোরের দিদি এসে বসলেন গা ঘেঁষে। বললেন, 'সক্কাল বেলা বলতে আলাম—পতিনিন্দে হবে না তো?'

বলি, 'পতিনিন্দে কী? পতিকীর্তন বলুন, তবেই দোষ কেটে যাবে।'

একমুখ হেসে যশোরের দিদি সায় দিয়ে ওঠেন, 'বেশ বেশ, পতিকীর্তনই করি একডু; পুণ্যি হবে তীর্থস্থানে। কী আর কব বুড়োডার কথা! সকালে স্নান তো করি আলাম দক্ষঘাট হতি। ঠান্ডা জল; বুড়া কি নামতে চায়? কলাম, আমার হাত ধরি থাকো শক্ত করি। অবশ হয়ে পড়লে আমি ধরে তুলবো নে। অতিকষ্টে তো তাকে স্নান করালাম। এখানে আসি তাড়াতাড়ি কাপড়ডি রোদে মেলি দিয়ে চলল সে সোজা ঠাকুরমন্দিরে। বলি, একটু সবুর করো, আমিও আসি তোমার সাথে। সে বলে, না, তুমি পরে আসবা, সাধুদের সামনে তোমারে লয়ে চলতি আমার লজ্জা লাগে। বলি, ওঃ, আমারে লয়ে চলতি তোমার লজ্জা লাগে? ভাব বুঝি সাধুরা জানে না কিছু? আমি ঐ সাধুদের ডাকি বলি দিছি যে—ঐ যে বুড়োডা দেখ, আমি তার পরিবার; আর আমাদের বারোডি সন্তান। নাও, এবার সাধুদের কাছে তোমার সাধুগিরি ফলাও গা ভালো করি।'

মেঘে বাদলে আঁধার চার দিক। আলো কমে আসে তাঁবুর ভিতরে। পিঁড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাই দরজার কাছে। তাতেও সুবিধে হয় না। বৃষ্টির ফোঁটার ছিটে এসে পড়েছে কাঠে। একে শীত, তায় জোলো হাওয়া। হাতের আঙুল কুঁকড়ে আসে ঠান্ডায়। মোটা শাল গায়ে দিয়ে মোটা কম্বলের গালিচা বানিয়ে বসি ঢেকে-ঢুকে; আর বারে বারে মনে হতে থাকে, না জানি কী করছে সাধুরা, গঙ্গার ওপারে, খালি গায়ে খোলা জায়গায় বসে।

শুনি, গায়ে যে তারা ছাই মাখে তাতে শীত আটকায় খানিকটা; কিন্তু বৃষ্টির জলে তা ধুয়েও তো যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

বড়দি বললেন, 'দেখো, সেদিন আমাদের সামনেই সেই সাধু গাঁজা খেলেন। দেখে মনটা কত বিগড়ে গেল। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, না খেয়ে করবে কী? এই দেহটার উপর দিয়ে এত-যে সব সহ্য করাবে, একটা কিছু কড়া উপকরণ চাই তো?'

শুনেছি, কেবল গাঁজা নয়; নানারকম ওষুধও খায় সাধুরা। শোনা কথা, দেখা নয়। এমনও শুনি, 'সংখিয়া' খায় এঁরা। সংখিয়া-পোড়ানো একটু ছাই খেলে এই শীতেও মনে হবে গঙ্গার জলে ডুবে থাকি। এত গরম হয়ে ওঠে শরীর।

বড়দি বললেন, 'আরো একটা কথা ভাবি। আমরা সামান্য কারণে দেখো কত উতলা হই; একদিন চিঠি পেতে দেরি হলে রাতে ঘুম হয় না। সংসারের পাঁচ মন নিয়ে আমরা যেমন আঁকড়ে আছি, এঁরাও তো তাই ছিল একদিন। সেসব ভুলে এঁদের থাকতে হবে। মায়া কাটানো কি সহজ? মনকে আয়ত্তে আনা বড়ো কঠিন কাজ।'

শশী মহারাজ বললেন, 'মনের কথা আর বলবেন না। এই ধরুন আজ ছত্রিশ বছর এই পথে আছি, তবু কি মনকে বাগে আনতে পেরেছি? কী বলব, সেই কবে কোন্ ছেলেবেলায়, আট-ন বছর বয়সে কার বাগান থেকে আম চুরি করেছিলাম, সেদিনও রাত্রে সে ঘটনা স্বপ্নে দেখি।

'মন বড়ো সাংঘাতিক জিনিস। সাধু হলেই যে মন হাতের মুঠোয় থাকে তা নয়। কত সময়ে মনকে বশে আনতে পারি না ; সত্যি বলি, জপে তপে আলস্য লাগে। তখন করি কী—গোটা গীতাটা মুখস্থ করে রেখেছি, তাই আওড়াতে থাকি। আওড়াতে আওড়াতে মনটা এক সময়ে স্থির হয়ে ধরা দেয় ; তখন জপে বসি। তাই বলছিলাম, গীতাটা মুখস্থ করে রাখুন, দেখবেন কত কাজ দেবে। যখনই মন বিচলিত হবে, গীতা আওড়াবেন। আমাদের পূজা-অর্চনাও তাই—মনকে বশে আনা। ফুল দিলাম, বেলপাতা দিলাম, চন্দন ঘষলাম ; নিজেকে শুদ্ধ করলাম। এগুলি আর-কিছু নয়, মনকে এক জায়গায় স্থির করে আনবার পথ মাত্র।'

মনে করতাম, লোকেরা সাধু হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে আসে, মনকে নিয়ে বিব্রত হয় না আর আমাদের মতো প্রতিক্ষণে।

সেদিন সতীকুণ্ডে সন্ধেবেলা নির্জন বনের অন্ধকার ছায়ায় বসে এই কথাই মনে হচ্ছিল। তাই বলেছিলাম গোপেশ্বর মহারাজকে যে, 'আপনারা এমন-সব জায়গায় থাকেন মন যেখানে আপনি স্থির হয় ; গোলযোগ বাধায় না কোনো।'

শুনে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মা গো, যত সহজ ভাব তা নয়। এত বছর কাটালাম, মনের ধস্তাধস্তি থামে কই?'

গুন্‌গুন্ করছে সুর আজ ঘুরেফিরে মনের ভিতরে। একই গানের কটি কলি,

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে ;
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে—
একলা পথে চলা আমার করব রমণীয়।

সেই কবে একদিন শুনেছিলাম এ গান।

হঠাৎ প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। উঠে পড়ি তুলি ফেলে। একটু গান—গান শুনতে হবে। এখনই, এই মুহূর্তে। বড়ো জরুরি।

আশ্চর্য! এখানে এঁরা গান গায় না কেন প্রাণ খুলে? নামগানের সময় তো শুনি গানের গলা অনেকেরই। সাধক এঁরা। গানের তো মস্ত সাধনা। চলতে ফিরতে গানের টানে ভরাট রাখে না সময় কেন তবে?

এক বৃদ্ধ সাধু দাঁড়ালেন সামনে। আজই সকালে এসেছেন এখানে ; সেবা-শ্রমেরই কেউ কি না জানি নে। কেমন একটু অন্য ধরনের। এত লম্বা—মুখ তুলে দেখতে হয় মুখ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কোমরে বাঁশি। বললেন, 'জান মা, এই মালা আর এই বাঁশিই আমার সম্বল। মালায় যখন ক্লান্তি আসে তখন ফুঁ দিই বাঁশিতে।' সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তিনি এসে ঢুকলেন তাঁবুতে। রঙের খুরি টেনে এনেছে তাঁকে দূর হতে।

বড়দি বললেন, 'একখানি কীর্তন শুনি আপনার মুখে।'

তিনি হেসে কোমর হতে বাঁশি হাতে তুলে নিয়ে একটা ফুঁ দিয়েই থেমে গেলেন। হঠাৎ কেমন অসহ্য চাপা দুঃখের ছাপ ফুটল তাঁর মুখে। বড়দির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যদি কীর্তন গাই, সইতে পারবে?'

বড়দি নীরব।

সাধু ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আমগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে আমিও এলাম পিছন পিছন। তিনি বাঁশিতে সুর তুলে ফিরে তাকিয়ে গান ধরলেন—

'কৃষ্ণ হেরি, কৃষ্ণ কই, এক ওই কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে রই।
তবু লোকে বলে আমি কলঙ্কিনী রাই।'

জ্ঞান মহারাজ বড়োই বিচলিত। দেশ থেকে চিঠি এসেছে, গুন্ডারা বাড়ি চড়াও করে ভাই কাকা ভাইপো পিসে সতেরো জনের পৈতে ছিঁড়ে কল্‌মা পড়িয়েছে ; লুটপাট করে সর্বস্ব নিয়েছে। যারা সমর্থ, বউ-ঝি নিয়ে দূর গ্রামে পালিয়েছে ; বৃদ্ধ পিতামাতা পড়ে আছেন ভিটেতে। না আছে যানবাহন, না আছে তাঁদের চলবার ক্ষমতা। ভাই কাকা আকুল হয়ে জানিয়েছে তাই সন্ন্যাসী ছেলেকে, 'তুমি যে করে পার গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে আনো।'

নাড়ির বন্ধন, ভিতর হতে টান পড়ে। সন্ন্যাস তার মর্ম কী জানে?

জ্ঞান মহারাজ এলেন দাদার কাছে পরামর্শ নিতে। মিশনের সাধুরা যাঁরা এই-সব কাজে এগিয়ে গেছেন তাঁরাই জেলের ভিতর বন্দী হয়ে আছেন। এখন উপায় কী?

বসুমতী-মার ঘরে ভিড় করেছেন মহিলারা। পথ দিয়ে আসতে শুনতে পাই কথা, বলছেন বসুমতী-মা, 'ছেলের রূপ কী! নাল টক্ টক্ করে। বাপের মতো চেহারা : ঠিক যেন রাজপুত্তুর। প্রথম নাতি, বড়োলোকের ছেলে—সকলে ব্যতিব্যস্ত, কী নাম রাখা যায়? বললুম, কাশীতুল্য ধাম নেই, রামতুল্য নাম নেই। নাতির নাম রাখনু—রামচন্দ্র।'

কাল রাত থেকে বৃষ্টির বিরাম নেই। তাঁবুর চার পাশের কাপড় ভিজে জল গড়াচ্ছে। আজও বের হবার উপায় নেই বাইরে ; ভালোই একমতে। পিঁড়িটা মেঝেতে পেতে আঁকতে বসে যাই। যে করে হোক শেষ করতেই হবে আজ। নইলে সময় কই হাতে! রামময় মহারাজকে ধরেছি, 'আজ যত ইচ্ছে গল্প শোনান ; হাতে কাজ করি, কানে কথা শুনি।'

রামময় মহারাজ শ্রীমার গল্প জুড়ে দেন খাটে বসে। একে একে তাঁবু ভ'রে যায় লোকে। রঙের আকর্ষণে দ্বারে এসে দাঁড়ায়, গল্পের টানে ভিতরে ঢুকে বসে।

রামময় মহারাজ হাসেন আর বলেন, 'মাকে দেখেছি—তিনি যেন জানতে পারতেন সকলের মনের কথা, আর তাকে ঠিক সেই সেই ভাবে উপদেশ দিতেন। একবার এক মেয়ের মা মাকে লিখেছেন—বোধ হয় উকিলের মেয়ে হবেন—আট-পাতা ঠাসা জেরায়ভরা চিঠি। একটি ছেলে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল, এখন সে বিয়ে করতে চাইছে না। তবে মা একবার বললেই ছেলেটি

বিয়ে করে, ইত্যাদি। মা বললেন, ছেলেটি তো আমায় কিছু লেখে নি, তার মনের ভাব না বুঝে আমি তাকে কী ক'রে আদেশ করব।

'কারো যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে থাকত, মা বলতেন, বেশ তো, বিয়ে কি খারাপ? করবে বৈকি? ঠাকুর আমাকে বিয়ে করেছিলেন। দেখো-না সব দুই দুই—রাম-সীতা দুই, লক্ষ্মী-নারায়ণ দুই, শিব-সতী দুই।

'আবার কারো বিয়ে করবার অনিচ্ছা থাকলে তাতেও খুব খুশি হতেন—ঘুমিয়ে বাঁচবে বাছা। নয়তো আজ ও-ছেলের অসুখ, মেয়েটার কান্নাকাটি, ঝামেলার একশেষ।'

বড়দি বললেন, 'আচ্ছা, শুনেছি মা বিদেশীদের সঙ্গেও কথা বলতেন। তিনি তো ইংরেজি জানতেন না।'

যশোরের দিদি মার শিষ্যা; তিনিও বললেন যে মাকে দেখেছেন এক মেমের সঙ্গে কথা বলতে।

রামময় মহারাজ বললেন, 'সে আর-এক মজা। কী করে যে ওঁরা একে অন্যের কথা বুঝতেন তা ওঁরাই জানেন। কত বিদেশী আসত মার কাছে নানা প্রশ্ন নিয়ে; সঙ্গে অবশ্য দোভাষী থাকত। একবার তো আমিই দোভাষী হয়ে উপস্থিত ছিলাম: কিন্তু মিনিট খানেক যেতে না যেতেই দেখি, প্রশ্নকারী প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই মা উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন; আর সে মাথা নিচু করে শুনছে। দোভাষীর আর মুখ খুলবার সুযোগই হল না। এই তো গুরুদাস মহারাজ—ডাচ ভদ্রলোক—মার মন্ত্রশিষ্য। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, মন্ত্র যে নিলেন, মার কথা বুঝলেন কী করে? তিনি হেসে বলেন, I understood।'

গুরুদাস মহারাজকে তো দেখি রোজ। গেরুয়াতে ঢাকা টকটকে রঙের বৃদ্ধ; দু বেলা আমবাগানের লম্বা পথে খানিক পায়চারি করেন, খানিক রোদেপাতা বেতের চেয়ারে বসে থাকেন। অন্য সাধুরাও এসে ঘিরে বসেন তাঁকে; কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা হয় তাঁদের। সামনাসামনি পড়ে গেলে এগিয়ে কাছে যাই, গুরুদাস মহারাজ চলার পথে থেমে ক্ষণেক দাঁড়ান। প্রণাম করে চলে আসি, উনিও পা বাড়িয়ে সামনে হাঁটেন। সোজা পথের এদিক-ওদিক হয় না কখনো। একটি কথাও হয় নি তাঁর সঙ্গে এখনো পর্যন্ত।

আজ কী জানি কী হল, দূর হতে দেখতে পেয়ে পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে এলেন আপনা হতে। একমুখ হেসে চোখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বললেন, 'শিবো শিবো।'

পরশু রঙিন ফুলে নক্‌শা কেটে সাজিয়েছিলাম ঠাকুরের বেদীর সামনেকার ভিজে মাটি। শুনেছি, ভারি খুশি হয়েছিলেন গুরুদাস মহারাজ দেখে। বলেছিলেন, 'হাতে ঢালা পুজোর মন্ত্র ফুলের পাপড়ির সারিতে। নতুন জিনিস।'

তাই বুঝি তাঁর খুশিটুকু জানিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি এইভাবে।

দুপুরে খাবার আগে ঠাকুরের মন্দিরে বড়দি ঢুকলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। কুয়াশার মতো বৃষ্টি পড়ছে, চোখে দেখা যায় না, মাথার চুল ভিজে ওঠে। সোনালি

চামেলি ফুটেছে পাশে গাছ ছেয়ে।

সার্থক নাম ; যেমন রূপ তেমনি গুণ।

বড়দি বললেন, 'ঘণ্টা পড়ে গেছে, শুনতে পাও নি? চলো শিগগির।'

তাড়াতাড়ি কোনায় কাঠের বাক্সের ভিতর সবুজ-পাতায়-রাখা রক্তচন্দনের টিপ কপালে দিয়ে চলে আসি রান্নাঘরের বারান্দায়।

কাগজে মুড়ে কতকগুলো হলুদ রঙের লকেট ফল আর কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এসে বসলেন যশোরের দিদি সামনের সারিতে। টক্ ঝাল ছাড়া নিরামিষ রোচে না তাঁর মুখে। বললেন, 'কত মাছ ছড়াছড়ি যায় গঙ্গায়। তেল লংকা দিয়ে লাল কট্‌কটে ঝাল-চচ্চড়ি কেমন হয় বলো দেখি রানী।' ব'লে জিভ দিয়ে টকাটক্ শব্দ করলেন লোভ দেখাতে।

পদ্মাপারের মেয়ে, সে কথা যে মনে হয় না থেকে থেকে শপথ করে বলি কী করে?

বিকেলের দিকে বসুমতী-মা উঠে এলেন এ তাঁবুতে। বাইরে থেকেই উঁকি মেরে দেখলেন পিঁড়ি। বললেন, 'শেষ হলে আমাকে বোলো। তোমাদের নিয়ে একসঙ্গে বসব ; ঠাকুরের সামনে এই পিঁড়ি পেতে দিয়ে দুটো গান গেয়ে নয়নজলে একটু পুজো করে আসব।'

সারা দিনে এই একটিবার ওঠেন বসুমতী-মা। হাত মুখ ধোন, স্নান করেন ; কোনো কোনো দিন গঙ্গায় যান। সঙ্গের ঝি বলে, 'সে কি একটা-দুটো ডুব? টুবুর টুবুর ডুবই দেন খালি, আর বলেন, দেখ্ তো আমার চুলগুলি সব ভিজল কি না, মাথাটা সম্পূর্ণ ডুবল কি না।'

সেবাশ্রমের সাধুদের খাওয়াবার তাঁর বড়ো শখ। সুবিধে পেলেই জিলিপি ভোগ দেন, ঘি-ভাত করান। বলেন, 'ভালোমন্দ কি খায় এরা কিছু? দু বেলা দুমুঠো ভাত-তরকারি ; শখ নেই, আহ্লাদ নেই। এদের খাওয়াব না তো খাওয়াব কাদের?'

অল্প কয়েকটা টাকা বরাদ্দ আছে নিজের জন্য ; তা টুক্‌টাক্ করে এইসবেই খরচ করে ফেলেন। বাদবাকি সম্পত্তি হিসেব-করা দান-খয়রাতে বিলিয়ে গেছে ; নাতি নাতজামাইরা পেয়েছে। রামকৃষ্ণ-মিশনের শিশুপালনীতে দেওয়া হয়েছে মোটে বারো লক্ষ টাকা! এই তাঁর বড়ো দুঃখ। বলেন, 'আইনের হাতে চলে গেল সম্পত্তি, ঠাকুরের কাছে মন ভরে দিতে পারলাম না আমি।'

কেরোসিনের আলোতে কাজ আর এগোয় না, রঙ দেখা যায় না। দাদা বললেন, 'এবার বন্ধ করো কাজ। শুয়ে পড়ো। তোমার দিদি গেলেন কোথায়? অনেকক্ষণ হল দেখছি না তাঁকে।'

খেয়াল করি নি আমিও। রঙ-মাখা তুলি জলে ধুয়ে, খুরি পিঁড়ি ঢাকা দিয়ে উঠে পড়ি। উপর দিকে তাকাই, তাঁবুর গা ভিজে। যদি রাত্রে জলের ফোঁটা পড়ে পিঁড়ির উপরে? তিন-চার দিনের খবরের কাগজ খুলে চাপা দিই। কাগজ যদি ভেজে? চার ভাঁজ করে কম্বল পাতি তাতে। কম্বলও যদি ভেজে? ক্যান্‌ভাসের

হোল্ডল খুলে ঢাকি আড়েসাড়ে। আর ভাবনা নেই।

সত্যিই তো, এত রাতে কোথায় গেলেন বড়দি? তাঁবুর ঝাঁপটা টেনে বেরিয়ে আসি। সব তাঁবুই নিঝুম, অন্ধকার। কান পাতি। গুন্‌গুনানি শোনা যায় যেন বসুমতী-মার তাঁবুতে? ফাঁক দিয়ে দেখি, ঠিক। বড়দি বসে আছেন সেখানে মুখো-মুখি হয়ে। কাদা বাঁচিয়ে আমিও ঢুকে পড়ি ভিতরে।

বসুমতী-মা গান গেয়ে বড়দিকে বোঝাচ্ছেন, বলছেন, 'গান না গাইলে কি মনে ভাব জমে? গাইবে—

'সংকটনাশিনী শ্মশানবাসিনী
কই মা, হৃদিশ্মশান কই?
হৃদয়শ্মশান করিয়ে আঁধার
কোথায় রয়েছ মা ব্রহ্মময়ী।

'এইভাবে সুরের ভিতর দিয়ে ধ্যান করবে। সাধনাটা নীরস; সুরস এইতেই।'

বড়দি বললেন, 'এই সুরস আসে কী করে?'

'কী করে আসে?'

বসুমতী-মার সামনে একটা দেশলাই পড়েছিল। সেটা হাতে নিয়ে একটা কাঠি খুলে খস্‌ করে জেবলে বললেন, 'দেখো, এই ফুস্‌ করলুম আর জবলে উঠলো।' জবলন্ত কাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'এখন এইটুকুতে সমস্ত কন্‌খল পুড়ে যাবে।'

ফুঁ দিয়ে আগুনটা নিবিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি দূরে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এই আগুনটুকু মা আগে জবালতে হবে। আগে মাটি তৈরি করো, তবে তো গাছ পুঁতবে? মাটিই যদি না তৈরি থাকে, তবে গাছ বাঁচবে কী করে? ঠাকুর বলতেন—'

বলি, 'ঠাকুরকে আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি কেবল! স্পর্শও পেয়েছি—পরশমণির স্পর্শ। মার বাপের গাঁয়ের মেয়ে আমি। ডান হাতের মাঝের এই আঙুল মার মুঠিতে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটি আমি কতবার গেছি ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বলতেন, আহা, কুমারী মেয়ে, ওকে আগে খেতে দাও গো।

'ঠাকুরের অনুগ্রহ কি বলে শেষ করা যায়? এত নিগ্রহের ভিতরও তাঁর অনুগ্রহ পাই। আমি নির্বংশ বটে; কিন্তু সত্যিই কি তাই? ঠাকুর বলতেন, জ্যান্ত কুকুরের চেয়ে মৃত সিংহ ঢের ভালো। আমার তারা মৃত সিংহ হয়ে বেঁচে আছে। তাঁর কৃপায়ই সব: তিনিই দিয়েছিলেন, ভালো বুঝে তিনিই তুলে নিয়েছেন।

'আমাকে ঠাকুর বড়ো স্নেহ করতেন। বিয়ে ঠিক হল। কালো মেয়ে, শাশুড়ির মন ওঠে না। বলেন, আমার সুন্দর ছেলে, কালো বউ আনি কী করে? ঠাকুর বললেন, দেখো, ঐ কালো মেয়েই আনো; ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে তোমার।

'আমার মা বলেন, চাল নেই, চুলো নেই, মামার বাড়িতে মানুষ—ও ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কী! মেয়ে আমার ভাতে-কাপড়ে কষ্ট পাবে।

'ঠাকুর বললেন, খুড়ি—মাকে ঐ বলেই ডাকতেন, এক সম্পর্কে খুড়িই হতেন—ঐ ঘরেই তোমার মেয়ে দাও; মেয়ে তোমার রাজরানী হবে।

'তাঁর কথাতেই দু পক্ষ শেষে মত করল; বিয়ে হয়ে গেল। "কালো মেয়ে"

"কালো মেয়ে"—মনে বড়ো অভিমান হত।

'ছোটো হলে কী হবে, অভিমানী ছিনু বড়ো। বিবেকানন্দও বলেছিল, কালো মেয়ে বিয়ে করবে কী? তার পেটে যে বাগ্দীপাড়া জন্মাবে। কথাটা কানে এসেছিল আমার। বিয়ের পরে যখন আমায় বলেছে, নরেন এসেছে, সুপুরি কেটে দাও। বলেছিনু, আমি পারব না, ও আমায় "কালো মেয়ে" বলেছে। ছোট্ট মেয়ে, দুষ্টু মন; ঐ "কালো মেয়ে" বলেছে, সে কথাটা ঠিক মনে ছিল। ছেলেবেলার সব সঙ্গী; আমার স্বামী আর আমি ছেলেবেলায় পুজোর ফুল কত তুলেছি। এক পাড়া থেকে ফুল তুলে আর-এক পাড়ায় গেছি। বিবেকানন্দের বাড়িতে ছিল স্থলপদ্ম বড়ো বড়ো। ঘুম ভেঙে উঠে আসত ফুল পেড়ে দিতে; বিশাল নয়ন, সত্যি যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ি—কী সুন্দর! একসঙ্গে কত খুনসুটি করেছি। বিয়ের পরে নতুন বউ দেখতে এসে আমার ঘোমটা খুলে খোঁপা ধরে নাড়া দিয়ে বললে, আরে! তুই এলি শেষে অমুকের ঘর করতে?

'আমার নামও ঠাকুরের দেওয়া। আগে আমার নাম ছিল "হাবি", ভাইয়ের নাম "হেবো"। ঠাকুর বললেন, ও কী নাম রেখেছ খুড়ি, মেয়ের?

'মা বললেন, তা তুমি রেখে দাও-না একটা।

'ঠাকুর বললেন, তোমাদের ঐ কুসুম, নলিনী, কামিনী, মালতী আমি রাখতে পারব না। আমি নাম রাখলাম—ভবতারিণী। দক্ষিণেশ্বর-কালীর নাম ঐ। সেই অবধি ভবতারিণীই নাম হয়ে রইল আমার।

'আমার স্বামী তখন বয়সে ছোটো, ছেলেমানুষই এখনকার তুলনায়। বাপ মারা যেতে মামাবাড়িতে আশ্রয় নিলেন মাতাপুত্রে। তখন থেকেই ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করতেন তিনি। মামাকে লুকিয়ে করতে হত। মামা জানতে পারলে খুনোখুনি করতেন। ঠাকুরকে তখন কেউ জানতে পারে নি; উল্টে বদনাম দিত যে, নাল নাল ছেলেগুলোকে নিয়ে ঐ পাগলটা নষ্ট করছে। আমার স্বামীকে মামাশ্বশুর উপরের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দিতেন। কিন্তু ঠাকুরের কেমন টান দেখো, স্বামী জানলার কাঠের শিক ভেঙে, নিজের কাপড় ঝুলিয়ে, বেয়ে নেমে যেতেন। মা মামি ভয়ে ভয়ে কোনোদিন ঢাকাঢুকি দিতেন, কোনোদিন মারপিট কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। কত মারই যে খেয়েছেন এজন্য তার হিসেব নেই। একদিন কী হল, মামা তো ভাগ্নেকে তালাবন্ধ করে রাখলেন, ভাগ্নেও শিক ভেঙে পালিয়েছে। দরজা খুলে মামা দেখেন, ছেলে নেই। সেদিন তিনি এমন খ্যাপা খেপলেন!—"আর উপায় নেই, ছেলের সর্বনাশ হয়ে গেছে। মামাবাড়িতে ছেলে মানুষ হয় না, বাঁদর হয়, এই তো লোকে বলবে? আর এই কথাই শোনা ছিল আমার কপালে?" রাগে দুঃখে মামা মামিকে অভিশাপ দিলেন, "আজ যদি ঐ ছেলেকে তুমি ছাই না দিয়ে ভাত বেড়ে দাও তো তোমার বাপের মুখে"—একটা অখাদ্যির নাম করলেন।

'কী, বাপ তুলে অভিশাপ! মামি কেঁদে ভাসান। মা কাঁদেন; তাঁরও তো কম দুঃখ নয়। তাঁরই ছেলের জন্য ভাই-ভাজের সংসারে এই অনর্থ। মামি খান না, দান না। মা গিয়ে পাড়াপড়শিকে ধরেন—ওগো, তোমরা গিয়ে বলো-না গো ওকে একটু, দুটি ভাত মুখে দিক। কাকুতিমিনতি করেন জনে-জনের কাছে; নিজের বলবার মুখ রাখে নি ছেলে।

'এ দিকে ছেলেরও দেখা নেই। বেলা গড়িয়ে যায়। এমন সময় ছেলে এসে সোজা মামির কাছে গিয়ে হুমকি— কই মামি, এত বেলা হল, শিগ্‌গির খেতে দাও। আমি স্নান করে আসছি।

'মামি কী করেন! খিদের মুখে ছেলেকে খেতে দেবেন না? এ দিকে আবার মামার অভিশাপ।

'মামি থালাতে ভাত তরকারি যেমন বাড়া হয় তেমনি বেড়ে ছোট্ট একটি ঘুঁটে পরিষ্কারভাবে পুড়িয়ে আলগোছে ভাতের এক পাশে রেখে দিলেন। দিয়ে, ঠাঁই করে থালা সাজিয়ে উনুনের দিকে মুখ করে পিছন ফিরে রইলেন।

'ভাগ্নে খেতে বসে বললেন, ও মামি, শুনছ? এ আবার কী? ছাই কেন থালাতে? দেখতে পাও নি বুঝি? আচ্ছা মানুষ তো তুমি! ও কী! পিছন ফিরে বসে আছ কেন? কথা কইবে না? কী হল তোমার আজ? ও মামি—

'মামি হুঁ-হাঁ কিছুই করেন না। চুপ করে বসে আছেন, যেন পাথর একখানি।

'ভাগ্নে খানিক বক্ বক্ করে ছাইটা ফেলে দিয়ে ভাত খেতে লাগল।

'তখন মামি ঘুরে বসলেন; বললেন, বাবা, তোমার জন্য আজ আমার বাবার মুখে পর্যন্ত অখাদ্য কুখাদ্য জিনিস পড়ল। আর আমায় কত শাস্তি দেবে?

'ভাগ্নে আনুপূর্বিক সব শুনল; শুনে বললে, আচ্ছা মামি, তুমি ভাত খাও। আমি কথা দিচ্ছি, কাল থেকে আর ওখানে যাব না।

'মামি বললেন, সে তো হয় না। শাপ দিয়েছেন; তিন দিন আমি অন্নগ্রহণ করব না।

'ভাগ্নে খেয়েদেয়ে উঠে পড়লেন। মনটা বড়োই খারাপ। কথা দিয়েছেন মামিকে, কাল থেকে আর যাবেন না। মনে হল, আজ একবার শেষ বারের মতো ঘুরে আসি। ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। ফিরে যখন এলেন মামি জিজ্ঞেস করলেন, আর যাবে না তো?

'ভাগ্নে বললেন, না মামি।

'ওঁকে বলে এসেছ এ কথা?

'হ্যাঁ, সবই বললাম খুলে।

'কী বললেন তিনি?

'কিছুই না। কেবল আসবার সময় বললেন, হ্যাঁরে, তোদের বাড়ি বিগ্রহ আছে? বললুম, হ্যাঁ, গোপীনাথের বিগ্রহ আছে। তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, ভোগ হয় রে? বললুম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমায় একদিন ভোগ খাওয়াবি? বড়ো ইচ্ছে হয় খেতে।

'শুনে মামির প্রাণ টলে উঠল।

'বুঝলে তো তোমরা ঠাকুরের ছলনাটুকু? মেয়েমানুষ কাউকে খাওয়াতে পেলে আর কিছু চায় না।

'মামি বললেন, তা তুই কী বলে এলি?

'কিছুই বললাম না, চলে এলাম।

'তা হয় না। ভোগ খেতে চাইলেন; কাল আমি সকাল-সকাল রান্না করে দেব, তুই গিয়ে তাঁকে ভোগ খাইয়ে আসবি।

'ভাগ্নে বললেন, আমি যে কথা দিয়েছি, আর যাব না।

'মামি আদর করে বললেন, ওরে পাগল, ভোগ নিয়ে গেলে দোষ নেই। আমিই তো বলছি যেতে।

'পরদিন ভোর না হতে মামি উঠে কাজকর্ম সেরে রাঁধতে বসলেন। পাড়াগাঁয়ের রান্না অন্য ধরনের। কালিয়া, কোর্মা, ওসব তো নয়। রাঁধলেন মোচার ঘণ্ট, ভাজা, শুক্তুনি, নিম-ঝোল, ডেঙোডাঁটার ডালনা, পায়েস, এইসব হরেক রকম। মামির হাতের রান্নার নামডাক ছিল গাঁয়ে। পরিপাটি করে রেঁধে মামি পুজারীকে তাড়া দিলেন— আজ একটু তাড়াতাড়ি সারো ; গোপীনাথের ভোগ দিয়ে দাও।

'শেষে সেই ভোগের ভাত—জান তো পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ভাত খায় বেশি—বেশ কতকটা পিতলের গামলাতে চেপে চেপে বাড়লেন, যেন গরম থাকে অনেকক্ষণ। ভাতের উপরে বাটিতে বাটিতে তরকারি দিলেন, পায়েস দিলেন। দিয়ে, কলাপাতা দিয়ে ঢেকে একখানা গামছা দিয়ে গামলাটি ভালো করে বেঁধে ভাগ্নের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, যা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ; খাইয়ে আয় ঠাকুরকে। আর এই নে কয়েকটা পয়সা, শেয়ারের গাড়ি-ভাড়া। দেখিস, দেরি করিস নে যেন পথে।

'ঠেলেঠুলে ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিলেন মামি, যেন তাঁরই গরজ বেশি। পাঠিয়ে দিয়ে মামি কেবলই ঘর-বার করেন, কতক্ষণে ফিরে আসে।

'ও দিকে ঠাকুর সবে খেতে বসবেন এমন সময়ে স্বামী হাজির ভোগ নিয়ে। ঠাকুর কী খুশী। ওরে, ঠিক সময়ে এসেছিস। দেখি, দেখি, কী এনেছিস। আঃ, কী খোস্‌বো রান্নার! কাছে যাঁরা ছিলেন, ঠাকুর তাঁদের নিজের হাতে বেঁটে দিলেন, নিজেও নিলেন। প্রতিটি জিনিস খান আর বলেন, দেখেছ কী সুন্দর স্বাদ! এমনটি আর খাই নি কখনো। পায়েস কী চমৎকার হয়েছে! চেটে চেটে খেলেন পাতের সবটুকু। কেবলই বলেন, অমৃত খেলাম যেন। ওরে, গোপীনাথের সত্যি ভোগ হয়েছে। তাই এমন আস্বাদ।

'এ দিকে মামা খোঁজ করেন, "অমুক" কই। মামি, মা আজেবাজে বলেন, এই তো এখানে ছিল। আসবে হয়তো এখনি।

'বিকেলের দিকে ভাগ্নে ফিরে আসতে মামি দৌড়ে যান, হ্যাঁ রে, খাইয়ে এলি? কী বললেন?

'বললেন, তোদের গোপীনাথের সত্যি ভোগ হয়েছে ; অমৃত খেলাম। কী খুশি মামি ; চেটেপুটে সব খেলেন। বললেন, এমন রান্না খাই নি কখনো।

'আর যাবে কোথায়! রান্না ভালো বলেছেন, মেয়েমানুষের মন গলে গেল একেবারে। ননদ-ভাজে লুকিয়ে লুকিয়ে ভোগ পাঠাতে লাগলেন ছেলেকে দিয়ে। আবার দু-চার পয়সা নৌকো-ভাড়া, গাড়ি-ভাড়াও দিয়ে দেন সঙ্গে ; যেতে-আসতে কষ্ট না হয় তার। ছেলে এক-একদিন বিগ্‌ড়ে বসে, কী রোজ রোজ আমি পারব না বয়ে নিয়ে যেতে। মা মামি কাকুতি করেন—ওরে, যা আজ একবার লক্ষ্মীটি, মালপোয়া ভোগ দিয়েছি। আজ ক্ষীরের নাড়ু করেছি, আজ চিঁড়ের পিঠে, আলুর পুলি— চলতেই থাকে এই।

'ঠাকুরের এমন মহিমা ; খালি খাবার পাঠিয়ে তৃপ্তি নেই, শেষে নিজেরাই যেতে লাগলেন তাঁর কাছে।

'আমি বউ-মানুষ : ঘোমটা দিয়ে আমিও যেতাম সঙ্গে। ঠাকুরকে দুধের সর

খাইয়েছি আমি।

'ঠাকুর তখন কাশীপুরে অসুস্থ; গলায় ঘা। কিছুটি খেতে পারেন না।

'সর খেতে চাইলেন। একজন এনে সর দিলেন। ঠাকুর আঙুল দিয়ে নেড়ে রেখে দিলেন। শক্ত সর। খেতে গলায় লাগবে। দেখলুম। বাড়ি এসে শাশুড়িকে বললুম, একদিন সর নিয়ে যাব ঠাকুরের জন্য? শাশুড়ি অনুমতি দিলেন। গরিব গেরস্ত ঘর; কতটুকুই বা দুধ, আধসের-তিনপো হবে। তাই জ্বাল দিলাম; দুধটা ফুটে উঠতেই নামিয়ে ফেনাটুকু তুলে ফেললাম। মনে ছিল, শাশুড়ি সেদিন বলেছিলেন, আহা, সরটা পাকা ছিল তাই ঠাকুর খেতে পারলেন না।

'একটা সবুজে কাঁচের বাটি ছিল আমার। চার আনা দিয়ে—ঐ-যে "বেলোয়ারি চুড়ি চাই" বলে হাঁকে—তাদের কাছ থেকে কিনেছিলুম। বাটিটি আছে এখনো। তা সেই বাটিতে করে সরটুকু নিলাম, আর কাগজে মুড়ে আহিরিটোলার মা-শীতলার একটু প্রসাদী লাল চিনি—এই এতটুকু ছিল ঘরে—তাই নিলাম। নিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় বাটিটা বসিয়ে ডান হাত দিয়ে এইভাবে ঢেকে শাশুড়িদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গেলাম ঠাকুরের কাছে।

'ঠাকুর শুয়েছিলেন তক্তপোশে। আজানুলম্বিত বাহু যে বলে, সত্যি ছিল তাঁর সেই বাহু; বিশাল বক্ষ। ছবি যা দেখ তা কিছুই নয়। একটা সাদা ওয়াড়-পরানো তাকিয়ায় ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন কাত হয়ে; পাশে আর-একটা তাকিয়া। আমি গিয়ে গা ঘেঁষে আদুরে হয়ে কাছে বসলুম। দেখো, আগুনে হাত দিলে ইচ্ছেতেও পোড়ে, অনিচ্ছেতেও পোড়ে। হাত পুড়িয়েছি আমি। ভক্তি-টক্তি বুঝি নি তখন। আদুরে হতে পারলেই গলে যেতুম। তা সেইভাবে ঠাকুরের কাছে বসে ঘোমটার ভিতর দিয়ে বললুম, একটু সর এনেছি আপনার জন্য। শুনে ঠাকুর তাকিয়াটা সরিয়ে উঠে বসলেন। গলায় ঘা, কথা বলতে পারেন না, ডাক্তারেরও বারণ।

'হাত বাড়িয়ে বাটিটা তাঁর সামনে ধরলুম। চিনিটুকু দেখিয়ে বলি, মা-শীতলার প্রসাদ। আবার ঠোঁট ফুলিয়ে বলি, চিনিটা কালো। ঠাকুর চিনিটুকু হাতে নিয়ে কণিকা কণিকা তুলে যারা সেখানে ছিল সবার হাতে দিলেন। শেষে বাকিটুকু যা কাগজে লেগেছিল সরের উপরে দিয়ে দু আঙুলে তুলে আস্তে আস্তে সবটুকু খেলেন। খেয়ে ইশারা করলেন, একটু জল। বাটিতে জল গুলে সেটুকুও চুমুক দিয়ে খেলেন।

'এখন মনে হয়, আবার কেন নিয়ে যাই নি, আবার কেন খাওয়াই নি। বউ মানুষ, লজ্জায় বলতে পারি নি বাড়িতে। সেই একবারই আমার হাতের সর খেলেন তিনি। তখন আবার উল্টে অভিমান হল—সর খেলেন, কই ভালোমন্দ তো কিছু বললেন না। ছাড়ব কেন, বাহাদুরি নিতে হবে তো? মুখখানা এগিয়ে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললুম, সরটা কচি। পাকা-কচির কী বুঝি আমি? তবে সেই-যে শাশুড়ি বলেছিলেন, আহা সরটা "পাকা" ছিল—তাই আমার নরম সরটার নাম দিলাম "কচি"। সেটাই আবার বিশেষভাবে জানানো হল—সরটা কচি।

'ঠাকুর হেসে ডান হাতখানা এমনি করে আস্তে আস্তে তুলে আমার পিঠে রাখলেন; বললেন, তুমি যে পাকা।

'আহ্লাদের আর সীমা রইল না আমার।'

বলি, 'ঠাকুরের কাছেই দীক্ষা নিয়েছেন আপনি?'

'দীক্ষাটীক্ষা বুঝি নে মা। গিয়ে একদিন বললুম, মন্তর নেব। ঠাকুর বললেন, আমার কাছে ইড়িং বিড়িং সিড়িং নেই; হরেকেস্ট বল্ গে যা। আর আমার স্বামীর নাম করে বললেন, অমুক যা বলে শিখে নে। সেই হয়ে গেল আমার দীক্ষা নেওয়া। ঐ নামই সার করে আছি জীবনে।

'পড় নি ঠাকুরের বইয়ে, আমার স্বামীর পায়ে সর্পাঘাত হয়েছিল? ঠাকুরের শবদেহ কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন যে ক'জনা, তাঁদের মধ্যে আমার স্বামীও ছিলেন। যাচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর পায়ে সর্পাঘাত হল। সকলে হৈ হৈ করে উঠল। আমার স্বামী দৈববাণী শুনলেন, সাপটাকে মারিস নে, আজ হতে তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সকলে এটা ওটা দিয়ে পা বেঁধে দিতে চায়, আমার স্বামী খাটিয়া ছাড়লেন না কাঁধ হতে।

'এ দিকে বাড়িতে হুলুস্থুল। খবর এসেছে, সর্পাঘাত হয়েছে। কান্নাকাটি পড়ে গেল। স্বামী ফিরে এলেন। সঙ্গের লোকরা বলে গেল, ওকে খেতে দেবেন না, ঘুমাতে দেবেন না। স্বামী বললেন, খিদে পেয়েছে, আগে খেতে দাও। মা মামি হা-হা করে ওঠেন। সেদিন সত্যনারায়ণের পুজো হয়েছিল, ঘরের কোনায় প্রসাদ ঢাকা। স্বামী নিজে গিয়ে ঢাকা খুলে মালপোয়া, তালের বড়া পেট ভরে খেয়ে দরজা এঁটে এক ঘুম দিলেন। কী হবে, কী হবে, আতঙ্কে সব অস্থির। লম্বা ঘুম দিয়ে স্বামী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন।

'নাও তো মা, অনেক রাত হল; যে গানগুলি লিখলে একবার আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে নাও দেখি। হৃদ্‌পদ্ম-আসনে তাঁকে বসাবে; আগে আবাহন করবে—

'মা, আমার অন্তরে জাগো,
জাগো গো কুলকুণ্ডলিনী—
তোমায় অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি
অন্তর না করি দিবাযামিনী।
এস মানসমন্দিরে—

'দুবার গাইবে—এস মানসমন্দিরে তারা গো, আবার বলবে, শ্যামা গো;

'এস মানসমন্দিরে কালী গো।
পুজিয়ে তোমারে জনম
সফল করি গো জননী।

'মস্ত গান; লিখতে চাইলে তাই বললুম। আমি আমার পুজো গানেই করি। গানের সুরে যেমন সহজে একটা ভাব জাগে ভিতরে, তেমন আর-কিছুতে নয়। কত গান লিখবে? ভুলে যাই পদ। মনে ভাব এলে কথা আপনিই আসে। লিখে রাখবার তাই দরকার বোধ করি নি।

'নাতির বিয়ে, কবিতায় উপহার লেখা হবে। জটলা করে সবাই। ছেলে বললে, তোরা কী লিখবি? মাকে ধর্, মা লিখে দেবেন। যাক, সে কথা। গাও—

'বিহর মা সদা রঙ্গে, ষটচক্র শিব-সঙ্গে,
যাচিছে করুণা তব ভবতারিণী, অনিবার।

'ভবতারিণী তো আমার নাম। তুমি যখন গাইবে, গেয়ো—এই অধমা অনিবার—জাগো জাগো মা আমার।

'গানের মতো জিনিস নেই। সময় পেলেই গান গাইবে নিজের মনে। শেষের পদটা কী লিখলে?

'চির শান্তি লাভ-আশে
শোকাতুরা ভবতারিণী ভাসে—

'এখানে লেখো "তনয়া"। আগে লিখেছ "এই অধমা"। এক কথা বার বার ভালো শোনায় না। এবার গাও—

'শোকাতুরা তনয়া ভাসে,
আমার শ্যামা মায়ের পাদুকা-প্রান্ত—
সচ্চিদানন্দ পারাবার।
জাগো, জাগো, মা আমার॥

'এই নিয়েই মা ছিলাম আমি; মাঝ থেকে একটা ঝড়-ঝাপ্‌টা এসে কাঠ করে দিয়ে গেল।'

বসুমতী-মার তাঁবু হতে বেরিয়ে আমাদের তাঁবুতে ফিরে আসতে মাঝের পথটুকু পার হচ্ছি; কড়্ কড়্ করে চার দিক কাঁপিয়ে একটা বাজ ডেকে উঠল।

কাশীতে প্রথম সকাল। বসে আছি সেবাশ্রমের পাণ্ডা 'শ্রীপাণ্ডা'র জন্য। কথা আছে, সে এসে নিয়ে যাবে আমাদের। কাশীর গঙ্গায় ডুব দিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন করে তবে অন্য কাজ। বড়দির শখ, এতই যদি হল, তবে ফিরতি পথে কাশীতে নেমে দুটো ফুল বেলপাতা দিয়েই যাই শিবের মাথায়। আশুতোষ, তিনি সদাই তুষ্ট ; কী-ই বা লাগে তাঁর মনোরঞ্জন করতে। একটা গোটা ধুতরো আর এক আঁজলা গঙ্গাজল, ব্যস।

ভোলামামা ভোর না হতে এসে হাজির। আশ্রমের কোন্ বাড়ি কবে কেনা হয়েছে ; এই প্রেসিডেণ্টের চেয়ে আগের প্রেসিডেণ্ট আরো ভালো ছিল ; গোয়ালের গোরুগুলি কত দুধ দেয় ; প্রকাণ্ড কালো ষাঁড়টা হালে কেনা হয়েছে, পথের পাশেই বাঁধা ছিল, আমরা দেখেছি কি না তাকে—ইত্যাদি এক ধার থেকে নিজেই বলে যাচ্ছে, নিজেই উত্তর দিচ্ছে। এককালে ভোলামামা খুব ভালো বাগান করতে জানত ; আসাম এগ্রিকাল্‌চারাল ডিপার্টমেণ্টে ওর মতো কলমের কাটিং করতে পারত না আর কেউ। বড়দি বলেন, 'মাঝখানে ভোলামামার খুব অসুখ হয়। বাবা বহু টাকা খরচ করে চিকিৎসা করালেন ; হঠাৎ একদিন ভোলামামা নিরুদ্দেশ হল। কত খোঁজাখুঁজি সন্ধান মিলল না। সবাই আশা ছেড়ে দিলাম ; ধরে নিলাম সে আর নেই। এত কাল বাদে কাল অকস্মাৎ দেখা।'

কাল যখন আমরা এখানে আসি, আপিস-ঘরে বসে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা-বার্তা বলছি, বড়দি দেখি অন্যমনস্ক হয়ে ভুরু কুঁচ্‌কে তাকিয়ে আছেন, কোনায় দাঁড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে বইগুলি আলমারিতে তুলছিল যে লোকটি তার দিকে। দেখে দেখে বড়দি উঠে চলে গেলেন তার কাছে, বললেন, 'ভোলামামা, তুমি এখানে! আমারে চিনতে পারলা না ; আমি হিরণ।'

বৃদ্ধ ঠক্ ঠক্ করে মাথা নাড়ে 'হ হ, চিনি নাই, অখনে চিন্‌ছি। তুমি আমার মা।'

ভোলামামা দাদাশ্বশুরের আমলের বাড়ির দাসীপুত্র। বড়দি ছিলেন তার বড়ো আদরের—কন্যাতুল্য। বিয়ে-থা ঘর-সংসার করে নি কখনও ; বাড়ির ছেলেমেয়েদের আদর আবদার নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে জীবন।

বড়দি শুধোন, 'আচ্ছা ভোলামামা, আমাদের তুমি ভুলতে পারলে? এখানেই বা কী করে এলে?'

ভোলামামা বলে, 'আসাম হতে চট্টগ্রাম গিয়ে রইলাম দু বছর। তার পর এখানে আসি। ট্রেনে জ্বর হয়, বেহুঁশ হয়ে পড়ি। জ্ঞান হলে দেখি, এঁদের এই হাস-পাতালে আছি। ভালো হয়ে বললাম, আর কোথায় যাব, এখানেই থাকি। এঁরা আপিসে কাজ দিলেন। চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করি, টেলিফোন ধরি। দু বেলা খাই। দিন চলে যায়।'

গগন মহারাজ বলেন, 'এর বয়েস হলে হবে কী, কী জোর গায়ে এখনো! আর খুব বিশ্বাসী।'

তৈরিই ছিলাম। পাণ্ডা আসতে বেরিয়ে পড়লাম।

'দশাশ্বমেধ ঘাট তো হাতের কাছেই ; যখন ইচ্ছে নিজেরাই গিয়ে স্নান করতে পারব। আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে যাই—কী বল?' ব'লে দাদা তাকালেন বড়দির দিকে।

এ ঘাট নয়, ও ঘাট—এত তুচ্ছ ব্যাপারে বড়দি নিজের মতামতের প্রাধান্য খাটান না। নীরবেই দাদার অনুগামিনী হলেন।

এ গলি সে গলি, বসা ষাঁড় চলা ষাঁড়, কাদা জল পানের পিক, সব এড়িয়ে চলতে চলতে দম বন্ধ হয়ে আসে। কেবলই মনে হয়, এই বুঝি এর শেষ। দেখি, আবার একটা।

বলি, 'ও পাণ্ডাঠাকুর, ফিরতি মুখে কিন্তু এ পথে নয়।'

পাণ্ডা বোঝে না—'কেন?' ফিরে ঘুরে দাঁড়ায়।

বলি, 'স্নান করে বিশ্বনাথের কাছে যাব, একটু পরিষ্কার পথ দিয়ে চললে ভালো হয় না?'

পাণ্ডা বললে, 'এই পথের চেয়ে ভালো পথ পাবে কোথায় কাশীতে?'

'থাক্ তবে, আমার কী? ময়লা মাড়াই যদি, ঐ পায়েই ঢুকব মন্দিরে।' গজ্‌রাতে থাকি মনে মনে।

পথে বিশালাক্ষীর মন্দির। পাণ্ডা বলে, 'দেখে নাও। এইখানে সতীমায়ের আঁখি পড়েছিল, তাই বিশালাক্ষীর মন্দির হল। পীঠস্থান।'

ছোট্ট দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। গলি বাড়ি মন্দির, সবই কেমন অন্ধকার ঘুপচি-মতো। ডাইনে বাঁয়ে তাকাবার সময় নেই ; হুড়্ হুড়্ করে ভিতরে ঢোকো, আর চোখের সামনে যা পড়ে দেখো। পার তো কাদা-জলে মাখামাখি সপ্‌সপে মেঝেতে পা টিপে টিপে দু পা এগিয়ে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করো।

বিশালাক্ষীর পাশে মহালক্ষ্মী, তাঁর পাশে নবগ্রহ। একবার কোনোমতে ঘুর-পাক খেয়ে বেরিয়ে আসি। দাঁড়াবার উপায় নেই। প্রাতঃস্নানের পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা মন্ত্র আউড়ে দেবী-প্রদক্ষিণে ব্যস্ত। মূর্তির সামনে একটু দাঁড়িয়েছি কি, হাততালি দিয়ে সতর্ক করে হাতের ইশারাতেই সরে যেতে বললেন। নইলে তাঁদের পরিক্রমার পথ আটকে রাখা হয়।

অপ্রস্তুত হয়ে বাইরে বের হই। পাণ্ডা বললে, 'কেমন, বিশালাক্ষী দেখলে তো? এই পথে না এলে কি এ মন্দির দেখতে পেতে?'

মণিকর্ণিকার ঘাটে আসি। কেমন একটা বিদ্‌ঘুটে গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল কিসের।

দাদা বললেন, 'আগে চলো, মহাশ্মশান দর্শন করে আসি।'

দাদা এগোলেন, জোড়হাতে বড়দিও এগোলেন ; আমি এক পা এগোই, দু পা পিছোই। এদিক-ওদিক তাকাই, ইতস্তত করি। বুঝতে পারি না কী করা উচিত।

বড়দি দাদা ততক্ষণে চলে গেছেন রেলিঙঘেরা জায়গাটার সামনে। নীচ হতে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে, আগুনের শিখা রোদের মুখে ধক্ ধক্ জ্বলছে ;

সেই প্রখর অগ্নিশিখার বুক ভেদ করে কী দেখতে লোক ঝুঁকেছে রেলিঙের উপর উপুড় হয়ে?

খালি গায়ে একদল ছোটো ছেলে বসে খেলা করছে সেখানে; ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটু চাপ্‌ড়ে হাততালি দেয় আর হাসে খিল্‌খিলিয়ে।

'কী দেখব', 'কেমন দেখব' আতঙ্কে যে মন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল, সহজ শিশুদের দেখে লজ্জা পেয়ে এক ধাক্কায় তা একেবারে সামনে গিয়ে পড়ল। চোখ মেলে স্পষ্ট করে চেয়ে দেখলাম—দেখলাম, নীচে গঙ্গার পাড়ে মহাশ্মশানের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে—মাথার দিকটা পোড়া-কাঠে, আগুনে, ছাইয়ে, ধোঁয়ায় মিলে মিশে একাকার। পায়ের দিকে কাঠের ফাঁকে লালে-সাদায় ওটা কী? আলতামাখা পায়ের পাতা?—ও কী ও! লাঠির এক খোঁচায় কাঠ উল্টেপাল্টে গেল; চিড়্ চিড়্ করে আগুনের ফুল্‌কির ফুলঝুরি উঠল; ধোঁয়ায় গন্ধে চোখ নাক ঢেকে দিল। আঁচলে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে এলাম ছুটে।

রক্ততিলক কপালে আঁকা এক তান্ত্রিক এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে মড়ার খুলি সামনে পেতে ধ'রে বলে, 'এই সংসার মিথ্যা, মায়ার বন্ধন। মিথ্যা, মিথ্যা সব; কেবল মহাশ্মশানই সত্য। যাবার সময় সঙ্গে কিছু যাবে না; ভিক্ষে দাও খর্পরে, এই পুণ্যিটুকুই সঙ্গে যাবে কেবল।'

শ্মশানের বাঁ ধারে স্নানের ঘাট। ঘাটের উপরে এক জায়গায় দুটি ছোটো ছোটো শ্বেতপাথরের পা।

পাণ্ডা বললে, 'ঐখানে বিষ্ণু পঞ্চাশ হাজার বছর তপস্যা করেছিল; আর এই-যে কুণ্ড দেখছ, এখানে বিষ্ণুর কুণ্ডল পড়ে গিয়েছিল। মহাদেব বিষ্ণুর তপস্যায় খুশি হয়ে বললেন, বা রে ছেলে, বেশ তপস্যা করছ তো। ব'লে বিষ্ণুকে নেড়ে দিলেন। তখন কান থেকে বিষ্ণুর কুণ্ডল খসে পড়ে এইখানে। তাই এই ঘাটের নাম "মণিকর্ণিকা"। আর তপস্যা করতে করতে বিষ্ণুর গায়ের ঘাম থেকে এই কুণ্ডের উৎপত্তি।—বোসো বোসো, এখানে এই কাঠটার উপরে বোসো; তার পর বলছি শোনো।'

ঘাটের উপরে কাঠের-তক্তা-ফেলা পাণ্ডাদের মাচা, মাথার উপর পাতার ছাউনির বড়ো বড়ো ছাতা। কড়া রোদ উঠে গেছে চার দিকে, ছায়াটুকু পেয়ে বসে পড়লাম সেখানে।

পাণ্ডা বললে, 'কাপড়চোপড় সব রাখো, আরাম করে বোসো।'

কথামত আরাম করেই বসি। পাণ্ডাও এসে পাশে বসে। আরও গল্প শুনতে তার মুখের দিকে তাকাই। পাণ্ডা বললে, 'তার পর, এই-যে কুণ্ড দেখছ, শিবের বরে তো বিষ্ণু সব চেয়ে নিল—কী, এইখানে যে সিনান করবে সে সব তীর্থেরই ফল পাবে। এই কুণ্ডে স্নান করে তবে গঙ্গাতে স্নান করতে হয়। এখন, ব্রাহ্মণকে পঞ্চরত্ন দান ক'রে এই কুণ্ডে স্নান করো—যাও। ঐ দেখো পঞ্চরত্ন দান করছে সব যাত্রীরা।'

সিঁড়িতে সারি সারি যাত্রী বসে গেছে; পাণ্ডারা একটা নারকেল আর কাগজের মোড়ক—পঞ্চরত্নের নিশ্চয়ই—যাত্রীদের হাতে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে মন্ত্র পড়িয়ে পয়সা ট্যাঁকে গুঁজছে।

বড়দি বললেন, 'এনে যখন ফেলেছে, যা করবার করো তাড়াতাড়ি।'

'পয়সা লাগবে কত?'

'পাঁচ সিকা।'

দাদা বড়দি নেমে গেলেন নীচে। ফুলে বেলপাতায় পচা সবুজ রঙের জল বাঁধানো কুণ্ডে আট্‌কা। হেঁকে বললাম, 'একটু জল এনে নিজের হাতে ছিটিয়ে দিয়ো মাথায়, তাতেই আমার হবে।'

পঞ্চরত্ন দান না করে পুণ্যকে ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু পান্ডাকে? ঘাটের পান্ডা বললে, 'ঘাটে যে বসলে তার দক্ষিণা দাও।'

পান্ডার তক্তায় তক্তায় ছাওয়া গঙ্গার ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ি। ছাউনিছাতার গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি। সবাই চেঁচায়, 'এইখানে এসো, এইখানে কাপড় রাখো।'

এবার আর শুনি নে কারো কথা। গট্ গট্ করে এগিয়ে যাই, ঘাটের শেষে নিয়ম এড়িয়ে সাবান দিয়ে কাপড় কেচে স্নান করছে লোকে যেখানে, সেখানে গিয়ে শুক্‌নো সিঁড়িতে কাপড় রেখে ঝুপ্ ঝুপ্ দুটো ডুব দিয়ে উঠে পড়ি পাড়ে :

বীরেশ্বর-মন্দিরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে ঐ উপরে, ঘাট হতে।

'জান, এই বীরেশ্বরের কাছেই মানত করে বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন তাঁর মা', সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলেন বড়দি।

এখানেও তাই ; মন্দিরের ভিতরেও ছোটো ছোটো গলি, ছোটো দরজা। তারই একটা দিয়ে ঢুকতেই পিছন থেকে পান্ডা বললে, 'এবার সামনে গিয়ে বাঁ-হাতি চলে যাও, বীরেশ্বরকে পাবে।'

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি ; খানিক থম্‌কে থাকার পর নজরে আসে, খুপ্‌রি একটা ঘরের মেঝেতে বাঁধানো চৌবাচ্চা। স্নান করে গঙ্গাজল এনে ঢালে সবাই এখানে কমন্ডলু উজাড় করে। ফুল বেলপাতা জলে বোঝাই চৌবাচ্চা, এর মধ্যে বীরেশ্বর কোথায়? হাত বাড়িয়ে জল হাতড়াই ; একটা পাথর-মতো কী যেন ঠেকল হাতে। এই-ই কি তবে তিনি? ভিজে হাতটা এনে মাথায় ছোঁয়াই ; জল হতে একমুঠো ফুল তুলে নিই। কাত্যায়নী বীরভদ্র প্রদক্ষিণ করে বাইরের আলোতে বেরিয়ে আসি। মুঠ খুলে দেখি, একগোছা বুনো আকন্দ।

সংকটা-মন্দির পাশেই পড়ে। ফিস্ ফিস্ করে বড়দি বলে রাখলেন দাদাকে আগে হতে, 'সংকটা-দেবীর মন্দিরে কিছু বেশি প্রণামী দিয়ো।'

মন্দিরের দরজায় পা দিতেই কানে এল গুরু গুরু গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি। সারি সারি ব্রাহ্মণপন্ডিত বসে গেছেন কুশাসন পেতে দেবীর সামনে ; চন্ডীপাঠ করছেন পাতার পর পাতা উল্টে।

বড়দি বললেন, 'দেখো দেখো, এক-একটি ব্রাহ্মণের কী রূপ, কী রঙ!'

পরিধানে পট্টাম্বর, কপালে সিঁদুর-তিলক ; দেখলে সম্ভ্রমে মাথা আপনি নুয়ে আসে।

মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ে সংকটা-দেবীর সোনার বাঁ পা'খানি। ডান পা ঢাকা ফুলে পাতায়। গা বুক হাত সবই শাড়ি গয়না ফুলের মালায় জড়ানো। কেবল প্রদীপের আলোতে চিক্‌চিক্-করা মুখের সোনালি গালে টল্ মল্ করে রুবির নথটি।

সুগন্ধি ধূপে পুষ্পে, মন্ত্রগানে স্থানটি ভরপুর। ইচ্ছে যায়, চুপ করে এক কোনায় বসে মন্ত্রপাঠের সুর শুনি কেবল।

বিশ্বনাথের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে, সময় নেই বেশি। পা চালিয়ে চলি সবাই। কোঁচড় ভরে ফুল বেলপাতা কিনে নিয়েছি পথ হতে।

খানিকটা যেতেই হঠাৎ কেমন একটা ভিড়ের স্রোতে পড়ে গেলাম। বড়দি আমি হাত-ছাড়াছাড়ি। ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে এ ওর দিকে হাত বাড়াই, পরক্ষণেই মিলিয়ে যাই। যেন ডুব দিতে দিতে মাথা তুলি। অনেক আঁকুপাঁকুর পর দুজন দুজনকে জাপ্‌টে ধরি।

বড়দি বললেন, 'ওঁরা কই?'

বলি, 'আমিও তো ভাবছি ওঁরা কই?'

'কই কই' করতে করতে, ওঁরাও দেখি 'তারা কই', 'তারা কই', ব'লে খুঁজতে খুঁজতে খপ্‌ করে এসে হাত ধরলেন।

পাণ্ডা তার মোটা দেহ নিয়ে মন্দিরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আমার কোমর ধরে চলে এসো পর পর।'

একটুখানি জায়গা ; অগুন্তি লোক ঢুকতে চায় একসঙ্গে। যাব কী? লোকে লোকে মারামারি, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি, মুখ-খিঁচিমিচি—বিশ্বনাথের সামনেই। এক হিন্দুস্থানী মেয়ের লাল কুর্তির হাতটা উবেই গেল ভিড়ের চাপে। দেখে, রেগে সে গঙ্গাজল-ভরা ঘটিটা দিয়ে দিলে এক ঘা বসিয়ে পাশের জনের ঘাড়ে। শিবের মাথায় দিতে আনা গঙ্গাজল দিল কার মাথায় সে হুঁশ তার নেই।

মন্দিরে না ঢুকতে পারলে যেন পাণ্ডারই ক্ষতি বেশি। ব্যাপার দেখে সে তার বিশাল বপু ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে লাগল। সে দোলায় মুহূর্তে তার পিছনে একটা গহ্বর তৈরি হয়ে গেল। বড়দি দাদা আমি ঢুকে পড়লাম তাতে। গহ্বর বুজে গেল পলকে।

বিশ্বনাথের মাথায় কোঁচড়-ভরা ফুল ঢেলে দিয়ে চলে আসি বাইরে। দু হাতে পাণ্ডা আমাদের আগলে নিয়ে আঙিনায় দাঁড়ায় ; বলে, 'এই দেখো বাবার রুপোর দরজা, আর ঐ দেখো উপরে সোনার চূড়া।'

বাবার কাছাকাছিই মা-অন্নপূর্ণার মন্দির। দেবীমন্দির ঘুরে যে পথে এসেছি সেই গলি ধরেই বাড়ি ফিরি। পাথরের-চাপ-ফেলা বাঁধানো রাস্তা, দু পাথরের মাঝে মাঝে সরু সরু ফাঁক। তারই একটা ফাঁকে পড়ে রয়েছে পালক-না-ওঠা, পাতলা হলদে চামড়ায় মোড়া শালিক পাখির ছোট্ট বাচ্চা। যাত্রীর পায়ে পায়ে থেঁৎলানো গায়ে ছোট্ট দুটি পা কুঁক্‌ড়ে আছে, যেন জোড় হাত বুকে চেপে ধরেছে।

দোতলার ঘর, নিস্তব্ধ দুপুর, জানলার পাশে তক্তপোশে শুয়ে আছি। পুরোনো তেঁতুল, নিমগাছের কালো কালো ডাল জাল বুনেছে আকাশের গায়ে কচি কচি পাতা নিয়ে। আজই নিম-বেগুন খেয়েছি ভাতের সঙ্গে। গরম শুরু হয়েছে তা হলে।

রোদের তাতে কাক ডাকে—কা কা ; শুনে গলা শুকিয়ে আসে। দু চোখ টিপে

ধরে পড়ে থাকি বিছানায়। ঘুঘু ডাকে বেলগাছের আড়াল হতে— ঘু ঘু ; মন ছুটে যায়, যেখানে যেতে বারণ করি এত।

বোজা চোখ খুলে ফেলি। রোদের ঝিলিমিলি সবুজ চিকন পাতায়, যেন স্বপ্নের ছবি চোখের সামনে।

বড়দি ভিজে কাপড় রোদে উল্টেপাল্টে শুকিয়ে পাট করে ঘরে তুলছেন ; ঘটিতে কুঁজোতে জল ভরে রাখছেন ; নানা দেবীর আশীর্বাদী ফুল-পাতা খবরের কাগজে মেলে বারান্দায়-পড়া বিকেলের রোদটুকুতে টেনে টেনে দিচ্ছেন। দেশে ফিরলে দিতে হবে সবাইকে একটু একটু করে। শুকিয়ে না নিলে পচে যাবে ততদিনে। বড়দির কাজের অন্ত নেই ; কী করে যে কাজ তৈরি করে নেন! বলেন, 'সময় তো কাটে না আমার তা নইলে।'

দাদা বললেন, 'চলো, তৈরি হও ; কেদারেশ্বর দেখে আসি।'

ঘড়ি ধরে চলেন দাদা ; এ দিক ও দিক হয় না বেড়াতে বেরিয়েও। সাতটা দশ মিনিটে ফেরবার কথা, তো সাতটা আট মিনিটেই ফিরে আসবেন। বলেন, 'দু মিনিট আগে আসা ভালো, দেরির চাইতে।'

জ্ঞান মহারাজের মা বলে দিয়েছিলেন, 'চলে যান দুটো রিক্সা নিয়ে ; ছ আনা, ছ আনা, বারো আনা লাগবে।' তিনি এসেছিলেন খানিক আগে। অপরিচিত মানুষ, চিনতে পারি নি প্রথমে। জ্ঞান মহারাজ বলেছিলেন, 'কাশীতে যাচ্ছেন, আমার মার সঙ্গে দেখা করবেন।' সকালে তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা পাই নি, তিনি মন্দিরে গিয়েছিলেন। দুপুরে তাই এলেন নিজে হতে।

বলি, 'জ্ঞান মহারাজের মা বলতে ভেবে রেখেছি, মাথাভরা পাকা চুলে সিঁদুর-লেপা টুস্‌টুসে এক বুড়ি।'

তিনি হেসে বললেন, 'আর এখন কী ভাবছেন?'

'এখন ভাবছি, আমারই ছোটো বোন।'

সুন্দর হাস্যমুখী ভদ্রমহিলা। সেবাশ্রমের কাছেই থাকেন স্বামী-স্ত্রী। জ্ঞান মহারাজ 'মা' ডাকেন। অনেকক্ষণ বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করে গেলেন। তিনিই বলেছেন, 'কেদারেশ্বর দেখে একেবারে তিল-ভাণ্ডেশ্বরও দেখে আসবেন ; কাছাকাছি পড়বে।'

কিন্তু রিক্সাওয়ালারা আনাড়ি মানুষ টের পায়। 'এই রিক্সাওয়ালা, কেদারেশ্বর যায়েগা? কেত্‌না লেগা?' শুনেই তারা বলে ওঠে, 'আড়াই রুপেয়া।'

অনেক কষ্টে একটা 'কন্‌ভয়' পেরিয়ে যাবার পর দুটো রিক্সার সঙ্গে আপস হয়। কেদারেশ্বরে যাই। এখানে এই একটা জিনিস বড়ো আশ্চর্য ; দূর হতে মন্দিরের চূড়া দেখা, তা আর হয় না। গলি দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা দরজার কাছে রিক্সা থামে ; বলে, 'মন্দির আ গিয়া।'

মাথা নিচু করে ঢুকি ; অন্ধকার পিছল পথে এগোই, আরো অন্ধকারে এগিয়ে যাই, আরো মাথা নোয়াই— তবে দেখি কেদারেশ্বরকে। এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো গোল পাথর খানিকটা বাঁধানো মেঝেতে— গিরিগোবর্ধনের মতো। শিবলিঙ্গ যেমন পাথরে কাটা গড়ন, এ তেমন নয় ; স্বাভাবিক পাথর।

পাণ্ডা কেদারেশ্বরের উপর হতে ফুল বেলপাতা সরিয়ে বললে, 'এই দেখো,

এই-যে উঁচুনিচু জায়গাটা, এখানে গৌরী আছেন। হর আর গৌরী।' ব'লে আমার হাতটা টেনে নিয়ে কেদারেশ্বরের মাথায় ঘষে দিল। শেওলায় পিছল গা, মাথামুণ্ডু বুঝলাম না কিছুই।

পাণ্ডা বললে, 'আঠারো বার কেদারবদরী যাওয়ার ফল হয় একবার এই কেদারেশ্বরে এলে।'

দাদা তাড়াতাড়ি কেদারেশ্বর ছুঁয়ে বললেন, 'একবারও যাই কি না যাই, আঠারো বার যাওয়ার ফলটা তো হয়ে থাক্ এক ধাক্কায়।'

পাণ্ডা ততক্ষণে বড়দিকে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে, 'মা, হুকুম করো বাবুকে, দশ সিকা কেদারেশ্বরকে ভোগ দিতে।' দাদা হাসেন, বলেন, 'কী আশ্চর্য মহিমা দেখো। আমি যে স্ত্রীর বশবর্তী, এক মুহূর্তে পাণ্ডা পর্যন্ত ধরে ফেলে তা।' ব'লে বড়দির হাতে টাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন সেখান হতে।

'ও বাবু, বাবু, মার শিঙ্গার দেখে যান।' পিছে পিছে ছোটে আর-এক পাণ্ডা।

কৌতূহলী মন আট্‌কে যায়। কাঠের দরজার ফুটো দিয়ে পাণ্ডা দেখায়—'ঐ দেখো।'

ঘরের ভিতর দূরে ঐ প্রান্তে পূজারী শাড়ি পরাচ্ছে গৌরীকে। গোলাপি রঙের সুতির শাড়ি; কুচি দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আঁচল চেপে কোমরে রুপোর কোমরবন্ধ এঁটে দিল। মালা চন্দন পরাল, সিঁদুরের ফোঁটা দিল, ধূপ বাতি জ্বালল। সন্ধ্যা-রতির আগে প্রসাধনের পালা শেষ হল।

পাণ্ডা বললে, 'বাঃ, কী কথা! চলে যাচ্ছ যে? মার শিঙ্গার এমন জিনিস, দেখিয়ে দিলাম আমি ; দক্ষিণা দাও ভালো করে।'

তিল-ভাণ্ডেশ্বরে কিন্তু এসব বালাই নেই। কেদারেশ্বর থেকে এখানে এসে তাই এত আরাম লাগল মনে।

প্রকাণ্ড তিল-ভাণ্ডেশ্বর ; ঘরের সাদা মেঝে জোড়া যেন কালো গম্বুজ একটি ; এঁর শিঙ্গার শেষ হয়েছে। লাল হলুদ সাদা ফুলের থাকে থাকে সবুজ বেলপাতার নিখুঁত সারি কী সুন্দর পরিপাটি—পালিশ-করা কালো পাথরের গা জড়িয়ে। মাঝ-খানটিতে রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে করেছে ঠিক যেন জটার চুড়ো মাথার উপরে।

শ্বেতপাথরের মেঝে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে পূজারী, আরতির আগে। ঘরে যাওয়া এখন নিষেধ। যেতে চায়ও না মন—এত পরিচ্ছন্ন।

দরজার কাছে বসে কেবলই মনে পড়ছিল—অবনীন্দ্রনাথ গল্প করেছিলেন তাঁদের কথকঠাকুরের বর্ণনা দিয়ে—'কালো কুচ্‌কুচে শরীর ; সে যখন পাঠ করতে বসত, যেন তিল-ভাণ্ডেশ্বর ঠাকুরটি।' সেই শুনেছিলাম নাম, আজ চোখে দেখলাম।

তিল-ভাণ্ডেশ্বর সকলের মনে প্রসন্নতা এনে দিয়েছে, সুতরাং আজ বিশ্বনাথের আরতি দেখা যাক। এখনও সময় আছে, গিয়ে পেঁছতে পারব। বিশ্বনাথের আরতি নাকি দেখবার জিনিস।

বড়দি বললেন, 'গতবার যখন আসি, আলাঝালা একটু দেখেছি লোকের মাথার ফাঁক দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে। কতটুকু আর—তাই-বা কত সুন্দর!'

শ্রীপাণ্ডা আমাদের আসল পাণ্ডা। তাকে ধরলেন বড়দি, 'পাণ্ডাঠাকুর, বাবার

আরতি দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের।'

পাণ্ডা বললে, 'হাঁ হাঁ, আমিই তো দেখাব। আমি না দেখালে কে দেখাবে? আসো আমার সঙ্গে।'

পাণ্ডা আমাদের নিয়ে বিশ্বনাথের ঘরের চার দরজার এক দরজার পাশে বসিয়ে দিলে। বললে, 'বসে থাকো, উঠে চলাফেরা কোরো না, জায়গা অন্য লোকে নিয়ে নেবে।'

সারা দিনের জলে কাদায় থৈ থৈ বিশ্বনাথের ঘর। ভিড় আট্‌কে রেখে দুজন পুজারী পরিষ্কার করছে মেঝে। রাশি রাশি ফুল পাতা শিবকুণ্ড হতে ছেঁকে ছেঁকে তুলছে ঝুড়িতে। শালুর টুক্‌রো দিয়ে মুছে মুছে শুক্‌নো করছে ভিজে জায়গা।

রুপোয় বাঁধানো শিবকুণ্ডের নল বোধ হয় খুলে দিয়েছে ভিতর হতে। দুধ-ঢালা সাদা জল অল্পে অল্পে বেরিয়ে যাচ্ছে সে পথ দিয়ে; আর ধীরে ধীরে মাথা তুলছেন বিশ্বনাথ তার ভিতর হতে।

'হর হর বোম্‌', 'শিবশম্ভু', বলে খর্বাকৃতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক; দু হাত বুলিয়ে শিবের গা পরিষ্কার করে দিতে থাকে হাঁটু গেড়ে সামনে বসে।

জল কমতে কমতে এবারে দেখা দিল বাঁধানো তাম্রবেড়ি। দু হাত মাথার উপরে তুলে বজ্রনিনাদে হেঁকে উঠলেন বৃদ্ধ— 'দাতা শিবশম্ভু কি জয় হো।'

সে ডাকে ভিতর বাহির থর্‌থর্‌ করে কাঁপল। ডাক থামে না, গুরু গুরু রব গুম্‌রাতে লাগল; যেন কালো মেঘের গর্জন, যেন বজ্রপাতের প্রথম সূচনা। সে সূচনা ফিরতে থাকল ছাদে, দেয়ালে, হাওয়ায়, মানুষে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। বিরতি নেই।

পুজারীরা বেরিয়ে গেল। ঘরে কেবল মুগ্ধ বৃদ্ধ একা। একটি কিশোর বালক এসে ঢুকল— ঘড়া-ভরা দুধ, ডালা-ভরা মালা, থালা-ভরা ভোগ, বাতি, পুজার নানা সম্ভার নিয়ে। কোনো দিকে লক্ষ নেই বৃদ্ধের; তন্ময় হয়ে দেখছেন বিশ্বনাথকে আর হাসছেন আপন মনে অঙ্গ দুলিয়ে।

বালক এগিয়ে বসে পুজার উপচার কাছে টেনে। ঘড়া তুলে দেয় বৃদ্ধের হাতে; বৃদ্ধ হুড়্‌ হুড়্‌ করে দুধ ঢেলে স্নান করান বিশ্বনাথকে। দুধের পর জল ঢালেন, জলের পরে দধি চুয়া মাখান। স্নানের পর্ব শেষ হলে প্রসাধনের পালা। রুপোর বাটি-ভরা চন্দন কুম্‌কুম্‌ হাতে ঢেলে চাপালেন শিবের মাথায়। ভিজে আতপ চাল ছড়িয়ে তিলক কাটলেন গায়ে। চন্দন-মাখা শিবের গা জড়িয়ে সাদা চালগুলি আট্‌কে থাকে বাহার তুলে। পাকা হাতের সাজ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দেখে সে কী তদ্‌গত ভাব বৃদ্ধের। বালক একটি-একটি পুজার সামগ্রী হাতে তুলে দেয়, আর আত্মহারা হয়ে পুজো করে এক আপন-ভোলা আর-এক ভোলানাথের। চন্দন মাখিয়ে সে যখন তাঁর অঞ্জলিপুট সামনে এনে বারে বারে কপালে ছোঁয়ায়— ভক্তির সেই রূপ দর্শকেরও অন্তর টলায়। পাথরের ঠাকুরের গায়ে ঐ হাত দুখানির কী কোমল স্পর্শ! 'আঘাত লাগল বুঝি এই'— এমনি দরদ আঙুলের ডগায়।

বালক এবার এগিয়ে দেয় সাদা ধুত্‌রোর গোড়ে; শিবের মাথায় যত্নে বসিয়ে দেন বৃদ্ধ সেটি। ধুত্‌রোর ঝালর ছড়িয়ে পড়ে শিবের মাথা ঘিরে। তার উপরে

চাপান গাঁদার বিড়ে ; বিড়ের উপর আবার ধুতুরোর গোড়ে ; আবার বিড়ে, আবার গোড়ে। এই করতে করতে থাকে থাকে উঁচু হয়ে বড়ো থেকে ছোটো হতে হতে ধুতুরোর চুড়ো উঠল মাথার উপরে। যেন বরফ পড়ল গৌরীশৃঙ্গের শিখরে।

সবশেষে এক ছড়া লম্বা আকন্দের মালা শিবের মাথা ঘুরে গড়িয়ে ভাসতে থাকল দুধজলের কুণ্ডে।

'হর হর শংকর', 'জয় জয় হরে' রবে শেষ হল পুজো।

দুজন পাণ্ডা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল ; ছোঁ মেরে মালাছড়া বৃদ্ধের গলায় ছুঁড়ে দিল, খাবলা দিয়ে শিবের মাথায় গাঁদা ধুতুরো তুলে নিল, চন্দন কুমকুম চেঁছে বাটিতে রাখল ; হুড়মুড় করে এগারো জন পূজারী এসে ঘরে ঢুকল।

আসল আরতি হবে এখন। এগারো পূজারীর ফুলের ডালা, দুধের ঘড়া, জলের কলসী, পঞ্চপ্রদীপ, দই, মিষ্টি, আসন, ডমরুতে ভরে গেল জায়গা। এগারো পূজারী ঘিরে বসল বিশ্বনাথকে। এগারো ঘড়া দুধ ঢালল, জল ঢালল। এগারো বাটি চুয়াচন্দন দধি মাখাল। এগারো গোছা বেলপাতা তুলসীমঞ্জরী মাথায় চাপাল। এগারো গাছি মালা ঝোলাল। রুপোর পঞ্চসাপের বেড়া এনে শিবের মাথা গলিয়ে বসিয়ে দিল ; পাঁচ সাপের পাঁচ ফণা শিবের উপরে শোভা পায়। ফণায় ফণায় মালা দোলে, মালায় মালায় কুণ্ড ছায়।

এগারো ঘণ্টা বাজিয়ে, এগারো বাতি জ্বালিয়ে আরতি করে এগারো পূজারী। দাউ দাউ কর্পূর জ্বলে, হাতের বুকের মাংসপেশী নাচে তালে তালে। হাওয়া কাঁপে মন্ত্রগানের শিহরণে ; ডঙ্কা বাজে, ডমরু বাজে, বাজে কাঁসর, শিঙা। এগারোটি তুলসীপাতা দিয়ে ভোগনিবেদন হয় রুপোর থালায় ; হুহুঙ্কারে জয়ধ্বনি দিয়ে লুটিয়ে পড়ে সবাই। বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতি শেষ হয়।

প্রসাদী কুমকুম মালা চন্দন মিষ্টি নিয়ে খোলা রাস্তায় এসে পড়ি। মনে হল যেন একটা পর্ব, একটা অভিনয়, একটা পালা দেখে এলাম। ব্রজরমণ বললেন, 'কেবল-মাত্র অভিনয় নয়, অভিনব অভিনয়।'

বড়দি বললেন, 'কত জন্মের পুণ্যফল ; এমন সর্বাঙ্গসুন্দর দর্শন হল তাই।'

পাণ্ডাকে শুধোই, 'আচ্ছা, পূজারীরা তো আরতি করলেন ; কিন্তু আগের বৃদ্ধটি কে?'

'ও একজন ভক্ত। পাণ্ডাদের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে, সবার আগে সে পুজো করে রোজ বিশ্বনাথের। ছোটো ছেলেটা নাতি।'

'আর সেই মেয়েটি? ঐ-যে, অল্প বয়েস, ছেলেমানুষ—উনিশ-কুড়ি বছরের কুমারী—খোলা চুল, কপালে সিঁদুর, পরনে লাল-পাড় গরদের শাড়ি—এল দুজন বাবুর সঙ্গে, বাপ দাদা হবে। "সাধুমা" "সাধুমা" বলে খাতির ক'রে তোমার সেই ভাইপো পাণ্ডা দোরগোড়ায় নিয়ে তাকে বসিয়ে দিল—কে সে?'

'তা জানি না কেউ। বাবার খেয়াল, কত রূপ ধরে আসেন তিনি, আমরা কী করে বলব?'

চমৎকার স্নানের ঘর, শোবার ঘর লাগা। কলের জল, ঝকঝকে মেঝে, ঘষা কাঁচের জানলা ; বিলাসী মনে আরাম লাগে এমন ঘরে স্নান করে।

সকালবেলা শাড়ি সাবান হাতে নিয়ে ঢুকতে যাই, বড়দি এসে ধমক লাগান, 'এখানে নাইবে কী? গঙ্গায় চলো।' বলি, 'আজ থাক্-না—'

'না, আজ ষষ্ঠী, বাসন্তীপূজার প্রথম দিন। গঙ্গায় স্নান করবে না, বলতে নেই এ কথা।'

তার পরদিন সপ্তমী। 'সর্বনাশ! সপ্তমীর দিন গঙ্গায় স্নান না করলে চলে?'

'মহাষ্টমীতে তো গঙ্গায় ডুব না দিলেই নয়। তিথি বলে তিথি? যাকে বলে মহা অষ্টমী!'

অষ্টমীর পর নবমী। 'এ যেমন-তেমন নবমী নয়, রামনবমী, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন। দিনে দিনে সংসার রসাতলে যাচ্ছে; ধর্মজগৎ ধ্বংস হচ্ছে, কোন্ পাপে ঘরে ঘরে এই দুর্গতি কে জানে? তুমি ঘরের বউ, ভাইয়ের আমার কল্যাণ হোক; চলো, মা-গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে আসি আগে এমন দিনে।'

নিষ্কৃতি নেই।

বিন্ধ্যাচলে যাবার ইচ্ছে, মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি সারি সারি। ঘাটের পথে যেতে-আসতে দর জিজ্ঞেস করি। যাতায়াতে আশি টাকা ভাড়া চায়; সকালে নিয়ে বিকেলে পৌঁছে দেবে এখানে।

বলি, 'কম হবে না কিছু?'

সে বলে, 'ঐ যা বলেছি কম করেই বলেছি; আপনারা বাঙালি, আমিও বাঙালি, তাই। এখন হরদম কত লোক যাচ্ছে বিন্ধ্যাচলে; তিথি পড়েছে। এসে দাঁড়াতে পারি না স্ট্যাণ্ডে। দরাদরি তো দূরের কথা, লোকে খোশামোদ করে নিয়ে যাবার জন্যে। আগামী দুদিনের জন্যে "বুক্ড" হয়ে আছি। পরশু চলুন। এখন গিয়ে কী করবেন? কী ভিড়! যাবেন যে, দেবীদর্শনই মিলবে না; ভিতরে ঢুকতেই পারবেন না।'

'পারবেন, পারবেন', ব'লে আর-এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার নেমে আসে পাশের ট্যাক্সি থেকে। বলে, 'পাণ্ডা আছে সেখানে, তাকে ধরলে ঠিক দেবীদর্শন করিয়ে দেবে। আমি রাজি আছি পঁচাত্তর টাকায়। চলুন।'

আগের ড্রাইভার চটে ওঠে; বলে, 'কাল আমি গেলাম; ভিড় কাকে বলে দেখে এলাম নিজের চোখে। জামাকাপড় ছিঁড়ে সব ঘর্মাক্ত কলেবর। যেতে চাইছেন যান; দর্শন পাবেন কি না বলতে পারি নে।'

ভাড়া আর ভিড়ের কথায় উৎসাহ দমে যায়। বড়দি জোড়হাতে এতদূর হতেই দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানান; বলেন, 'মাগো, অপরাধ নিয়ো না। এবার তোমায় দেখতে পেলাম না, তবে আশাও ছাড়লাম না। আবার টেনে এনো।'

কাশীতে আর কোন্ দেবদেবী বাকি রইলেন আঙুল গোনেন বড়দি।

গগন মহারাজ বললেন, 'বিকেলে আমার অবসর; সঙ্গে গিয়ে দুর্গাবাড়ি দেখিয়ে আনতে পারি। ওদিকে গেলে একসঙ্গে আরো অনেক মন্দির সেরে আসা যায়।'

প্রথমে আসি 'সংকট-মোচন'এ। বীর হনুমানের মন্দির। আগে এখানে বন ছিল; ঘন গাছপালা এখনো চার দিকে। তুলসীদাস এইখানে মহাবীরের দেখা পান;

এইখানেই মহাবীর তাঁকে পথ বাতলে দেন—কোথায় গিয়ে তপস্যা করলে দর্শন পাবে শ্রীরামচন্দ্রের।

গগন মহারাজ বললেন, 'ঐ-যে বলে, ভূতের মুখে রাম নাম—এক ভূতই তুলসী-দাসকে ইষ্টদর্শনের উপায় বলে দেয়। আহা, এর একটা ফিল্‌ম্‌ করেছে—দেখেছেন? অতি সুন্দর।

'কথিত আছে, তুলসীদাস প্রাতঃকৃত্যাদির পর ঘটির অবশিষ্ট জল একটা গাছের গোড়ায় ফেলে দিতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিন-চার দিন ঘর থেকে বের হন নি। ভালো হয়ে যখন আবার গাছে জল ঢাললেন, এক ভূত গাছ থেকে নেমে এসে বললে, এই জল খেয়েই আমি আছি এখানে। গত তিন-চার দিন জল পাই নি ; বড়ো কষ্ট গেছে। আজ জল পেয়ে তৃপ্তি অনুভব করছি। বলো, তোমার কী প্রিয় কাজ আমি সাধন করতে পারি?

'তুলসীদাস বললেন, আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা শ্রীরামের দর্শন। তাঁকে পাবার পথ বলে দাও।

'ভূত হাসল ; বললে, আমার যদি সেই জ্ঞানই থাকবে, তবে কি আমি ভূত হয়ে থাকি। রামভক্ত মহাবীরের শরণাপন্ন হও, তিনি বলে দিতে পারবেন। ঐ মন্দিরে রোজ রামনাম হয় ; সকলের আগে আসেন ও সকলের পরে যান, এক পাশে বসে থাকেন যে কুষ্ঠরোগী—তিনিই মহাবীর।

'তুলসীদাস গিয়ে সেই কুষ্ঠরোগীর পা জড়িয়ে ধরলেন। পুঁজ রক্ত গলে পড়ে গায়ে, ভ্রূক্ষেপ নেই। ছদ্মবেশ ছেড়ে তখন দেখা দিলেন মহাবীর। বললেন, চিত্রকূটে গিয়ে সাধনা করো, রামচন্দ্রের দর্শন পাবে।

'সেই তখন তুলসীদাস চলে যান চিত্রকূটে। প্রসিদ্ধ দোঁহায় আছে—

'চিত্রকূটকে ঘাটপর ভই সন্তন্‌কে ভিড়।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসৈ তিলক করৈ রঘুবীর॥'

'চিত্রকূটের ঘাটে সাধুসন্তের ভিড় জমেছে দেখতে—তুলসীদাস চন্দন ঘষছেন আর রঘুবীর তা নিয়ে তিলক কাটছেন।

'ভক্ত সাধকদের ঘরকন্না ইষ্টকে নিয়ে। এতে আমরা অবাক হই। কিন্তু তাঁদের কাছে তা কত সহজ।'

ইষ্টদেবকে পাবার সংকট হতে তুলসীদাসকে মোচন করেছিলেন বলেই মহাবীর এখানে 'সংকট-মোচন' নামে অধিষ্ঠিত। মহাভক্ত তুলসীদাস রামভক্তের তপস্যা করে প্রভুকে লাভ করেন।

পাশে রামচন্দ্রের মন্দির, ছোট্ট। সংকট-মোচনের প্রাধান্যই বেশি। গগন মহারাজ বললেন, 'দেখুন, ভক্তের কাছে প্রভু কেমন ছোটো হয়ে আছেন এখানে।'

তুলসীদাসের সমাধি পরিক্রমা করতে করতে দাদা বললেন, 'এক বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের আর সর্বত্রই তুলসীদাসের মহিমা প্রচার হয়ে আছে। বাংলাদেশকে নিমাই-ই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।'

'আর বলেন কেন, বাংলাদেশ যদি তুলসীদাসের মহিমা বুঝত তবে কি তার এমন দশা হয়? দেশটা "হরেকেষ্ট" "হরেকেষ্ট" করতে করতেই মরল।' ব'লে গগন মহারাজ এগিয়ে চলেন।

কথাটা বৈষ্ণব ব্রজরমণের মনে লাগে। বলে, 'মহাপ্রভু—'

'আরে, মহাপ্রভুর কথা রেখে দাও। তাঁর কথা আলাদা ; তাঁর পন্থীদের কথাই বলছি।' ব'লে গগন মহারাজ ঘুরে দাঁড়ান।

প্রকাণ্ড বট গাছ, গাছের আসল গুঁড়ি ক্ষয়ে গেছে কবে কোন্ কালে। ঝুরি নেমে নেমে এক গুঁড়ির বদলে এখন কত গুঁড়ি হয়েছে তলাটা ছেয়ে।

তুলসীদাস সাধনা করতেন এর নীচে বসে। সবচেয়ে মোটা ঝুরিটার গোড়া থেকে বড়দি খাম্‌চে এক খাবল মাটি এনে আমার ঝোলাতে ফেলে রাখলেন। বললেন, 'পবিত্র মাটি, ফেলে দিয়ো না যেন ভুলে।'

সেখান থেকে হেঁটে আসি দুর্গাবাড়ি। মন্দিরের গা-লাগা অতি পুরাতন জীর্ণ বিশাল তেঁতুল গাছ। না জানি এককালে কেমন ছিল এ দেখতে। এখন যেন পাক-খাওয়া শনের দড়ি। রেখায় রেখায় জর্জরিত গুঁড়ি, কুঁকড়ে-পড়া ডাল, শুক্‌নো রুক্ষ বুভুক্ষিত। মন্দিরের লাল পাথরের গাঁথনির গায়ে যত দেখি গাছটাকে, ততই চোখে ভাসে নন্দদার সেই ছবিখানা—ক্ষুধার্ত মহাকাল দাঁড়িয়ে আছেন মা অন্নপূর্ণার দ্বারে। হুবহু সেই ছবি। যেন সেই করাল দুটো দাঁত অবধি দেখা যায় ঐ গাছের বাকলে।

সারি সারি বানর বারান্দায় দেয়ালে। গগন মহারাজ বললেন, 'বানর যদি এসে খাবলে ধরে, কিছু না, হাত দুটো মেলে দাঁড়িয়ে থাকবেন চুপ করে। হাত বন্ধ থাকলেই ওরা ভাবে, খাবার আছে বুঝি।'

অঞ্জলিভরা ফুল বেলপাতা। বলি, 'বানর ফুল চেনে তো?'

'তা চেনে', আশ্বাস দেন তিনি।

সোনার দুর্গা। এই সোনারই নামডাক বেশি। সবাই বলে, 'সোনার দুর্গা দেখেছ? চলো সোনার দুর্গা দেখে আসি।'

সোনার মাথায় সোনার মুকুট ঝল্‌মল্ করছে। বিকেলের আলো গালে থুতিতে লেগে কেমন হাসি হাসি ভাব ফুটিয়েছে। আলোর এই খেলা বড়ো মজার। এই মজাতেই কখনো মূর্তি গম্ভীর দেখায়, কখনো তাতে রাগ ফোটে, কখনো-বা খুশিতে ঝল্‌মল্ করে।

সেদিন সন্ধেবেলায় 'কালভৈরব' দেখতে গেছি। গোপেশ্বর মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'কাশীতে ঐ বেটারই প্রতাপ বেশি। বিশ্বনাথের কাছে কে থাকবে না থাকবে, ঐ ঠিক করে দেয়। বড়ো রাগী। ওর কাছে গিয়েই আগে মনের কামনা বাসনা জানাবেন। ওকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই বিশ্বনাথের সঙ্গ মিলবে।'

সেদিন তাই গেলাম সেখানে। ভেবেছিলাম, না জানি কী ভীষণ মূর্তি হবে বুঝি-বা—কালো পাথরের কিম্ভূতকিমাকার। গিয়ে দেখি, তা তো নয়, দিব্যি সোনার মতো চক্‌চকে মুখ, বসনভূষণে ঢালা গা ; বেশ সহজ, নির্ভয় আবহাওয়া। আরতি শুরু হল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছি, ঘরের ভিতর পূজারীর কালো পিঠের ওদিকে বুকের কাছে হাতের পঞ্চপ্রদীপ নড়ে উঠতেই সে আলো গিয়ে পড়ল কালভৈরবের নাকে কপালে গালে গোঁফে ঘাড়ে। জ্বলে উঠল মুখ, যেন পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখার ছোঁওয়া লাগল সেখানে। রূপ ফুটে উঠল কালভৈরবের এতক্ষণে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি, ভয় করব কি করব না।

আরতির পর সবাই ভিতরে ঢুকে—পাশের বড়ো প্রদীপটা জ্বলে দিবারাত্রি, ঢাকনা খোলে উপর হতে—সেই ঢাকনা হতে আঙুলে কাজল তুলে নিল। দেখাদেখি আমি কাজল নিতে গিয়ে কালভৈরবের সামনাসামনি হই; দেখি, না তো, মুখখানা তো তেমন ভীষণ নয়। এরই মধ্যে বেশ খুশি-খুশি ভাব। পাশের প্রদীপের আলো এখন হাসি ফুটিয়েছে গালে।

দুর্গাবাড়ির মন্দিরের আঙিনা ঘিরে ঢাকা বারান্দা গলায়-দড়ি-বাঁধা কালো পাঁঠাতে ভরা। অগুন্তি বলি হয়ে চলেছে এ কদিন এখানে।

'নেই মিলেগা, যাও, পা পাকড়্‌না মত্‌' বলে দাদা রেগে পা-ঝাড়া দিতে গিয়ে হেসে ফেলেন। দেখেন, একটা বানর বাচ্চা বুকে নিয়ে বাবু দেখে পা ধরেছে এসে—খাবার চাই। দাদা ভেবেছিলেন হয়তো কোনো ভিখিরি ছেলে বুঝি।

একটা কালো পাঁঠাকে চেপে ধরে মন্ত্রপড়া ফুল সিঁদুর মাথায় দিচ্ছে পুজারী, যূপকাঠের সামনে। বলি হবে এখনই আবার একটা।

তাড়াতাড়ি বাইরের দরজায় এগিয়ে যাই। গগন মহারাজ বললেন, 'চলে গেলে চলবে না। সাক্ষীগোপালের কাছে সাক্ষী রেখে যান যে, এসেছিলেন এখানে।'

প্রত্যেক মন্দিরেই দেখি সাক্ষী থাকেন একজন। বিশ্বনাথেরও আছেন সাক্ষী গণেশ। হিসেবে ভুল হলে এ'রা সাক্ষী দেন যে, 'হ্যাঁ, এ ব্যক্তি এসেছিলেন আপনার কাছে।'

হানিফের মাও বলত—এসেছিল সেদিন, দেখি মুখ শুক্‌নো। বলি, 'কী হল? খাওয়া-দাওয়া কর নি?'

সে বলে, 'খাব কী। রোজা যে!'

বলি, 'এই তো একমাস রোজা করলে, ঈদ হয়ে গেল, আবার রোজা কেন?'

'সাক্ষীসাবুদ রাখতে হবে না? মরে গেলে যখন বিচার হবে, আল্লা প্রথমে কবুল করবে না; বলবে, না, তুমি রোজা কর নি। তখন, একমাস রোজার পর আবার এই-যে ছটা রোজা করলাম এরা সাক্ষী দেবে; বলবে, না, আমরা জানি এ রোজা করেছে। তারা সাক্ষী দিলে তবে গিয়ে ঠিক বিচার হবে।'

চলতে চলতে পিছিয়ে পড়েছি। গগন মহারাজ হাঁকলেন, 'ত্রৈলঙ্গস্বামী দেখলেন সেদিন, এবার তাঁর জুড়ি ভাস্করানন্দকে দেখবেন আসুন।'

তখন বেলা শেষ। পশ্চিম দিকের সূর্য সোজা এসে পড়েছে ভাস্করানন্দের শ্বেতপাথরের মূর্তিতে; যেন মানিক ঠিকরে ফুটছে।

রোগা চেহারা; ত্রৈলঙ্গস্বামীর বিপরীত। টিকোলো নাক।

দাদা বললেন, 'বোধ হয় ইনি পাঞ্জাবি ছিলেন।'

নেই যে মানুষ, হাজার জানলেও কেমন যেন মনে হয়, এই আছেন তিনি। এমনি একটা প্রভাব এ-সবের।

বড়দি শুধোন, 'হল কী, হাসছ যে!'

বলি, 'কল্পনা করো একটু, এই ফর্সা মানুষটি একদিন আলিঙ্গন করেছিলেন সেই কালো রঙের বিশাল ত্রৈলঙ্গস্বামীকে পথের মাঝে। হাতে বেড় পেয়েছিলেন

কী করে?'

শুনেছিলাম গল্প : ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, দুজন আছেন দুই প্রান্তে। কী একটা সমস্যার উদয় হল দুজনের মনে, একই সময়ে। দুজনেই চললেন একে অন্যের কাছে সমস্যার মীমাংসা করতে। মাঝপথে দেখা। আবেগভরে উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতেই পরস্পরের স্পর্শে ছিন্ন হয়ে গেল সংশয়। আর কিছু বলতে হল না ; হাসতে হাসতে ফিরে এলেন যে যাঁর পথে।

ত্রৈলঙ্গস্বামীও তো চোখের দেখা নয়, তবু যেন মনে স্থির জানি, দেখেছি তাঁকে। কত গল্পই তো শুনে আসছি মা-মাসির মুখে ছেলেবেলা থেকে। তিনি নাকি কাশীর ঘাটে ডুব দিয়ে উঠতেন গিয়ে দূরদেশের আর-এক ঘাটে, ঐ এক ডুবে। শিবের মাথায় 'অপকম্ম' করতেন। দারুণ গ্রীষ্মে চড়ার গরম বালিতে শুয়ে থাকতেন। শীতকালে গঙ্গার স্রোতে ভাসতেন।

গগন মহারাজ বলেন, 'সে কি একদিন দুদিন? ছ মাস জলের উপর চিত হয়ে ভেসেই রইলেন মরা মোষের মতো।'

তিনশো ষাট বছর জীবিত ছিলেন তিনি। কাশীতেই সমাধি। দেখতে গেলাম সন্ধের পর। অন্ধকার গলি, চাঁদের আলো পথ পায় না ঢুকতে। পথের এ-পাশের বাড়ির লম্বা ছায়া ও-পাশের বাড়ির বারান্দা ঢাকে পাল্টাপাল্টি ক'রে। ভুরু কুঁচকে পায়ের পাতায় তীক্ষ্ন নজর রেখে আগুপিছু পা ফেলে পেরিয়ে চলেছি সরু হতে সরুতর গলি। হঠাৎ গগন মহারাজ একটা জানলা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দেখুন ত্রৈলঙ্গস্বামী বসে।'

'কোথায়?' বলে অন্যমনস্ক আমি ঘাড় ফেরাই।

গগন মহারাজ বললেন, 'এই তো পিছনে ফেলে এলেন। আক্ষেপ নেই ; দেখা হবে। সদর-দরজা দিয়েই ঢুকব, একটু ঘোরা পথ হবে এই আর-কি।'

সদর-দরজায় ঢুকে দু সিঁড়ি উঠি, এক সিঁড়ি নামি ; চার পা এগোই, দু ধাপ ডিঙোই ; এই করে করে চাতালে আসি। মস্ত এক কালো পাথরের বসা মূর্তি মেঝের উপরে। গেরুয়া কাপড়ে সারা অঙ্গ ঢাকা। মাটির প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে রেখা মিলিয়ে দেখি। নাক মুখ কপাল ঠোঁট—সুপুরুষ যুবক। চির-তরুণ ভাব। জ্বল্ জ্বল্ করে সাদা পাথরের দুটি চোখ সে সুন্দর কালো মুখে। মনে হল না যে, এ পাথরের মূর্তি। যেন অন্ধকারে গা মিলিয়ে সত্যি সত্যিই বসে আছেন ত্রৈলঙ্গস্বামী। কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব : ছোট্ট আমি আরো ছোট্ট হয়ে গেলাম তাঁর সামনে।

গগন মহারাজ হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে হাতড়ে মূর্তির পা ছুঁলেন। আমিও হাত বাড়াই ; বসা মূর্তির উরুতে হাত ঠেকে। শিউরে উঠি। শুনেছি, তপস্যার কঠোরতায় মহাত্মাদের গা পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। মনে হল, সেই শক্ত গা'ই যেন স্পর্শ করলাম আমি।

মূর্তির পিছনে মা-কালীর মন্দির। এই দেবীই তাঁর উপাস্যা ; তাঁর হাতেরই পুজো পেয়েছেন এককালে। সামনের ছোটো আঙিনায় এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ, দু হাতে নাগাল পায় না এক পালোয়ানে। এতবড়ো শিবলিঙ্গ দেখি নি আগে।

গগন মহারাজ বললেন, 'এই শিবকে একদিন গঙ্গা হতে তুলে বগলে চেপে নিয়ে

এসেছিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী। সেই অবধি আছেন এখানেই।'

কী করে সম্ভব একজনের পক্ষে এ ভার তুলে আনা! শিব দেবতা হলেও পাথরও তো বটেন। পাথরের একটা ওজন নেই তা বলে?

কী জানি, ভাবনায় ভাবনা বাড়ে ; সহজ বিশ্বাসে শান্ত হই।

সংকট-মোচন হতে দুর্গাবাড়ি, দুর্গাবাড়ি হতে ভাস্করানন্দের সমাধি—কমখানি পথ নয়। ক্লান্তি লাগে। পাথরের ঠাণ্ডা বারান্দায় বসে পড়ি ধুপ্ করে।

দাদা বললেন, 'ভাস্করানন্দেরও কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে, তাঁর জীবনীতে পড়েছি। তিনিও লোকদের ওষুধবিষুদ দিতেন।'

বড়ো বড়ো সাধুরা শুনি অনেক সময়ে রোগীদের ওষুধ বিতরণ করেন। রোগ-মুক্তও হয় তারা, তাও শুনতে পাই। এখন কথা হচ্ছে, কতখানি শিকড়বাকড়ের গুণ, আর কতখানি যোগবলের গুণ! যোগবল যে একেবারেই নেই তা তো বলা যায় না। কত তো দেখা যায়, হাজার ওষুধেও যার ফল দিল না, তুচ্ছ একটা শিকড়-ধোয়া জলে কাজ দিল। তাকে কী বলব?

দাদা বললেন, 'শুনেছি, ভোলাগিরির কাছে এইরকম একজন এসে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। চোখে সে দেখতে পায় না কিছু, ওষুধ চায়। ভোলাগিরির দয়া হল ; সামনের বেড়াতে লতা বেয়ে উঠেছিল একটা, দেখিয়ে বললেন, যা, ঐ পাতার রস তিনদিন চোখে লাগা। সত্যি সত্যিই সে ভালো হয়ে গেল। কিছুদিন বাদে আর-একজন ঐরকম চোখে দেখতে পায় না, এসেছে ভোলাগিরির কাছে। তিনি তখন জপে বসেছেন। শিষ্য ভাবলেন, কেন মিছে বসিয়ে রাখা, ঐ একই লতা তো? বললেন, ঐ পাতার রসই লাগা গিয়ে যা। লোকটি বেড়ার গা থেকে পাতা ছিঁড়ছে, এমন সময়ে ভোলাগিরি বেরিয়ে এসে দেখে হাসলেন, বললেন, খালি পাতাতে কিছু নেই।'

গগন মহারাজ বললেন, 'সাধুসন্ন্যাসী দেখলেই ওষুধ চাওয়া, এ যেন একটা রোগ। শিক্ষিত লোকের মধ্যেও দেখেছি তা। একবারের কথা বলি, আমার নিজের কথা। সাহারানপুরে আমাদের এক পরিচিত বন্ধুর বাড়ি, বড়ো কাজ করে। তার মা বারে বারেই আমায় ডাকেন, বাবা, তুমি একবার এসো আমাদের বাড়িতে। কতবারই যাই ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় না। কাজ উপলক্ষে যাই, কাজ সারা হলেই চলে আসি। শুনে তিনি দুঃখ করেন। সেবারে মন ঠিক করে খালি তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই গেলাম সাহারানপুরে। বন্ধুর মা খুব খুশি। খেতে ভালোবাসি জানতেন ; হরেক রকম রান্না করে খেতে বসিয়েছেন। তখনো খাওয়া আরম্ভ করি নি ; ভাতটা সবে মেখেছি শুক্তো দিয়ে ; একটি পাঞ্জাবি বউ, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস, পাশের বাড়ির—সে এসে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল জোড়হাত করে সামনে দাঁড়িয়ে। অসোয়াস্তিতে পড়ে গেলাম। খাবার সামনে নিয়ে বসেছি, আর একজন এইভাবে কেঁদে চলেছে, অথচ ভাষা বুঝি নে। বন্ধুর মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, ও একটা ওষুধ চায় তোমার কাছে। সন্তান হয়ে হয়ে বাঁচে না বউ-টির ; আঁতুড়েই মরে যায়। তুমি সাধু ; তাই শুনে ছুটে এসেছে। বলি, এ তো বড়ো মুশকিল, আমি তো ওষুধবিষুদ জানি নে কিছুই। বউটি শুনবে না তা, আরো

বেশি কাঁদতে থাকে আর জোড়হাতে দয়াভিক্ষা করে। বন্ধুর মা বললেন, আহা, বেচারা এত কাঁদছে, কিছু একটু বলে দাও-না ওকে। বললুম, কী বলব? মিছা-মিছি কিছু বলে তো লাভ নেই কোনো। আমি যে ওষুধ কিছু জানি নে তা তো ভগবান জানেন, আর এই মেয়েটি যে সন্তানের জন্য আকুল তাও জানেন। তবে এইমাত্র কামনা করতে পারি, ভগবান যেন এর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।

'কিছুকাল বাদে বন্ধুর মা লিখলেন যে, সেই বউটির একটি সন্তান হয়েছে এবং সে জীবিত আছে। এখন একে কী বলবেন আপনি? আমি তো জানি, এর মধ্যে ওষুধের বা যোগবলের কোনো গুণ নেই।'

দাদা হাসলেন, বললেন, 'কিন্তু কী খবরটাই না বৃথায় গেল। কাগজে ছাপা হলে আপনার নামে হৈ হৈ পড়ে যেত।'

পথে বিষ্ণুমন্দিরে প্রণাম ঠুকে এলাম জগন্নাথ-বাড়িতে। কাশীতে এই একই জগন্নাথের মন্দির ; রথের সময়ে মেলা হয় এখানে।

গগন মহারাজ বললেন, 'চলুন, এবারে যা মূর্তি দেখাব, ভয় পেয়ে যাবেন।'

জগন্নাথ-মন্দিরের পিছনেই আর-একটা মন্দির। মন্দিরে ঘর-জোড়া ছাদ-সমান প্রকাণ্ড এক নৃসিংহদেব। হঠাৎ দেখলে আঁৎকে উঠতে হয় সত্যি। হাঁটুর নীচে পড়ে আছে ছোট্ট প্রহ্লাদ। নৃসিংহদেবের ডান হাত আলগোছে তার মাথায় ছোঁয়ানো, যেন বড়ো মায়া তাঁর এই বালকটির প্রতি ; আর বাঁ হাতে অভয়। এ ছাড়া আর দয়া-মায়ার চিহ্ন কোথায়ও নেই শরীরে।

ব্রজরমণ বললেন, 'শ্রীভগবানের এই রূপ দর্শন করিয়া শ্রীলক্ষ্মী পর্যন্ত ভীতা হইয়াছিলেন, নিকটবর্তী হইতে সাহস করেন নাই। এক ঐ প্রহ্লাদই নির্ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।'

তত্ত্বানন্দস্বামীও ছিলেন আমাদের সঙ্গে ; বললেন, 'নৃসিংহদেবের তো দু চোখ হবার কথা ; কিন্তু এখানে দেখছি, কপালের উপরেও আর-একটি রুপোর চোখ। ত্রিনয়নী মূর্তি তো মা ভগবতীর। ইনি পুরুষবেশধারী—'

পূজারীও জবাব জানে না এর। পূজাই করে যায় খালি।

যাক, তিন চোখ নিয়েই থাকুন নৃসিংহদেব ; আমরা এখন বাইরে গিয়ে হাঁফ ছাড়ি।

পুবকোনায় মন্দিরের দেয়াল ঘেঁষে এক অতি সুন্দর অশথ গাছ। লাল লাল কচি পাতায় ভরে আছে ডাল। হাওয়াতে হেলছে দুলছে লম্বা বোঁটায় ঝোলানো কোমল পাতাগুলি, যেন কচি শিশুর রাঙা গালের হাসি এক ঝুড়ি।

সন্ধের আবছা আলোয় ইঁট-বাঁধানো সরু পথ দিয়ে মাথা নিচু করে চলেছি কত কী ভাবতে ভাবতে। পথের দু পাশের ঢালু জমিতে ছোটো বড়ো নানান গাছের বাগান। দুজন মা শিশুদের ছেড়ে দিয়ে গল্প করছে মুখোমুখি ব'সে ঘোমটা তুলে ধরে। দুটি শিশু পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাঁজকরা কাগজ শূন্যে ছুঁড়ে ফেলছে। কাগজের ভাঁজে হাওয়া ঢুকে ফট্ করে একটা শব্দ হয়, তারা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে—'এই গিরা', 'এই গিরা', আর হাসে খিল্‌খিলিয়ে। যেন কল্পনায় কী পাড়ছে উপর হতে, শব্দতেই সন্তুষ্ট।

কাছে গিয়ে তাদের চোখে চোখ রেখে তাকাই উপর দিকে ; দেখি, সবুজ আমের গুটিতে ছেয়ে গেছে প্রতিটি কচি পল্লব। বোল এসেছিল কখন কোন্ ফাঁকে।

কুহু, কুহু।

পিচ-ঢালা পথ। পথের দু ধারে পাকা দালান ; ইলেক্‌ট্রিক তারে তারে জর্জরিত উপরের আকাশ। এর মাঝে কোকিল ডাকে কোথায় বসে?

দিক ঘুরে ঘুরে তাকাই।

ঐ-যে দোতলার বারান্দায় ভাঙা চিকের ফাঁকে লোহার তারের খাঁচা ; তার ভিতরে লেজ ঝুলিয়ে পোষা কোকিল ডাকে একা।

কাশীতে বিকেলবেলা গঙ্গায় নৌকোয় চড়ে বেড়ানো রেওয়াজ একটা। যে আসে, সকলেই একবার নৌকোয় চেপে গঙ্গার হাওয়া খায় ; অর্ধচন্দ্রাকারে গঙ্গাকে ঘিরে যে কাশীনগরী, তার শোভা দেখে।

আজ যাব, কাল যাব, করে হয় নি এতদিন। এখন সুযোগ ঘটল, সুবিধেও হল। আনন্দময়ী-মার আশ্রম এখানে, কাশীর প্রায় অপর প্রান্তে। গঙ্গার বুকে উঁচু বাঁধানো ভিতের উপরে দোতলা প্রাসাদ। এক পাশে একটি মন্দির। এই কিছুদিন আগে আনন্দময়ী-মা বিরাট সাবিত্রীযজ্ঞ প্রতিষ্ঠা করেছেন ; সেই ধুনির আগুন এখনো জ্বলছে তালাবন্ধ মন্দিরে। গত ক বছর নাকি সমানে জ্বলেছে যজ্ঞসাঙ্গ উপলক্ষে। প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচজন মহাত্মাকে বরণ করেন আনন্দময়ী ; সেই পাঁচ-জনের একজন ছিলেন 'হরিবাবা'।

আঙিনার সামনের মণ্ডপে বাসন্তীপ্রতিমা, বহু লোক এসে জমেছে সেখানে।

গঙ্গার ধার ঘেঁষে একটা জায়গায় সুড়ঙ্গের মতো সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। জোড়া জোড়া জুতো আছে বাইরে পড়ে। আমি বড়দিও নেমে যাই তাদের নিশানা করে।

প্রকাণ্ড এক 'হল'। গঙ্গা হতে যে উঁচু ভিত উঠে গেছে উপরে তারই গায়ের ভিতর এই লম্বা ঘর। নামতে নামতে মনে হয় যেন নেমে এলাম গঙ্গাতেই। ছল্ ছল্ শব্দ করে গঙ্গা দেয়াল ছুঁয়ে যেতে যেতে।

গ্রীষ্মকালে না জানি কত ঠাণ্ডা থাকে এখানটা। ঘরের চার দিকের দেয়ালভরা আনন্দময়ীর ফোটো। কখনো তিনি ফুলের মালা চুড়োয় জড়িয়ে বাঁশি হাতে কৃষ্ণবেশে ; কখনো নানা অলংকারে ভূষিতা রাজরানীর মতো সিংহাসনে ; কখনো ভাবে বিভোর, দু পা দাওয়ায় ছড়িয়ে ; কখনো-বা প্রসন্ন দৃষ্টিতে 'গুরুপ্রিয়া'র দিকে তাকিয়ে। এর মধ্যে একখানা ছবিই বড়ো ভালো লাগল চোখে—সমুদ্রতীরে হেঁটে আসছেন আনন্দময়ী-মা, ঢেউয়ে ভিজে যাচ্ছে পায়ের পাতা, ভিজছে শাড়ির লাল পাড়, এলোমেলো উড়ছে মাথার খোলা চুল, সহজ ভঙ্গি, স্বাভাবিক হাসি ; গ্রামের মেয়ের মতো দু-ফেরতা দিয়ে আঁটসাঁট পরনের শাড়ি।

বড়দি বললেন, 'ইনি তো আমাদের গ্রামেরই বউ, সাদাসিধে, অশিক্ষিতা ; যেমন হয় আর-কি সচরাচর। শ্বশুরবাড়ি এসেছেন ; রাঁধতে বাড়তে ভাবে বিহ্বল হয়ে

যান, বাসি কাজের পাট পড়ে থাকে, উনুনে তরকারি পোড়ে, খেয়াল থাকে না তাঁর কিছুতে। সবাই বললে, পাগল বউ। অসন্তোষ ছড়ায় তাদের মনে। কার ভিতরে কী সাধনা সঞ্চিত থাকে কে জানে? পূর্বজন্ম বিশ্বাস করি কি সাধে? নয়তো ঐ গ্রাম্য বউ কিসে এমন হল যে, দেওঘরের বালানন্দ স্বামীর কাঁধে চেপে বসে। বালানন্দ হেসে বলেন, বেটি তো সিংহবাহিনী হ্যায়।'

একটি অল্পবয়সের গিন্নি এসে প্রণাম করলেন বড়দিকে। বড়দির মুখে রা নেই। অবাক নেত্রে তাকিয়ে দেখেন। বললেন, 'তুমি এখানে? আমরা ভেবে মরি কত কী। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল একটা গোটা পরিবার! ভাবনার অন্ত রইল না। মেয়েরা কোথায়?'

'মেয়েরাও এখানেই। ওদের জন্যেই তো পালিয়ে এলাম। বন্ধুরা পরামর্শ দিল, জানতে দিয়ো না কাউকে যে চলে যাচ্ছ। তবে আটকে ফেলবে। তাই একদিন বিকেলে বাপের বাড়ির নাম করে পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে সোজা পালিয়ে এলাম কাশীতে। বাপের বাড়ির শ্বশুরবাড়ির কাউকে জানাবার ভরসা হল না। কোথা দিয়ে কে জেনে ফেলবে, শেষে পথেই না বিপদ ঘটায় কোনো। এসে তো পড়লাম, এখন দিন চলে না ; কী খাই, কী পরি? আছি শহরেই একখানা ঘর নিয়ে, আশ্রমের এক জানাশোনা স্বামীজিই ঠিক করে দিলেন ; নিজে ঘুরে ঘুরে এর ওর দু-চারটে জামা কাপড় সেলাই করে দিই। কিন্তু এমন করে কদিন চলবে?'

আড়ালে এসে বড়দি বললেন, 'জান, এ হচ্ছে আমাদের অমুকের মাসি। পরমা-সুন্দরী দুটি বয়স্থা মেয়ে, কলেজে পড়ত। দেশ ভাগ হয়ে গেল, দুর্বৃত্তের টালা-নিতে ইজ্জত রাখতে পারে না আর। শেষে, মস্ত কাইকারবার সব ফেলে রাতারাতি বাপ-মা মেয়েদুটিকে নিয়ে উধাও হল। আমরা পাঁচ কথা ভেবে মরি। সচ্ছল অবস্থা ছিল এদের : এখন দেখো কী পরিণাম!'

আনন্দময়ী-মার আশ্রমের ঘাটেই নৌকো মিলল। মাথা-পিছু দু আনা নেবে, দশাশ্বমেধ-ঘাটে পেঁাছে দেবে।

নৌকো ছাড়ল স্রোতের উল্টো মুখে। মাঝি বৈঠা ঠেলে দু হাতে দু দিকে। ঝপ্ ঝপ্ বৈঠা জলে পড়ে, ধীরে ধীরে নৌকো এগোয়। ওপার শান্ত, স্থির ; আকাশে ঢাকা দিগন্ত, যেন কোন্ রহস্যময় কুহেলিকার আবরণ। কেবল রাজবাড়ির একটা তীব্র আলো কানা দানবের এক চোখের মতো জ্বলতে থাকে অন্ধকারে।

দলে দলে বলাকা উড়ে চলেছে মাথার উপরে আকাশের গায়ে। দু-একটি পিছিয়ে পড়ছে ; ডেকে ডেকে সাড়া নেয় আগের দলের। গলুয়ের মাথায় একলা আমি, সন্ধান করি সে পথের। মিলিয়ে যায় পথ, মিলায় যাত্রী।

ফুলের মালা আসে একছড়া জলে ভেসে। কোন্ দেবতার গলার মালা, কোথায় গিয়ে ঠেকবে, কে জানে!

রাজকন্যা মাথার চুল ফুলের পাপড়িতে জড়িয়ে ভাসিয়ে দেন জলে, নাইতে নেমে ঘাটে। রাজপুত্তুরের বুকে এসে ঠেকে তা দেশদেশান্তর পেরিয়ে আর-এক ঘাটে স্রোতের টানে। রাজপুত্তুর তুলে নেন ফুল। পাগল করে একগাছি চুল, খুঁজে খুঁজে বের করেন কেশবতী রাজকুমারীকে।

হাত বাড়াই মালাটি ধরতে। সাঁঝের চামেলির মালা হেলতে দুলতে চলে যায় নাগালের বাইরে।

গম্ গম্ আওয়াজে চম্‌কে উঠি। এসে গেছি শহরের কাছাকাছি। ঘাটে ঘাটে লোকের ভিড়, আরতির ধ্বনি। সজীব প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া। প্রচণ্ড কোলাহল। মনে হল যেন কোন্ মহাধ্যান ভেঙে এসে পড়লাম হাটের মাঝে। মা যেন নামিয়ে দিলেন কোলের শিশুকে দুম্ করে মাটিতে।

গগন মহারাজ বললেন, 'ঐ দেখুন ফ্লাড-লেবেল। ঐ যে উঁচু মন্দির, গায়ে সাদা দাগ, ঐ অবধি উঠেছিল জল আটচল্লিশ সালে। শহর ভেসে গিয়েছিল, আমাদের আশ্রমের পথে নৌকো চলত। তবেই কল্পনা করুন, কত বড়ো ফ্লাড হয়েছিল।'

নীচে গঙ্গার জলে একটা বড়ো শিবমন্দির, নাটমন্দির নিয়ে বুক-জলে ডুবে কাত হয়ে আছে; প্রতি ক্ষণেই মনে হয়, এই বুঝি পড়ল ধ্বসে। বললাম, 'সেই ফ্লাডেই বুঝি এটা এমন হল?'

'আরে না; ছোটোবেলা থেকে দেখছি এ মন্দির এই অবস্থায়। আমাদের আগে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও বলেন ঐ একই কথা। গল্প আছে, একজন তার মার নামে মন্দির গড়িয়ে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে বললে, এতদিনে আমি মাতৃঋণ শোধ করলাম। যেই বলা, অমনি মন্দির ধ্বসে নীচে বসে গেল। সেই থেকে এই মন্দির একই ভাবে আছে। এত যে বড়ো ফ্লাড হয়ে গেল সেবার, আসবার সময় দেখলেন তো পাড়ের অন্য ঘাটগুলি কীভাবে ভেঙে পড়েছে, হাজার হাজার বালির বস্তা দিয়ে এখন আটকে রাখা হয়েছে;—আর এই মন্দির ঠিক যতখানি হেলানো ছিল ততখানিই হেলে রইল, এক চুল এদিক ওদিক হল না।'

শুনে, 'মাতৃঋণ অপরিশোধ্য', বলে ব্রজরমণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ঘাটে নেমে হাতে মুখে জল দিয়ে নিলেন বড়দি। বললেন, 'তুমিও দাও, আরাম পাবে। কী দেখছ কী ওদিকে অমন উপুড় হয়ে?'

বলি, 'সেই ছাইরঙের বেড়ালটা।'

আজই সকালে দেখেছিলাম নাইতে এসে ঘাটের পথে, এক জমাদারনী ছেঁড়া শাড়ির নকশা-পাড় কোমরে বেঁধে মরা বেড়ালটাকে হেঁচ্‌ড়াতে হেঁচ্‌ড়াতে নিয়ে চলেছে সামনে দিয়ে। এই ঘাটের কাঠের পাটাতনের ফাঁকে এসে আটকা পড়ে আছে এখন সেটা।

ঘাটের উপর এক দোকানে বিজলি বাতির নীচে ভিড় জমেছে।

ফ্রেমে আঁটা মা-দুর্গার রঙিন ছবির পিছনে কী কল বসিয়েছে দোকানি; কল চলে টিক্ টিক্, তালে তালে সামনে নড়ে দুর্গার ঘাড়, হাতের তলোয়ার, আর নড়ে কোলে-তোলা ডান পায়ের পাতাখানি।

শেষ পর্যন্ত বিন্ধ্যাচল যাওয়া ঘটে উঠল। পথে চলতে-ফিরতে গাড়ি দেখলেই জিজ্ঞেস করি, 'বিন্ধ্যাচলে যাবে, কত নেবে?' এ যেন একটা অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেল। আজ গঙ্গা হতে স্নান সেরে ফিরছি, পথে একটা খালি স্টেশন-ওয়াগন দেখি, বলি,

'বিন্ধ্যাচল যাবে?' এক কথাতেই রাজি হয় সে। কিন্তু পাঁচজন আর ড্রাইভারকে নিয়ে ছজন, এর বেশি লোক নিতে রাজি হয় না। বলে, 'যেতে তো পারেন অনেকেই, এতবড়ো গাড়ি যখন ; কিন্তু পুলিশ পাকড়ালে কে সামলাবে? আপনারা নেবেন দায়িত্ব?'

দাদা বললেন, 'থাক্ থাক্ ; অত কথায় কাজ কী? আমরা কজন, তত্ত্বানন্দ স্বামী আর গিরিজা ব্রহ্মচারীও যেতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নিলেই হবে।'

বড়দি বললেন, 'আহা, সেই-যে বরিশাল থেকে এক স্বামীজি এসেছেন, তিনিও যেতে চেয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে।'

ভিজে কাপড়ের বোঝা একছুটে বারান্দার দড়িতে ঝুলিয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসি। বেলা বেড়ে গেছে, সূর্য প্রায় মাথার উপরে। গরম হাওয়ার ঝলক চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। উঁচুনিচু পথ ; ভাঙা গদির উপরে বসে নাচতে নাচতে চলি ; জানলার কাঁচ ঝনর্-ঝন্ বাজে।

শহরের হট্টগোলের শেষে, বড়োলোকের শখের বড়ো বড়ো পোড়ো বাগানবাড়ি। শার্সি কপাট ভেঙে পড়া, ফল-পাকুড়ের গাছে ভরা সোনসান পল্লী। এও ছাড়িয়ে এবার এসে পড়ি খোলা পথে। দিগন্তজোড়া মাঠ দু ধারে ; পাকা শস্য কেটে ঘরে তুলেছে চাষী। হা হা করে শূন্য খেতগুলি কড়া রোদের মরীচিকা বুকে নিয়ে।

পুরোনো নিম তেঁতুল অশথ গাছের ছায়ায় ঢাকা পথ, তার ভিতর দিয়ে মোটর চলেছে আর্তনাদ করে।

ঝিমুনি এল চোখে। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে রাখলাম, পা দুটো সামনে ছড়ালাম। একটা অবশ আলস্যে নিজেকে এলিয়ে দিলাম।

মহুয়া ফুলের গন্ধ পাই যেন! মহুয়া ফুটতে আরম্ভ করেছে কি?

আমাদের আশ্রমে এই সময়ে কত ভিড় জমে মহুয়াতলায়। রসে-টুব্‌টুব্ মহুয়ার ফল তলা ছেয়ে থাকে। ভোর না হতে এসে কুড়োয় সাঁওতাল মেঝেনরা কোঁচড় ভরে। টাটকা খেয়ে যা বাঁচে, রেখে দেয় রোদে শুকিয়ে ; অদিনের দিনে খেতে আরো বেশি সুখ।

কিন্তু এরই মধ্যে মহুয়া ফুটতে শুরু হল? তবে তো শাল ফুলও পারব না ধরতে, ফিরে গিয়ে। এই একই সময়ে ফোটে। ফোটার পালা, ঝরার পালা সব শেষ হয়ে যাবে যে যেতে যেতে। এই তো আসার আগে একদিন শালবীথিতে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, এক মেঝেন বাঁশের ডগায় কাস্তে বেঁধে চক্‌চকে সবুজ পাতা-সমেত শালের ডাল ভাঙছিল মট্ মট্ করে। ভাত খাবার থালা বানাবে পাতা দিয়ে, শুকনো ঘাসকাঠি গেঁথে। দেখে ধম্‌কে দিলাম, 'কী করিস মেঝেন, ফুল ফুটবে আর কদিন পরে ; অমন করে ভাঙতে হয় সামনের ডালগুলো? পাতার দরকার, ভিতরের ঐ গাছগুলো থেকে নে না গিয়ে।'

ফুলের দিনে কী বাহার খোলে শালবীথির! তলা ছেয়ে যায় গুঁড়ি গুঁড়ি ফুলের পাপড়িতে ; যেন কাটা উলের সাদা পুরু গদি পড়ে থাকে লাল কাঁকরের উপরে। ভোমরার গুন্‌গুনানি, ফুলের সৌরভ, হাওয়ায়-ঝরা হাল্‌কা পাপড়ির ঝরনা—সে এক দিবারাত্রির মহোৎসব, মন-মাতানো মিহি সুরের কীর্তন।

ফিরে যখন যাব দেখব, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে খালি গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে কড়া রোদ মাথায় নিয়ে, কালবৈশাখীর খ্যাপা ঝড় বুক পেতে নিতে। লাল ধুলোতে শুক্‌নো পাতার গড়াগড়ি। গিয়ে কি কেবল এই-ই পাব?

তা কেন? আছে মধুমালতী; পথের বাঁকে বাঁকে আকুল করবে উদাস মন। আছে বেলফুল ঘরের আঙিনায়। মুচকুন্দ আমন্ত্রণ জানাবে হাওয়ায় হাওয়ায়, ভাবনা কি?

জোলো বাতাস এসে লাগল মুখে। চোখ খুলে দেখি, গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছে গাড়ি, ধীরে সাবধানে।

লোহার বয়ার উপর বাঁধানো পুল। বর্ষার বেগে খুলে যায় ফি বছর, আবার জুড়ে নেয় জল কমলে। ওপারে মির্জাপুর শহর, আরো এগিয়ে বিন্ধ্যাচল।

কী পরিষ্কার গঙ্গা টল্‌ টল্‌ করে জল। হরিদ্বার ছেড়ে এমন গঙ্গা দেখি নি আর। কাশীর গঙ্গায় নেই সেই আনন্দে-উপ্‌চে-ওঠা স্রোতের ঝংকার, নেই সেই উচ্ছল গতি সব-কিছু ভাসিয়ে নেবার। সে যেন সহ্যশীলা স্নেহময়ী মা, বুকে ধরে নিয়ে আছে সবাইকে— স্থির গম্ভীর।

বড়দি বললেন, 'চলো, আগে বিন্ধ্যাচলের গঙ্গা স্পর্শ করি।'

বলি, 'স্পর্শ নয়, স্নানই করব মাথা ডুবিয়ে।'

কিন্তু বাড়তি কাপড় যে আনি নি সঙ্গে। তা হোক। এতদিন এত ঘাটে স্নান করলাম, এত লোকের স্নান দেখলাম, তাদের একটা স্নানের পন্থা আজ লাগাই কাজে আমরা।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কী আরাম! রোদের জ্বালা স্নিগ্ধ হল।

বড়দি বললেন, 'গা মুছব কী দিয়ে?'

বলি, 'মুছবার দরকার কী? গরম হাওয়ায় গায়ের জল গায়েই শুকোবে দেখো।'

দেখাদেখি দাদা ওঁরাও জলে নামেন। বলেন, 'এই গরমে ঠাণ্ডা জলের লোভ সামলানো দায়।'

স্নানের পরে চললাম বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শনে, এখানে আজ আসাই যাঁর জন্যে এত কাণ্ড করে। এক দিকেই ছুটছে ভিড়ের মাথা, ফেরে বোধ হয় অন্য পথে। মেলা বসে গেছে পথের দু ধারে, সারি সারি দোকান। মাঝের সরু পথ যেতে যেতে থেমেছে গিয়ে একেবারে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের সামনে। মুরুব্বিমতো এক পাণ্ডার আশ্রয় নিতে সে আমাদের নিয়ে উঠল মন্দিরে। উঠে দেয়াল ঘেঁষে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভিড় আগলে রইল দু হাত মেলে।

ছোট্ট দরজা, মাথা নুইয়ে লোক ঢুকছে ভিতরে হুড়মুড়্‌ করে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডা-ভলেণ্টিয়ারের দল ভিড় সামলাতে গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে এ-ওর ঘাড়ে। যেন পাগলা হাওয়ার দাপট চলছে এখানে; থামায় সাধ্য কার? তুমুল তাণ্ডব, কে কাকে রক্ষা করে। ঢোকে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে, বেরিয়ে আসে রক্ত মুখে নিয়ে। কী জ্বলছে ভিতরে? ভাবতে গিয়ে আঁৎকে উঠি। ঢুকে কি বের হয়ে আসতে পারব প্রাণে বেঁচে?

হাঁটু মুড়ে উঁকি মেরে দেখি, ছোট্ট কুঠরির মধ্যে ঠাসাঠাসি জোড়া জোড়া পা। কালো ফর্সা শক্ত নরম, সালোয়ারে-ঢাকা, খাড়ু-মলে-মোড়া পাগুলি ধীরে ধীরে

এগোতে গিয়ে পিছোচ্ছে ; আর ডাইনে বাঁয়ে টাল খাচ্ছে।

দেবীর কাছে যাওয়া দূরে থাক্, দূর থেকেও দেবীর দর্শন পাচ্ছে না লোক, ফিরে আসছে, কোনোমতে মন্দিরে একবার ঢুকতে পেরেছে এই তৃপ্তিটুকুই সম্বল নিয়ে।

দেবীর দোরে এ কী বিড়ম্বনা! এত আশা আকাঙ্ক্ষা লোকের, কীই-বা এমন অদেয় ব্যাপার? একটু দর্শন, একটিবার পা ছুঁয়ে ভক্তিনিবেদন, এইটুকুই তো চায় তারা। তাতে কেন এত বাধা? কেন এই বেড়ার আড়াল গাঁথা দেয়ালের পরতে পরতে?

ওমা! কখন এসে গেছি সবাই কুঠরির ভিতরে। কেবল কুঠরিই নয় ; কুঠরির ভিতরে যে আর-একটি কোণঠাসা কুঠরি পিতলের শিকে ঘেরা ; তার ভিতরে বিন্ধ্য-বাসিনী। এসে দাঁড়িয়েছি তাঁর সামনে।

শাড়ি-ফুলেতে ঢাকাঢুকি। বড়দি হাতড়ে খোঁজেন কোথায় মার পা।

মূর্তি নজরে পড়ে না। কেবল মুখের উপর নাকের গড়ন অনুমান করা যায় খানিক। এ যেন কোনো মূর্তিকারের তৈরি দেবীমূর্তি নয় ; পাথরের গা ক্ষয়ে আপনিই প্রকাশ। স্বয়ংভূতা।

যেমন ঢুকেছিলাম তেমনিই বেরিয়ে আসি অতি নির্ঝঞ্ঝাটে।

বড়দি আনন্দে অধীর। বললেন, 'রানী রে, কার পুণ্যের জোরে আজ এমন হল, দেবীর পা ছুঁয়ে এলাম, গায়ে আঁচড়টি লাগল না!'

বলি, 'সে আমি নই বড়দি— নিঃসন্দেহ। আমি তারক ভট্‌চাজ্জির ছোটো-মা!'

তারক ভট্‌চাজ্জির দুই মা। ঘর-জামাই কুলীন বাপ বিয়ে করেছিলেন ছোটো-মাকে, প্রথম শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে ভিন গাঁয়ে। সেই ছোটো-মার একটিমাত্র মেয়ে দুলি, বছর না ঘুরতে ফিরে এল নোয়া-সিঁদুর মুছে। ছোটো-মা কাঁদেন হাউ হাউ করে প্রতিবেশিনীর গলা জড়িয়ে— 'দিদি গো, এ কী হল আমার।' দিদি সান্ত্বনা দেন— 'কী করবেন ; যার যেমন কপাল। কপাল ঠেকাবেন কী দিয়ে? দুলির কপালে আছে দুঃখ, আপনি কেঁদে কি কমাতে পারবেন? তার চেয়ে বুক বাঁধুন, মেয়েটার দিকে চেয়ে নিজেকে শক্ত করুন। তার অদৃষ্ট মন্দ, কে কী করতে পারে? নয়তো দেখুন না, আপনি তো এই সাদা চুলে সিঁদুর পরছেন এখনো।' ছোটো-মা বললেন, 'ও দিদি, তা আমার কপালের জোরে না। আমার জন্ম ঘোর অমাবস্যা-দিনে। সবাই বলল, বিয়ের রাত্রেই বিধবা হবে এই মেয়ে। আমি তো সিঁদুর পরে আছি আমার সতীনের কপালের জোরে।'

মন্দিরের বাইরে এক পাশে সাতটা হবন জ্বলছে যজ্ঞকুণ্ডে। আজ পূর্ণাহুতি। ভস্মের স্তূপ যেন ছোটোখাটো সাতটি মন্দিরের সাত চূড়া। সাত হবনের ভস্ম নিলাম মাটির হাঁড়ি কিনে।

বড়দি বলেন, 'গ্রাম দেশ, আপদবিপদে কত উপকারে লাগে এ-সব।'

আর পাশে একটা মাটির ঢিবির উপরে বড়ো একটা নিমগাছ, গোড়ায় পোঁতা বাঁশের খুঁটির ডগা উঠেছে গাছ ছাপিয়ে ; লাল ঝাণ্ডা উড়ছে তার মাথায়।

পাণ্ডা বলল, 'প্রণাম করো এখানে। নবরাত্রিতে মা এই ঝাণ্ডাতে এসে থাকেন।'

দাদা বললেন, 'হায় রে, তবে কেন এত কষ্ট করে গেলাম ভিতরে। মার দর্শন তো ঘটে নি আমাদের তা হলে।'

পাণ্ডা তৎপর উত্তর দিলে, 'না না; দর্শন তোমাদের হয়েছে বৈকি। একটু আগেই দশমী পড়েছে কিনা, মা ফিরে গেছেন মন্দিরে।'

পাণ্ডার সঙ্গে চুক্তি ছিল আমাদের দেবীদর্শন করিয়ে দেবার।

কথা শুনে দাদা হেসে পিছন ফিরে তাকান বড়দির দিকে। বড়দি ততক্ষণে নিমের গোড়া খুঁড়তে লেগেছেন আঙুল দিয়ে। মাটি নেবেন একটু।

আড়াই মাইল দূরে অষ্টভুজার মন্দির, পাহাড়ের উপর।

তিন কোনায় তিন দেবী অধিষ্ঠিত বিন্ধ্যাচলে। তিনজনেই আড়াই মাইল ব্যবধান রেখেছেন একে অন্যের কাছ থেকে। বড়দির ভাই দেখলে বলতেন, 'বুদ্ধিমতী নারী।'

তিন দেবী—বিন্ধ্যবাসিনী, অষ্টভুজা, ভোগমায়া। একটিকে দেখলে আর-দুটিকেও দেখতে হয়, নয়তো নাকি তাঁরা 'কুপিতা' হন। এত কাণ্ড করে আসা, কী দরকার কাউকে চটিয়ে?

খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠি। চাপ লাগে বুকে; থেমে থেমে পিছন ফিরে দূরের দৃশ্য দেখি; সাথিদের দাঁড় করাই। বলি, 'দেখে নাও, ঐ সবুজ বনের প্রান্তে বালির চড়ার বুক চিরে নীল গঙ্গা কেমন চলেছে এঁকে বেঁকে। গঙ্গা না হয়ে এ যমুনা হত তো মানাত ঠিক।'

ঘন বনের ভিতর উঁচু পাহাড়, তার উপরে দেবীমন্দির। তিথি-উৎসবেই ভিড় হয় লোকের, অন্য সময়ে কে আর আসে তেমন? লোকজনের বাস নেই, দেখি না তো আশে পাশে কাউকে। শুনেছিলাম আনন্দময়ী-মার আশ্রম আছে এ পাহাড়ে। বেশির ভাগ সময় তিনি থাকেন এখানে। ও-পাশে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঐ-যে সুন্দর সাদা বড়ো বাড়িটা ওটাই কি তবে তাঁর? থাকবার মতোই মনোরম জায়গা। কত দূর অবধি দৃষ্টি চলে যায় বিনা বাধায়। ছেড়ে দিতে পারলে মনও যায়।

মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই; আর বোধ হয় দেরি নেই পোঁছোতে। উৎসাহে টপ্‌কে টপ্‌কে সিঁড়ি ভাঙি; হাজির হই অষ্টভুজার দুয়ারে। পাহাড়ের ভিতর গুহা, গুহার ভিতর দেবী। নিচু, চাপা, অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। কোমর অবধি ঝুঁকে প'ড়ে, হাঁটুতে বুক চেপে, পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে গুহার শেষে গিয়ে ঠেকি। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। সেই অবস্থাতেই ঘাড় তুলি। একটিমাত্র মাটির প্রদীপ, তারই আলোতে দেখি অষ্টভুজার মুখ—যেন কালো রূপসী মেয়েটি। অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছে মা, ভয়ে, এই কালো পাথরের বুকে, আঁধার কোণে। বড়দি বললেন, 'আমাদের অবস্থা—পূর্ববঙ্গে!'

পাহাড়ের গা হতে প্রদীপের শিখার কাজল আঙুলে তুলে এনে বাইরে এসে চোখে দিলাম। চোখ দুটো জ্বালা করে জলে ভরে এল।

এবার বাকি রইলেন ভোগমায়া, পাহাড়ের অপর প্রান্তে। দুটিমাত্র পথ—এক, নীচের ঢালু রাস্তা; আর, পাহাড়ের মাথায় মাথায়। এতখানি উঠেছি, আবার নীচে

নেমে ঢালু পথ ধরব? উপরের পথেই যাই চলো। যাচ্ছি তো, কিন্তু পথের যে আর শেষ নেই। চলেছি তো চলেইছি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এল। একটু জল পাই কোথায়? দূরে দু-একটা বাড়ি দেখা যায়; বড়োলোক কেউ করে থাকবেন শখ করে এককালে। গিরিজা ব্রহ্মচারী বললেন, 'জলেরই তো মুশকিল, পাহাড়ের মাথায় কি জল সম্ভব? ঐ নীচে, গঙ্গা থেকে জল আনে এরা নিশ্চয়ই।'

পাথর-ফেলা পথে হোঁচট খাই, গাছের ছায়া দেখে বসে পড়ি, শুক্‌নো ঘাস খুঁটে খুঁটে তুলি; আবার উঠে পথ চলি।

দূরে জটলা করে একদল লোক। কী ওখানে? গিয়ে দেখি, সত্যি সত্যিই একটা বাঁধানো বড়ো কুয়ো। পাশেই ক্ষীর-প্যাঁড়ার ছোটো দোকান। যাত্রীরা এখানে এসে অশথ গাছের তলায় ব'সে জল মিষ্টি খায়; জিরিয়ে নেয়।

দুজন হিন্দুস্থানী—হয় যমজ, নয় পিঠোপিঠি ভাই—একই রকম দেখতে, একই পাতলা কাপড়ের জামা গায়ে, সবল স্বাস্থ্য, লম্বা-চওড়ায় চমৎকার সামঞ্জস্য, প্রায় আমারই বয়সী, জল তুলছিল কুয়ো থেকে পিতলের ঘটির গলায় দড়ি বেঁধে।

কাছে এগিয়ে বলি, 'ইহ্‌ পানি আচ্ছা হ্যায়?'

জল তুলতে তুলতে বড়োটি ঘাড় নাড়ে, 'উহ, বড় তিতা বা।'

তিতা! তিতো তো তারা তুলছে কেন? হাবার মতো দুজনের মুখে তাকাই। অন্য ভাইটি দেখি সরু গোঁফের আড়ালে হাসছে মুচ্‌কে মুচ্‌কে। ক্লান্ত শরীরে রসিকতা বুঝতেও ভ্রম হয় দেখে লজ্জা পাই। আগের ভাই ঘটি-ভরা জল তুলে বললেন, 'তীর্থে বেরিয়েছ, এই কুয়োর জলই যদি না খেলে তো তীর্থ হল কী? সবাইকেই খেতে হয়। এমন মিঠা পানি আর কোথাও নেই।'

দু হাত এনে মুখের কাছে ধরি; সে আমার অঞ্জলিতে জল ঢেলে দেয়, ঢক্‌ ঢক্‌ করে ঘটির জল শেষ করি। আর-এক ঘটি তুলে দেয়; হাত মুখ ধুই, মাথায় চাপড়াই।

সে বলে, 'আর দেব?'

বলি, 'না, আর না।'

জল খেয়ে ঠাণ্ডা হই আমি; তৃপ্তি ফোটে তার মুখে।

সারা পথ তার মুখের সেই ভাবখানিই লেগে রইল চোখে। কিসে এমন হয়!

আবার হাঁটা শুরু করি। দুই স্বামীস্ত্রী সঙ্গ নিয়েছেন আমাদের পাহাড়ের নীচ হতে। কালো গাট্টাগোট্টা প্রৌঢ়, ভাঁটার মতো লাল দুই চোখ, সবুজ মোজায় পাম্প্‌সু চাপিয়ে গট্‌ গট্‌ চলেন, রুগ্না কৃশা গিন্নি তাল রাখতে পারেন না; দৌড়ে দৌড়ে আমার বড়দির আঁচল ধরেন। বলেন, 'আমি কি কম হাঁটতে পারতাম? কী স্বাস্থ্য ছিল! এখন বয়েসও হয়েছে বাহান্ন, আর তা ছাড়া—'

বলি, 'বয়েস আবার কী? বাহান্ন একটা বয়েস নাকি? আমারই তো বাহান্ন!'

বড়দি উৎসাহ দেন—'হাঁটুন, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটুন। ছেলেমানুষ আপনি। দেখছেন না আমাকে? আমার তো বাষট্টি!'

ভদ্রমহিলা ভালো করে আর-একবার আমাদের মুখ দেখেন; বলেন, 'অথচ সে আন্দাজে আপনারা কত জোয়ান। আমার দাঁতগুলি পড়ে গিয়েই আমাকে ঘায়েল করেছে। তাই তো কর্তাকে বলি, দাঁত গেল তো লোকের সবই গেল।'

এলাহাবাদ থেকে এসেছেন একদল বাঙালি সধবা বিধবা। আজই ফিরে যাবেন রাত্রের ট্রেনে। বাঙালি দেখে দলে ভিড়ে দল ভারী করেছেন আমাদের।

বড়দি আলাপ জুড়ে দেন, 'আপনারা কোন্ দেশের গো?'

সামনে একটা দাঁত ভাঙা, শ্যাম্‌লা রঙের প্রৌঢ়া বিধবা বললেন, 'আছি আমরা এর মধ্যে সব দ্যাশেরঐ। উনি যশোরের, ইনি ময়মনসিংহের, তাইন্ কুমিল্লার, আমি বরিশালের।'

বড়দি বললেন, 'আহা গো, এবারে যা অবস্থা বরিশালের। পূর্ণানন্দস্বামী কাল এসেছেন বরিশাল হতে; তাঁর কাছে যা শুনলাম কাহিনী—লণ্ডভণ্ড একাকার। আর কিছু বাকি নেই। রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে মাটির বুকে। পূর্ববঙ্গের লোক আমরা, কিরা-কারবার সবখানেই; আত্মীয়-কুটুম্ব ছড়ানো চার দিকে। "অমুক" মিত্তিরের যা ঘটনা, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। গুণ্ডারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে; আর যখন উদ্ধারের পথ নেই, বয়স্থা কুমারী মেয়ে চেঁচিয়ে বলে, বাবা গো, ওদের হাতে দিয়ো না তুমি আমাকে, তার আগে কেটে ফেলো নিজের হাতে। গুণ্ডারা ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাপ তাড়াতাড়ি রাম-দা' তুলে নিয়ে দু মেয়ের গলা কেটে ফেললেন। বাপের মতো বাপ। ঠিক কাজ করেছেন তিনি। ছিনিমিনি খেলছে ওরা মেয়েগুলোকে নিয়ে। পশুর অধম।'

আঁচলে চোখ মুছে বিধবাটি বললেন, 'আর কন ক্যান। সোনার বাড়ি, সোনার ঘর; উড়ি পুড়ি ধুড়ি দিয়া চইল্যা আসলাম, সে কি কম দুঃখে?'

ভোগমায়ার মন্দির পাহাড়ের নীচে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম তাঁর কাছে। কী বীভৎস মূর্তি! লাল কাপড়ে ঢাকা কালো পাথর; নাক নেই, চোখ নেই, আছে কেবল সিঁদুর-লেপা পুরু মোটা দু ঠোঁট ছড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখী বিশাল এক 'হাঁ'। যেন এক বিরাট গহ্বরের সুড়ঙ্গ-পথ; সর্বগ্রাসী ভয়ংকরী ভাব। অসহ্য দৃশ্য।

পাণ্ডারা ঝেঁকে ধরে, 'এত দাও', 'অত দাও', 'প্রণামী ফেলো'। হাতের ইশারায় বড়দিকে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়লাম। তাঁর কাছে যাক এরা। বড়দির সাহস আছে, 'মা' বলে ডাকবেন এঁকেও।

এখন ফিরি কোন্ পথে? ঢালু পথ তো অজানা; গাড়ি আছে অষ্টভুজার নীচে। দাদা বললেন, 'আগের পথেই চলো; জানা পথ দূর লাগে না।'

হাঁটু দুমড়ে আসে। দু হাতে হাঁটু চেপে একটা একটা সিঁড়ি গুনি।

চেনা ফুলের মৃদু গন্ধ। সবুজ সবুজ ঝাপ্‌ড়া ঝোপ দুপাশে। ফুল কই? প্রাণ ভরে নিশ্বাস টানি; এ যে আমার বড়ো আপনার, আমার অনেক কালের জানা। কে এ? আবার সৌরভ টেনে ধরি; ও হো! এ তো আমার ঘরের কোনার বন-জুঁই। কত বছর আছি তাকে নিয়ে, ভুল কি হয় চিনতে?

বলি, 'বড়দি, ঐ ঝোপই বন-জুঁইয়ের ঝোপ। ছোট্ট ছোট্ট তারার মতো, লঙ্কা-ফুলের চেয়েও ছোটো, সাদা ফুল; পাতার আড়ালে থেকে প্রাণ মাতায় পথিকের।'

মোটরে এসে উঠে বসি। তত্ত্বানন্দস্বামী বললেন, 'বড়ো শুভদিনে শুভক্ষণে

আমাদের দেবীদর্শন হল। নবরাত্রি, নবমী তিথি, মঙ্গলবার—শুভ যোগাযোগ।'

সেই পথ, সেই ঘাট, সেই পুল, সেই মাঠ, সেই সব পেরিয়ে চলেছি আবার। নবমীর জ্যোৎস্না, ফুট্‌ফুটে আলোয় ভাসিয়ে দিয়েছে দিগ্‌দিগন্ত। গাছের কালো ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে সে আলো খিল্‌খিলিয়ে হেসেই চকিতে ছুটে পালায় পিছনে। মাঠের পর মাঠ নেচে বেড়ায় খেলায় মেতে। কী অপূর্ব শোভা! উছলে-পড়া প্রাণে খুশির জোয়ার লাগে। স্বপ্নরাজ্যের ভিতর দিয়ে চলতে থাকি আবেশে। মোটরের ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ মনে হতে থাকে যেন ভ্রমরের গুঞ্জন।

দিন ফুরিয়ে গেল। তল্পিতল্পা গুটোই এতদিনে। দেশ হতে কড়া তাগিদ এসেছে—উদ্‌বাস্তুতে ভরে গেছে শহর, নগর। তারা কোথায় থাকে, কী খায়, ব্যবস্থা করতে দাদা-বড়দিকে জরুরি প্রয়োজন। সত্বর যাওয়া চাই।

খবর এড়িয়েও এড়াবার উপায় নেই; মনের ভিতরে চাপা অশান্তি তোলপাড় করে।

দাদা বলেন, 'এই মন নিয়ে কোন্ তীর্থে ঘুরব? চলো ফিরেই যাই বরং।'

বড়দি বললেন, 'তবে দেখে আসি আর-একবার বিশ্বনাথকে এক-ছুটে।'

কেবল বিশ্বনাথ নন; পথে কালী, রক্ষাকালী, ভদ্রকালী, কাত্যায়নী, কেউ বাদ যান না। আজ যেন সব পুজারীদের সঙ্গেই বড়দির ফিরে নতুন করে আলাপ হয়; বাড়িঘরের কুশল-প্রশ্ন তোলেন, নানা অজুহাতে দেবদেবীর দোরে সময় বেশি নেন।

সেই সমান ভিড় আজও বিশ্বনাথের কাছে। সেইরকম স্নানের শেষে বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢেলে যাচ্ছে লোক এর-ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে। 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দ, দুন্দুভি বাজছে। 'বাবা' ডাকের বিরাম নেই। আপিস-কাছারির তাড়া; ভিজে গামছা কাঁধে ফেলে সাঁই-সাঁই মন্দির ঘোরে, চার কপাটে মাথা রেখে ডাকে—'বাবা'। ভিড়ের ভিতর উঁকি মেরে ভিড়ে-চাপা বিশ্বনাথকে দেখে; ঢুকবার সময় নেই, বাইরেই দেয়ালে মাথা ঠুকে হাঁকে—'বাবা'। বেরিয়ে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে সোনার চুড়ো দেখে থেমে চেঁচায়—'বাবা'। যেন তিন তলার বাপকে ডেকে বলে যায়, 'চললাম আমি।'

ফুলওয়ালা ব্যস্ত ফুল বেচতে। দু-পয়সার চার-পয়সার হিসেব-করা ফুল-পাতা যাত্রীর হাতে তুলে দিতে গিয়ে একটা পাপড়ি টেনে রেখে দেয়—বেশি হয়ে গেছে!

বয়েসের ভারে কোমর-ভাঙা এক গরিব বুড়ি উপুড় হয়ে ঘুর্ ঘুর্ করে; ঝুড়ি হতে ফুল-পাতা দু-একটি যা মাটিতে পড়ে কুড়িয়ে আঁচলে তোলে। ফুল বেলপাতা হল; এখন দুটি তুলসীপাতা হলেই হয়। ফুলওয়ালার কাছে হাত পাততেই তাড়া খায়, পাশ থেকে ছড়ি তুলে সপাং করে হাওয়ায় মারে।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। বারে বারে মনে হতে থাকে, ফিরে গিয়ে দু পয়সার ফুল-তুলসী কিনে দিই বুড়িকে। ভাবতে ভাবতে খানিকটা আরো এগিয়ে যাই বুড়িকে পিছনে ফেলে।

দু পাশের সাজানো দোকান থেকে কাঠের খেলনা কিনি, পিতলের রেকাবি কিনি, পানে চুন-খয়ের লাগাবার ছোটো চামচ কিনি; পাথরের বাটি, সেলুলয়েডের

টিপ, কালো সুতোর ফুৎনা, পান খাবার জর্দা মসলা। এটা ওটা সব কিনে থলি ভারী করে বেরিয়ে আসি।

গলির মোড়ে শ্রীপাণ্ডা বাধা দেয়। বলে, 'দাঁড়াও, যেয়ো না। তোমাদের আর-একটু কাজ বাকি আছে।' বলে তড়াক্ করে দোকানের তক্তা-বাঁধা মাচাতে উঠে বসে দু পা সামনে এগিয়ে দেয়। বলে, 'আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করো। আমি বলব তবে তো যাবে?'

সারি সারি মেয়ে ভিখিরি, বৈষ্ণবী, সন্ন্যাসিনী বসে আছে দু কাতারে সরু গলির দেয়াল ঘেঁষে।

খঞ্জনি বাজাতে বাজাতে বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীকে কনুইয়ের খোঁচা মারে, 'খালি মুখে বসে আছিস কেন? গান ধর্।' ব'লে নিজেই সুর ধরে—

'ও তার রাঙা পায়ে সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজে।'

দাদা, বড়দির প্রণাম হয়ে গেছে, আমিও প্রণাম করি। শ্রীপাণ্ডা দু হাতে আমার কাঁধে চাপ দেয়, বলে, 'উঠো না; আমি তোমার তীর্থগুরু, আমাকে জিজ্ঞেস করো—আমার তীর্থযাত্রা পরিপূর্ণ হল?'

বড়ো ভালো লাগল। মুহূর্তে কেমন মন বদলে গেল। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জোরে জোরে বললাম, 'আমার তীর্থযাত্রা পরিপূর্ণ হল?'

হাত তুলে শ্রীপাণ্ডা বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার তীর্থযাত্রা পরিপূর্ণ হয়েছে, এবার দেশে ফিরে যেতে পার।'

সেই মোটা লাল কুকুরটা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে চৌরাস্তার মাঝখানে। রিক্সা ঘুরে যায়, সাইকেল বেঁকে চলে, লোক ডিঙিয়ে হাঁটে, ভ্রূক্ষেপ নেই তার। চোখ পিট্ পিট্ করে আর নিশ্চিন্ত মনে জোরে নিশ্বাস টানে।

ভট্চাজ্জিমশায়ের সঙ্গে দেখা। মহাপণ্ডিত। পাটনা গিয়েছিলেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে; ফিরে এসেছেন কাল।

দাদা প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। বললেন, 'যাচ্ছি। আশীর্বাদ করুন, যেন কৃপা পাই তাঁর।'

ভট্চাজ্জিমশায় দু পা এগিয়েছিলেন চলে যাবার জন্যে। ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কী বললেন আপনি? কৃপা? তাঁর কৃপা কি এমন একটা জিনিস যে নাড়ুর মতো হাতে তুলে দিলে তবে দেখতে পাবেন? কৃপা কি পান নি? এই-যে এত দেশ ঘুরে এলেন, এত কিছু দেখে এলেন, জেনে এলেন, গায়ে একটা আঁচড় লেগেছে? এটা কি তাঁর কৃপা নয়?'

দাদা ঘাড় নাড়লেন। আনন্দের আভাস ফুটল তাঁর মুখে। আর-এক বার প্রণাম করলেন পণ্ডিতমশায়কে; বললেন, 'পদে পদে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেন তিনি, তবু বুঝি না আমরা।'

সময় বেশি নেই। গাড়ি ডাকতে লোক ছুটেছে। ট্রেনের টিকিট কেনাই আছে; শেষ মুহূর্তে স্টেশনে গেলেই চলবে। বড়দিকে বললাম, 'মালপত্র গাড়িতে তুলতে না তুলতে চলে আসব। যাই, এক-ছুটে প্রণাম করে আসি আমি দুর্গাপ্রসাদকে।'

শ্রীমার সন্তান দুর্গাপ্রসাদ বসে আছেন বারান্দায়, দেখে এসেছি আসবার পথে। হুবহু গুরুদেবের চেহারা। এমন সাদৃশ্য কম চোখে পড়ে। আর খানিক লম্বা হলেই খুঁত থাকত না বুঝি একটুও।

মোটরের হর্ন বেজে উঠল। দুর্গাপ্রসাদ দু হাত আমার মাথায় তুলে ধরলেন। পায়ের ধুলো নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। ভোলামামা এনে কী কতকগুলো গুঁজে দিল আমার হাতে; মোটর ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তা দিয়ে।

মুঠ খুলে দেখি, সুন্দর মেয়ের মুখ আঁকা হিমানী স্নোর বিজ্ঞাপন ছাপা গোলাপি রঙের ছোট্ট ব্লটিং, মাসিক কাগজ হতে কাটা বিরজানন্দের ছবি একখানা, আর একটা ছেঁড়া খামে মোড়া একটি ম্যাগনোলিয়া—ফুটেছে বাগানে আজই; লুকিয়ে রেখেছিল হয়তো সকলের নজর এড়িয়ে।

ট্রেন চলেছে হুস্ হুস্ ক'রে কালো ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে। আবার বসেছি জানলার পাশে হাতে মাথা রেখে। ভাবছি মনে, বলেছিলেন সীতারাম দাস, 'স্রোতে নৌকো ছেড়েছ, ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকো তো টলবেই ক্ষণে ক্ষণে। তবে, বৈঠা বেয়ে চলে যেতে হবে এগিয়ে, থামলে চলবে না।'

দেখতে দেখতে আপন দেশে এসে পড়ি। খেতের ধারে চাষার গাঁ; গোরু চরায় রাখাল বালক। মাঝি-মেঝেন চলে পথে দিনমজুরি-কাজের খোঁজে, বাঁকে ঝোলানো কালো শিশু দোলা খায় চলার তালে। অজয় নদীর সাদা বালি ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে আলোর ঝিলিকে। আর একটুখানি পথ, থামব তার পরই।

অভিজিত এসে হেসে দাঁড়াবে সামনে। বড়ো হয়েছে এখন, মালপত্র সামলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মাকে।

মনে পড়ল, জিজ্ঞেস করেছিলাম সইকে, 'সই, যে হিসেব ভুলতে তুমি বেরিয়েছিলে পথে, পেরেছিলে কি ভুলতে?'

'কই আর পারলাম', বলে বড়ো করুণ হাসি হেসে সে গেয়ে উঠেছিল—

'আমি কুল দেখি না, মান দেখি না;
দেখি কালো শশী রে, দেখি কালো শশী;
শুধু, নয়নজলে ভরলাম কলসী।'